নীলাঙ্গুরীয়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ॥ কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ (প্রকাশ ভবন)

মাঘ, ১৩৫৭

প্রকাশক :

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ-শিল্পী :

শ্রীমনোজ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :

শ্রীঅশোককুমার পাঁজা
শিবদুর্গা প্রিণ্টার্স
১৫১ রামদুলাল সরকার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

আমার স্নেহভাজন কনিষ্ঠ
শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে

এই লেখকের—

ফেরারী ফিরে এলো
তাঞ্জাম
বিশেষজ্ঞ
আধুনিক
অবগুণ্ঠন
কুলী প্রাঙ্গণের চিঠি
তালবেতাল
নাটক নয়, নভেল নয়
অষ্টক
লজ্জাবতী
প্রণয়-বিচিত্রা
তুষার হতে অদূরে
স্বর্গাদপি গরীয়সী (তিন খণ্ড)
কাঞ্চনমূল্য
নয়ানবউ
বরযাত্রী ও বাসর
পরিশোধ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

'নীলাঙ্গুরীয়' বইখানির একটু ইতিহাস আছে। শ্রাবণ, ১৩৪৬-এর শনিবারের চিঠিতে "কশ্চিৎ প্রৌঢ়" 'ভালবাসা' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত করেন। লেখক তাহাতে ভালবাসার নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষে তাঁহার পাঠকের নিজের নিজের অভিমত জানাইবার জন্য আহ্বান করেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের এই মনোবৃত্তিটি উপরে উপরে মোটামুটি সবল এবং নিরীহ মনে হইলেও আসলে অত্যন্ত জটিল। 'কশ্চিৎ প্রৌঢ়ে'র আহ্বানে আমি 'ভালবাসা' নামক একখানি গল্প 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত করি; যাহা পরে 'বসন্ত' নামক গল্প সংগ্রহে বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি ভালবাসার সঙ্গে মার খাওয়াইবার ইচ্ছা থাকাও বিচিত্র নয়।

বৃত্তিটির জটিলতার আরও একটা দিক দেখাইবার ইচ্ছা থাকায় এই বইখানির অবতারণা। কতদূর সফল হইলাম বিদগ্ধ পাঠক বিচার করিবেন। আর একটা কথা,—'নীলাঙ্গুরীয়' কৌতুক রসের লেখা নয়। গোড়া থেকেই একটা অন্যবিধ প্রত্যাশায় থাকিয়া পাঠে বাধা জন্মাইতে পারে বলিয়া এটুকু বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলাম।

বইখানির প্রুফ দেখিয়া দিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আমায় চিরঋণী করিয়াছেন।

জন্মাষ্টমী
(১৩৪৯)

ব. ভ. ম

মীরা

১

আমার প্রশ্ন বোধ হয় একটু জটিল।—ভালবাসা কি সব সময়েই তাহার সেই চিরন্তন-রূপেই দেখা দিবে? সেই আবেগবিহ্বল কিংবা অশ্রুসজল? ঘৃণা কি সব সময়েই ঘৃণা? ভালবাসা কি একটা অভিনয়?—না, সত্য থেকে অভিন্ন একটা কিছু?…যদি তাহাই হয় তো সত্যের সেই অন্তর্বহ্নিতে সে কি, যাহা খাদ, যাহা অবান্তর, সেই, সব-কিছুকেই দগ্ধ, ভস্মীভূত করিয়া দিতে সমর্থ নয়?…বেশ গুছাইয়া মনের কথাটি বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু এও বলি—হাজার গুছাইয়া বলিলেও কি অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা আছে আপনাদের নিকট?

আপনাদের মস্তিষ্কের উপর কটাক্ষ করিতেছি না, দোহাই। বলিতেছি অভিজ্ঞতার কথা।—আপনারা ভালবাসেন নাই, ভালবাসা কত রূপ তাহা দেখেন নাই, ভালবাসা পাওয়া তো দূরের কথা। প্রমাণ দিবেন বিবাহের। কিন্তু এটা আমার তরফের প্রমাণ, অর্থাৎ বিবাহিত বলিয়াই ভালবাসার কিছু জানিলেন না। আপনাদের বিবাহ তো? আপনি তখন বোধ হয় প্রাণপণে পাশের পড়া লইয়া ব্যস্ত, ঘটকিনী হাঁটাহাঁটি করিতেছে, আপনার পিতা আর বাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা কুটুম এবং গহনা যাচাই করিতেছেন, মেয়েরা পাত্রীর নাক, চোখ, কান, চুলের হ্রস্ব-দীর্ঘতা লইয়া ব্যস্ত। পাশের পড়া থেকে ফুরসত হইলে টোপর এবং পরীক্ষার ফলাফলের দুশ্চিন্তা মাথায় করিয়া আপনি সুড়সুড় করিয়া গিয়া গোটাকতক মন্ত্র আওড়াইয়া আসিলেন;—সংস্কৃতে যতটুকু জ্ঞান তাহাতে সেগুলি আপনার পক্ষে বিবাহের মন্ত্রও হইতে পারে, ভূতঝাড়ার মন্ত্রও হইতে পারে; এবং বাসরঘরে অশ্রাব্য বিদ্রূপ এবং অসহ্য কর্ণতাড়নায় আপনার নিজের ভূতঝাড়ার যদি ব্যবস্থা না থাকিত তো বোধহয়, কি জন্য আপনার কষ্ট করিয়া আসা সেটা বেমালুম ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন।—বাঙালী ব্যবস্থাপকেরা দূরদর্শী ছিলেন,—বধূ আনিবার ব্যবস্থাটা করিয়া গিয়াছেন ধুতি-শাড়িতে গাঁটছড়া বাঁধিয়া। বুঝিয়াছিলেন এই সব পরীক্ষা-পাগল বরেরা উদম পাগল হইয়া নিতান্ত যদি বস্ত্র-উত্তরীয় ফেলিয়া না পালায় তো কনেকে কোনরকমে বাড়িতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। এই আপনাদের বিবাহ, এর মধ্যে ভালবাসার স্থান কোথায়?…হদ্দ আছে একটা নিশ্চিন্ত আরাম; চোখ কান মুদ্রিত করিয়া একটা…

কথায় কথায় অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবনকে যদি কেহ দেখিয়া থাকে

তো সে অনিল। তাহার দেখিবারও একটা বিশেষত্ব আছে, আপনার-আমার মত করিয়া দেখে না। বলে "ভাই, খাসা আছি। বাপ-মা, ঘটক-পুরুত, আত্মীয়-স্বজনে মিলে সমস্ত বাজার উট্কে অবস্থামত সেরা অম্বুরী তামাক জোগাড় করে, সেজেটেজে নল্‌চেটা হাতে তুলে দিয়েছে, ভুড়ুক ভুড়ুক করে টেনে যাচ্ছি গড়া গড়া ; এসা আমেজ যে প্রতি টানেই যে বুক খালি করে দিয়ে যাচ্ছে সেটুকু পর্যন্ত হুঁশ হবার ভয় নেই। এ-ধাতে, মানে এই তাকিয়া-জাপটান জাতের পক্ষে, এই ভাল ; থাকুক উডক্কুডে ডান-পিটেরা ল্যভ, ডিভোর্স, কোর্টশিপ ইলোপমেন্ট আরও যত সব আদাড়ে রোমান্স নিয়ে ..."

আপনাদের বিবাহ এই গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাক, অনায়সলব্ধ একটা মিষ্টাস্বাদ, সঙ্গে একটা নেশার আমেজ। তাহাতে ভালবাসার অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায় কোথায় ? ঝোলা গুড়ে গলা মাতাইয়া বলা, অমৃতপান করিয়া উঠিলাম।

তাই বলিতেছিলাম—বিবাহটাই প্রমাণ যে ভালবাসা কি তাহা জানেন না। যাহাতে না জানিতে পান সেই জন্যই আপনার শুভার্থীরা—অথবা দুইপক্ষই ধরিয়া বলা যাক—আপনাদের শুভার্থীরা আপনাদের বিবাহ দিয়া দিয়াছেন—ভালবাসার প্রতিষেধ হিসাবে। কেন এরূপ করা হয় জানি না, তবে এইটুকু জানা আছে যে, ভালবাসায় গরল থাকিতে পারে। অন্তত আমার বেলা তো ছিল ;—আরও কত সবার বেলায়, জীবনে চলতি পথে এক সময়ে যাহাদের সঙ্গে হইয়াছিল দিন কয়েকের সাক্ষাৎ।

কণ্ঠে গরল ধারণ করা কি সবার কাজ ?—সেই জন্যই বোধ হয় আপনাদের অঙ্গে বিবাহের রক্ষাকবচ আঁটা,—মন্ত্রপূত কবচ।

ভগবান আপনাদের নিরাপদ রাখুন। আমি কিন্তু যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই গরলামৃত পান করিতে পাই।

২

আমারও রক্ষাকবচের আয়োজন হইতেছিল।

বি-এ পাশ করিয়া বেশ একটু ক্লান্তি আসিয়াছে। বাড়ির বাড়া ভাত খাইয়া কলেজে হাজিরা দিয়া পাশ করা নয় তো, হোস্টেলের আড্ডা জমাইয়াও নয়। উদয়াস্ত মাস্টারি, প্রাইভেট টুইশন। চারিটি বৎসর একদণ্ডের জন্যেও সরস্বতী দেবীর এলাকার বাহিরে পা দিতে পারি নাই। বীণাপাণি সরস্বতীর নয়, শুদ্ধ বাগ্দেবীর—বাক্যের অধীশ্বরীর। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সরসতা বিসর্জন দিয়া এই চারিটি বৎসর শুধুই বকিয়াছি। সকালের দুই টুইশনে পাঁচটি ছেলে—ছোট ছেলে। বিকালে, কলেজ-ফেরত বাসায় আসিবার পথে একটি ধাড়ি—তিন-তিনবার ম্যাট্রিকুলেশন-বুড়ি ছুঁইয়া

আসিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যা যাইতে না যাইতে বাসায় দুইজন—তিনটি ছেলেমেয়ে ও একজন বৃদ্ধ, আমার মনিবের খুড়া। বৃদ্ধের টুইশুনটা একটু বাড়াইয়া বলিতেছি, আসলে টুইশুন নয়, তাঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনাইতে হইত, ছেলেমেয়েদের পড়ার পাট শেষ হইলে। তিনি আবার বেতর কালা ছিলেন, প্রায়-কথাটাই তাঁহাকে দুইবার করিয়া শুনাইতে হইত। বৃদ্ধ এদিকে কিন্তু লোক ভাল ছিলেন এবং ভাল লোক ছিলেন বলিয়াই আমার নিকট হইতে ফালতু কাজটুকু করাইয়া লইতেন; তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে এটা আমায় মস্তবড় অনুগ্রহ করিতেছেন,—টুইশুনের অধিক এই কাজটুকু লইয়া আমায় যেন নিছক গৃহশিক্ষকেরও অধিক একটু জায়গা দিলেন। এক এক সময় বেশী প্রীত হইয়া বলিতেন, "না, তোমার পড়ার বেশ কায়দা আছে শৈলেন।"

নিতান্ত ভদ্রতার মিথ্যা এটুকু, কেন না, সমস্ত দিনের কসরতের পর গলা আমার তখন সমস্ত কায়দার বাহিরে। আমিও একটা ভদ্রতার মিথ্যায় জবাব দিতাম—তাঁহার কানের নিদারুণ অত্যাচারের কথা চাপা দিয়া বলিতাম, "আপনাকে শুনিয়েও বেশ একটা সুখ আছে; বহু ভাগ্যে এমন একজন শ্রোতা পাওয়া যায়।"

যখন আহারে বসিতাম অনর্গল বকিবার ফলে পেট আর বুক দুইটাই এমন ফাঁকা হইয়া থাকিত যে, কোন্‌টা পেট আর কোন্‌টা বুক যেন সাড় থাকিত না।

আমার পাস করিবার জীবনটা অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি বাক্যের মরুভূমির ভিতর দিয়া—মহাশ্বেতা বাঙ্ময়ী সরস্বতীর এলাকা। যখন বি-এ পাশ করিলাম তখন আমি শুষ্ক, পরিশ্রান্ত। শুধু এইটুকুই নয়, অনুভব করিলাম জীবনের একটা মস্ত বড় ক্ষতি হইয়া চলিয়াছে। টুইশুন সংগ্রহ করিতে এবং সংগ্রহ করিবার পর বজায় রাখিতে ঝুটা-সাঁচ্চা উভয়বিধ কৃতজ্ঞতার জন্য গার্জেনদের খোশামোদ করিতে করিতে মেরুদণ্ড যাইতেছে বাঁকিয়া। বাক্যের অর্ঘ্য রচনায় পাই আনন্দ। হারানো দম বোধ হয় ফিরিয়া পাইতে পারি, কিন্তু এ সর্বনাশ হইতে কখনও উদ্ধার পাইব কি না জানি না। মোট কথা আমার পাস করিবার যে আনন্দ সেটা ঠিক সাফল্যের আনন্দ নয়, একটা মুক্তির স্বস্তি,—মনে হইল কি একটা অসহ্য অবস্থা হইতে যেন অব্যাহতি পাইলাম।

জীবনের এই সুর-পরিবর্তনের মাহেন্দ্র লগ্নের ওদিকে সানাইয়ের আমেজ উঠিল। আমি তখন পরীক্ষা দেওয়ার পর পূর্ব-উপকূলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। প্ল্যান হইয়াছে পরীক্ষার ফল বাহির হইবার মুখে কলিকাতায় ফিরিব, তাহার পর দেশে—আমাদের প্রবাসভূমিতে। ভ্রাম্যমাণের নিরুদ্দেশ হাল্কা দিনগুলি বাঁশির সুরে স্বপ্নালু হইয়া উঠিত। খবর পাইতাম বিবাহের আয়োজন হইতেছে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের জীবন আমায় ডাকিতেছে। কি মধুর! ক্লান্ত চোখে কত অপূর্ব রঙের আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে; কত স্বপ্ন;—যেন একটা রূপকথার জগৎ এই জীবনকেই ঘিরিয়া

কিভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার সম্মুখ হইতে পর্দা গুটাইয়া যাইতেছে। বাঁচিয়াছি, শুষ্ক পাঠের উপর আর স্পৃহা নাই। বাঁচিয়া আবার ঐ মরণের দিকে পা বাড়াইব না।

ঠিক এই সময় একটা ব্যাপার হইল যাহাতে কলেজ, পড়া, পাসকরা—যে সবকে মরণ ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারা আবার নূতন সুরে ডাক দিল। আহ্বানটা আসিলও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত একটা দিক হইতে।

ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম পাস করিয়াছি। পাততাড়ি গুটাইতে-ছিলাম, অর্থাৎ বাড়ি যাইব, বাঁধাছাঁদা হইতেছিল, স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার একটা পাতা ছিঁড়িয়া আমার প্রিয় একটি সিনেমা-আর্টিস্টের ছবি মুড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিব, হঠাৎ সেই ছিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞাপনের গোটা দুই অসংলগ্ন লাইন চক্ষে পড়িল—

'· আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন। গুরুপ্রসাদ রায়, ব্যারিস্টার, ৩৫।৩।১, লিণ্ডসে ক্রেসেণ্ট, বালিগঞ্জ।'

আবেদন করিয়াই জীবনের এতটা কাটিয়াছে, কাজেই একটা কৌতূহল হইল, এ আবার কিসের আবেদন? বিজ্ঞাপনের বাকিটুকু মোড়কের ভাঁজের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে, আবার ভাঁজ খুলিয়া পড়িলাম।

'একটি নয়-দশ বৎসরের বালিকার জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। গৃহশিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকই বাঞ্ছনীয়। আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া'···ইত্যাদি—

কয়েকবার পড়িলাম এবং প্রতিবারেই মনটা যেন বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। আমায় আকৃষ্ট করিতেছিল স্বয়ং বিজ্ঞাপন-দাতা অর্থাৎ ছাত্রীর পিতা। আরও সঠিকভাবে বলিতে হয়—ঠিক ছাত্রীর পিতা নয়, তাঁহার নামটা। আমার জিভে যেন জড়াইয়া যাইতেছে,—গুরুপ্রসাদ—গুরুপ্রসাদ রায়···যতই নাড়াচাড়া করিতেছি ততই লোকটিকে প্র্যাকটিসে, প্রাচুর্যে, আরামে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এই মনে হওয়ার মধ্যে একটা হিসাবও ছিল বোধ হয়। নামটা অতি আধুনিক সুধীনও নয়, অথবা রীতীশও নয়। গুরুপ্রসাদ নামের গুরুভার কাঁধে লইয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে যাইত সে অন্তত চল্লিশ বৎসর আগের কথা। তাহার মানে এখন তাঁহার অন্তত ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসরের প্র্যাক্‌টিস, বয়স ষাটের ওদিকে একটা বেশ কায়েমী প্র্যাক্‌টিসের উপর গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছেন। আশা করা যায় দিবেন-থোবেন ভাল। একটা আরামের পরিবেশের ছবি চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে।···নিশ্চয় কালা নয়, নিশ্চয় বসিয়া বসিয়া পরের মুখে খবরের কাগজ শুনিবার ফুরসত নাই তাঁহার। লোভ হয়, একবার দেখাই যাক না।

এম-এ পড়িবার এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, এ বিষয়বুদ্ধিটা যে একেবারেই

ছিল না এ-কথা বলিতে পারি না, তবে আসল কথা ছিল শখ। চার বৎসর ধরিয়া যে নাগাড়ে নয়টি-দশটি ছাত্রছাত্রীর হাতে আয়ুক্ষয় করিয়া আসিতেছে তাহার একবার একটি মাত্র ছাত্রীকে পড়াইবার শখ হয়ই। চুরি-ডাকাতির জন্য পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিবার পর আমাদের গাঁয়ের ভূতো বাগ্দী একবার বলিয়াছিল, "এবার আরাম করে তোমাদের স্বদেশী জেল খাটবার বড আহিংকে হয় দাদাঠাকুর; একবার দেখলে হত।"...এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই রকম—সশ্রম কারাভোগের পর একটু নিশ্চিত কারা-উপভোগ মাত্র।

কিন্তু বাধাও আছে। ব্যারিস্টার জীবগুলিকে আমি যেন অন্তর্নির্দিষ্ট হইয়া এড়াইয়া চলি। মনে হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খড়্গ-নাসা এবং বক্র-তর্জনী দিয়া উহারা সর্বদাই যেন অন্তরের কথাগুলি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইবার জন্য মুখাইয়া আছে। অবশ্য সব ব্যারিস্টারই যে খড়্গ-নাসা এমন নয়, সংসারে খাঁদা ব্যারিস্টারও বিস্তর আছে; তবে আমার মনে কেমন করিয়া একটা টাইপ-চেহারা গাঁথিয়া গিযাছে। ধরুন, আমি চাকরির উমেদার হইয়া গেলাম। যেন গিয়া বারান্দার সিঁড়ির নিচের ধাপে দাঁড়াইয়াছি। সামনে প্যাণ্টের পকেটে ডান হাত দিয়া বাঁ হাতের মুঠায় পাইপের আগাটা ধরিয়া ব্যারিস্টার গুরুপ্রসাদ রায়; আমার মুখের উপর ফেলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খড়্গ নাসা ইত্যাদি। প্রশ্ন হইল, "কি চান?"

আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে স্টেট্স্‌ম্যানে দেখলাম।"

"ই-য়েস্, কি দেখলেন বলুন, আউট্ উইথ্ ইট্।"

"আজ্ঞে দেখলাম যে আপনার মেয়ের জন্যে"...

"আর ইউ শিওর—আমার মেয়ে?"

"আজ্ঞে আপনার নাতনীর জন্যে "

"স্টেটস্‌ম্যানে কি আমার নাতনী বলে মেন্‌শন্ করা আছে?" তাড়াতাড়ি, আমার সময় অল্প।"

ততক্ষণে আমার দফা অর্ধেক নিকেশ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, একদমে সবটা বলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "আজ্ঞে, দেখলাম নয়-দশ বৎসরের একটি মেয়ের জন্যে একজন টিউটর ·"

"এক্স্‌পিরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট টিউটর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন এক্স্‌পিরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট টিউটর দরকার আপনার, তাই..."

"আপনার এক্স্‌পিরিয়েন্স্?"

"আজ্ঞে আমি চার বৎসর ধরে দিনে আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িয়ে এসেছি।"

ব্যারিস্টার অধরোষ্ঠ কুটিল বিদ্রূপে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। —আঁতের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—শখ।...উত্তর হইল, "তার মানে জঙ্গলে খেটেছেন বলে বাগানেও কাজ করতে পারবেন।...না, আমার একটু অন্য ধরনের অভিজ্ঞ লোক চাই; আপনি আসুন, নমস্কার।"

কাল্পনিক গুরুপ্রসাদের সঙ্গে এই রকম একটা কাল্পনিক কথাবার্তা হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটার দিকে চাহিয়া একদিকে লোভ আর অপর দিকে আশঙ্কা—এই দোটানায় পড়িয়া যাইব কি যাইব না যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যাওয়াই স্থির করিয়া ফেলিলাম, তাহার কারণ শুধু একটা মনগড়া আশঙ্কায় এমন একটা সুবিধা ছাড়িবার চিন্তায় নিজের মনের কাছেই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছিল। ব্যারিস্টারের ভয়ে শখের দিক্‌টা যেমন কমিয়া আসিতেছিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি বলিয়াই ইহার বৈষয়িক দিকটা তেমনি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, চাই কি এই সুযোগে জীবনের গতিটাই ফিরিয়া যাইতে পারে। দুশ্চিন্তারহিত প্রচুর অবসরের মধ্যে বেশ ভালভাবেই এম-এ-টা হইতে পারে, আই-এ পাশ করা পর্যন্ত জীবনের যা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একটা কৃতি মানুষের সাহচর্যে ও সাহায্যে জীবনে ভালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারি। শেষ পর্যন্ত যদি কপাল তেমনভাবেই খোলে তো কত কী না হইতে পারে?—কল্পনা একেবারে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা-দানের কোঠায় গিয়া ঠেকিল; সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী—নানারকম তত্ত্বাক্যের ছড়াছড়িতে মনটা গরম হইয়া উঠিল; সেক্সপীয়রের অমর বাণী—'দেয়ার ইজ এ টাইড্ ইন্ দ্য এফেয়ার্স অব মেন'···বাঁধা-ছাঁদা ছাড়িয়া খানিকটা চিন্তা করিলাম—ভগবান এদিকে নামে যেমন লোকটিকে গুরুপ্রসাদ করিয়াছেন, ওদিকে পেশায় যেমনি ব্যারিস্টার না করিয়া যদি ডাক্তার কিংবা জজ-মুন্সেফ-গোছের কিছু একটা করিয়া দিতে পারিতেন তো সোনায় সোহাগা হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই··

চিন্তার মাঝেই একবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলাম; না, জুজুর ভয়ে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; ব্যারিস্টার তো ব্যারিস্টার সই। জীবনের যত মঙ্গল সব থাকে বিপদের অন্তরালে, বীরের মত পা ফেলিয়া গিয়া সেই বিপদের সামনে দাঁড়াইতে হইবে। দেরি করা নয়, 'শুভস্য শীঘ্রম্'।

৩

৩৫।৩।১, লিণ্ড্‌সে ক্রেসেণ্টে যখন উপস্থিত হইলাম বেলা তখন প্রায় তিনটা হইবে।

বাড়িটা একেবারে নূতন, সময় হিসাবেও নূতন, আবার স্টাইল হিসাবেও নূতন।

ঢালাই-করা কংক্রিটের বাড়ি; রেলিং, জানালার সান্‌-শেড, ছাদের আলিসা, থাম, সিঁড়ির পাড়, কোনখানেই স্থাপত্য-অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই; সব জ্যামিতির সোজা কিংবা বৃত্তাভাস রেখার নানা রকম সমন্বয়ে গড়া। বাহির হইতে যতটা বোঝা যায় বাড়ির ঘরদালানও ঐ ধরনের। কোণ-কানের বালাই খুব অল্পই; যেখানে কোণ-কানের সম্ভাবনা সেখানেই একটু ঘুরিয়া যেন এড়াইয়া গেছে। সব মিশাইয়া ঠিক যে সৌন্দর্যের অভাব বলিব তাহা নয়, তবে আমার মত অনভ্যস্তের চোখে নিরাভরণ অতি-আধুনিকত্বের একটা অস্বস্তি জাগায় যেন।

বেশ বড় হাতার মধ্যে বাড়িটা। বাঁ-দিকে একটা মাঝারি সাইজের বাগান, মাঝখানটিতে একটি ব্যাডমিণ্টন কোর্ট, তাহার চারিদিকে কতকগুলি কামিনী গাছ, প্রত্যেক গাছটি একরকম করিয়া দুই তিন থাকে পরিপাটি করিয়া ছাঁটা; একটি পাতার, কি একটি ডালের বাহুল্য নাই। ফুল? সে নিশ্চয় এ সব গাছের কাছে আকাশ-কুসুম মাত্র। এদিকে-ওদিকে কয়েক রকম মরশুমী ফুলের বেড্‌। তারের জাল দিয়া মোড়া কয়েকটা লোহার পাতের খিলান—তাহার উপর কয়েক রকম বিলাতী লতার ঝাড়, ছুরি-কাঁচির শাসনে কোথাও একটু বাহুল্য নাই, চারা-গাছটি হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই দিব্য বেশ সংযত কোর্টের উপর বাড়ি আর বাগান দুই-ই যেন এক ছন্দে রচা, ছাঁটাকাটা, মাজা-ঘষা, তকতকে ঝকঝকে।

বাড়ির ডান দিকে গ্যারেজ, চাকরদের আউট-হাউস। সমস্ত চৌহদ্দিটা এক-বুক উঁচু দেওয়াল দিয়া ঘেরা, মাঝখানে ঢালা লোহার এক জোড়া গেট। গেটের থামে পালিশ-করা পিতলের ফলকে কালো অক্ষরে ইংরেজীতে নাম লেখা—জি. পি. রে. বার্‌-এট্‌-ল।

সমস্ত পথটা নিজের মনেই ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে আসিলাম। মনে মনে কোথায় যেন একটু আশা ছিল ৩৫।৩।১ ব্রাহ্মস্পর্শযুক্ত গোলমেলে নম্বরটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না। চেষ্টা করাও হইবে, অথচ ভালয় ভালয় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়াও আসা যাইবে। বাড়িটা পাইয়া দমিয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই যে গেটের মধ্যে পা দিব এমন সাহস হইল না। অথচ একজন জলজ্যান্ত ব্যারিস্টারের গেটের সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও নিরাপদ নয়। কি করা যায়?

দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে দেওয়ালের আড়ালে ফুটপাতের উপর খানিকটা এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করিলাম, শক্তি সঞ্চয় করিতেছি। যে-সঙ্কল্প লইয়া আজ বাড়ি যাওয়া স্থগিত রাখিলাম, সামান্য দ্বিধা—হয় তো ভীরুতারই জন্য সে-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গেলে জীবন তাহার ব্যর্থতা লইয়া নিশ্চয় একদিন জবাবদিহি চাহিবে।

দেওয়ালের আড়ালেই কোঁচা দিয়া জুতাটা ঝাড়িয়া লইলাম। তাহার পর হাত দিয়া চুলটা গুছাইয়া এবং প্রথম সওয়াল-জবাবে যে ইংরেজী কথাগুলা দরকার হইতে

পারে—সেগুলা আবার একবার মনে মনে আওড়াইয়া লইয়া গেট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

গা ছমছম করিতেছিল। সুরকির রাস্তার উপর চলিবার মস্‌মস্‌ শব্দ হইতেছে, মনে হইতেছে বাড়ির গাঢ় নিস্তব্ধতার গায়ে যেন সিঁদ কাটিবার আওয়াজ হইতেছে।… দেখিয়া থাকিবেন—আধুনিক ভদ্রোচিত বাড়ি সব নিস্তব্ধ। শব্দ স্বাভাবিক নিশ্চয়। কিন্তু স্তব্ধতাই সভ্যতা। পূর্বে সৌন্দর্য দিত অবগুণ্ঠন আজকাল অবগুণ্ঠন' টানে শব্দে। রেডিও-র হুংকার ? সেটা ব্যতিক্রম,—আধুনিকতা অতিরিক্ত বেহায়াপনা।

সুরকির রাস্তার শেষে একটি তেরছা বারান্দার সামনে গোল সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম। বুকটা ঢিপঢিপ করিতেছে। সামনেই ঘর, বোধ হয় হল-ঘর। শব্দ হইল যেন লোক আসিতেছে, একটা খস্‌খসে শব্দ—নিশ্চয় বিলাতী ঘাসের চটিপরা ব্যারিস্টার। বুকটাকে একটু চাপিয়া ধরিতে হইল। ঘরের ভারী পর্দটা নড়িয়া পর্দা ঠেলিয়া যে বাহির হইয়া আসিল সে ব্যারিস্টার নয়, চাকর। এসব বাড়িতে এদের অভিধেয় বোধ হয় 'বেয়ারা'। গায়ে একটা পরিষ্কার ফতুয়া, দেহটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেলচুকচুকে। বাম বাহুতে একটা সোনার তাগা। কাঁধের উপর একটা ঝাড়ন ; বাড়ির চাকরের মত তাহার ঝাড়নও বেশ পরিষ্কার। এসব স্থানে চাকর শুধু থাকা দরকার, তাহাকে বিশেষ কাজ করিতে হয় না, তাহার একটি ঝাড়ন থাকাও দরকার, তবে তাহা দিয়া বেশি ময়লা ঝাড়িতে হয় না।

প্রশ্ন হইল, "কাকে চান ?"

কথাটা গলায় কোথায় আটকাইয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "গুরুপ্রসাদ-বাবু মানে এই ব্যারিস্টার সাহেবকে।"

"তিনি নেই এখানে।"

এত মধুর সংবাদ জীবনে কখনও শুনি নাই। বুকে যে হাওয়াটা আটকাইয়া ছিল একটি তৃপ্তির নিশ্বাসে সেটা মুক্ত হইয়া গেল। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একটু মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় গেছেন ? আসবেন কবে ?"

"কুমিল্লায় একটা সিডিশ্যন কেসে গেছেন, দিন-পনের লাগতে পারে ?"

চাকরের মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে 'সিডিশ্যন কেস' কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে চাহিলাম, তখনই কিন্তু ভাবিলাম—ব্যারিস্টারের বেয়ারা, এমন আর আশ্চর্য হইবার কি আছে ?

যাই হোক, বাঁচা গেল। চেষ্টা করিলাম, গৃহকর্তা বাড়ি নাই, আমি আর কি করিতে পারি ? এ-আফসোস তো আর থাকিবে না যে, জীবনে মস্ত বড় একটা সুবিধা

পাইয়াও গাফিলতি বা ভয়ে নষ্ট করিয়া ফেলিলাম?

ফিরিতেছি, বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার ছিল আপনার?"

দরকারটা বলিলাম।

বেয়ারা বলিল, "ছোট দিদিমণির মাস্টারির জন্যে? তাহলে আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

শঙ্কিত এবং সন্দিগ্ধভাবে ফিরিয়া চাহিলাম; লোকটা কি ভাবছিল আমি চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছি? একটু বিরক্তও আসিল। যতটা সম্ভব মুখের ভাবটা ফিরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আছেন সাহেব?—তবে যে তুমি বললে··?"

বলিল, "সাহেব নেই, তবে মাস্টার ঠিক করা মীরা দিদিমণির হাতে, তাঁকে ডেকে দেই গে; আপনি বসেন উঠে এসে।"—বলিয়া বারান্দার একটা উইকারের চেয়ার সামান্য একটু সামনে ঠেলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ব্যারিস্টার সম্বন্ধেই ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহার কন্যাদের সম্বন্ধে কোনরকম গড়াপেটা ধারণা নাই। এ জীবগুলি আবার কি জাতীয় হওয়া সম্ভব, চেয়ারে বসিয়া নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছি, এমন সময় মীরা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া একটি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। মাথায় পরিষ্কার বাঁকা সিঁথি, হাতে একখানি রাঙা মলাটের বই; একটি আঙুল তাহার মধ্যে গোঁজা, পায়ে এক জোড়া জরির কাজ-করা মখমলের স্যাণ্ডেল। প্রথম দর্শনেই মীরার সব খুঁটিনাটি দেখিয়া লওয়া অল্প দক্ষতার কাজ নয়; অন্তত আমি তো পারি নাই; তবে এই তিনটি জিনিস চোখে যেন আপনিই পড়িয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া বাঁকা সিঁথি; তাই এগুলোর উল্লেখ করিলাম। মেয়েদের মাথায় বাঁকা সিঁথি তখন সবে উঠিয়াছে, অতি-আধুনিকতার বিদ্রোহের বাঁকা অসি।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলাম।

মীরা প্রতিনমস্কার করিয়া একবার তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। এমন একটা দৃষ্টি যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মানিয়া লইতে হইল—হ্যাঁ, ব্যারিস্টারের কন্যা বটে। প্রশ্ন করিল—"টুইশনের জন্য এসেছেন?"

আমার অতিরিক্ত সঙ্কোচের কারণটা পরে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমত এত সপ্রতিভ অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তা আমার এই প্রথম; দ্বিতীয়ত ওরই হাতে টিউটর নিয়োগের ভারটা থাকায় ওর গুরুত্বটা সেই সময় আমার কাছে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

ওর পিতার সামনে যেমন করিয়া উত্তর দিতাম বলিয়া আমার বিশ্বাস, কতকটা সেই রকম ভাবেই শঙ্কিত বিনয়ের স্বরে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ?"

"গ্র্যাজুয়েট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এইবার পাস করেছেন?"

তিনবার "আজ্ঞে হ্যাঁ" করিতে করিতে আমার দৃষ্টি আপনা-আপনিই নত হইয়া পড়িয়াছে। মীরা একটু চুপ করিল। বোধ হয় নত দৃষ্টির সুযোগে আবেদনকারীকে আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোক দরকার বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।"

আমি একটু ধোঁকায় পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন আট-দশটা টুইশ্যন করিবার কথাটা বলা নিরাপদ হইবে কিনা ভাবিতেছি, মীরা নিজেই বলিল, "বেশ থাকুন। টুইশ্যনের আবার অভিজ্ঞতা কি তাও তো বুঝি না।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম; ঠিক এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ আশা করি নাই।

মীরা বইটা চেয়ারের পিঠে দুইবার ঠুকিয়া প্রশ্ন করিল, "কত মাইনে চান?"

অস্বীকার করিব না, এত সহজে নিয়োগের পর এমন উদার প্রশ্নে একবারে কৃত-কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। মুখে একটু কৃতজ্ঞ খোশামোদের ভাব ফুটিয়া থাকে তো কিছু আশ্চর্য হইবার নাই তাহাতে। পূর্বে তিন-চার দিনের বম হাঁটাহাঁটি করিয়া কোন টুইশ্যন সংগ্রহ করিতে পারি নাই, গার্জেন সম্প্রদায়কে ভিজাইবার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও।

বলিলাম, "যা আপনাদের সুবিধে হয় দেওয়া।"

মীরার নাসিকার ডান দিকটা সামান্য একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আমাদের সুবিধের জন্যেই কি আপনি এতটা পথ বেয়ে এসেছেন?"

বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, একেই খুশি করিতে গিয়াছি, আর এর কাছেই উল্টা প্রশ্ন? বলিলাম—সংলগ্ন কিছুই বলিলাম না,—"আজ্ঞে—মানে হচ্ছে—আসল কথা···" বলিয়া মাঝখানেই থামিয়া গেলাম।

মীরার নাসিকার কুঞ্চনটা মিলাইয়া গিয়া কতকটা কৌতুকপূর্ণ হাসিতে ঠোঁট দুইটি একটু প্রসারিত হইল। বোধ হয় কথাটি শেষ করিতে পারি কিনা দেখিবার জন্য আমার মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলিল, "বলুন আসল কথাটা। আমরা ওটা খুব বুঝি, দ্বিধা করবার দরকার নেই; জানেন তো ব্যারিস্টারের বাড়ি, বাবা আসল কথা আগে ঠিক না করে মক্কেলের কাগজপত্র ছোঁন না"—বলিয়া বেশ ভালভাবেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মীরা তাহার বাবার মক্কেলের সঙ্গে ব্যবহারের কথায় হাসে নাই, এত হাসিবার কথা নয় সেটা। আমার এই অকূল পাথারে পড়িবার মত অবস্থা দেখিয়া ওর হাসি চাপিতে

পারিতেছিল না, একটা ছুতা করিয়া প্রাণ খুলিয়া একটু হাসিয়া লইল।

পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইল—প্রগল্‌ভতা হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া হোক, কিংবা আমি আরও সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়াই হোক। বলিল, "না, আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন ; আচ্ছা ধরুন···"

হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, "কিন্তু, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ?—বাঃ বসুন !"

আমার বসা উচিত ছিল না, একজন অপরিচিতা যুবতী দাঁড়াইয়া সামনে ; তবু মীরার বলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়া পড়িলাম এবং রাগ হইল মীরার উপর। মেয়েটা আসিয়াই আমাকে দাঁড় করাইয়াছিল—তাহার নীরব সম্ভ্রম-জাগানো উপস্থিতির দ্বারা, এখন বসাইয়া দিল—তাহার ছোট্ট একটি হুকুমের দ্বারা। মরিয়া হইয়া খুব মোটা রকম মাহিনা চাহিয়া আজকের এ-পর্ব শেষ করিয়া যাইব, এমন সময় স্কুল হইতে আমার ভাবী ছাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরা বলিল, "তোমার নতুন মাস্টার-মশাই তরু, ঘরটা দেখিয়ে দাও। আপনি কাল সকালেই আসবেন তাহলে।"

সকালেই আসিবার অসুবিধা ছিল, হাসিটাও বড় তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিতেছিল 'ওঠ্-বোস্' করিবার ব্যাপারটাও মনে তখনও টাটকা—অর্থাৎ সেটা যে আমারই দুর্বলতা সেটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তখনও হয় নাই আমার, তাহার উপর শেষের এই হুকুমটা—মোটেই সুপাচ্য নয়। সান্ত্বনা মাত্র এই যে, চাকরি ওর নয়, ওর পিতার, অর্থাৎ একজন পুরুষের। আহত আত্মসম্মানকে সান্ত্বনা দিলাম—আসিব, কিন্তু অন্তত একটা দিন দেরি করিয়া। ওর প্রথম হুকুমটা অমান্য করিয়া।

তাহার পর সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটা করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত সব গোছ-গাছ করিয়া, এদের বলিয়া কহিয়া রাখিয়া পরদিন ভোরেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

৪

কাজ আরম্ভ হইল।

আমি পৌঁছিবার একটু পরেই মীরা আমায় তরুর ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "কাজ আপনার শক্ত মাস্টারমশাই, ছাত্রীটি বড় সোজা নয়, একটু দেখেশুনে নেবেন।"

তরুর পিঠে হাত দিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার পরিচয় দিয়ে দিলাম একটু, বাকিটুকু মাস্টারমশাই নিজেই টের পাবেন।"

ইহার পর আমার ঘরে একটু আসিল। বেয়ারাকে আমার জন্য আসবাব-পত্রের দু-একটা উপদেশ দিয়া কোন অসুবিধা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আমি কিন্তু দুদিন হাজার চেষ্টা করিয়াও শক্ত সহজ কোন কাজেরই বিশেষ সন্ধান পাইলাম না। আমি সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া তরুকে দেখিতে পাই না। স্নান করিতে করিতে শুনি তরু মোটরে করিয়া কোথা হইতে আসিল, দু-একটা কিকথা বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। আহার করিয়া উঠিয়া ঘরে তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতেছি, তরু খট্ খট্ করিয়া নামিয়া মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারখানা কি?

মীরার সঙ্গে দেখা হইতেছে না। চেষ্টা করিয়া দেখা করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। বেয়ারাটাকে কি অন্য চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করিতে মন সরিতেছে না;—দু-বেলা দিব্য রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া করিতেছি, অথচ আসল যা কাজ সে-সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান নাই, ওদের সামনে এটা প্রকাশ করা কেমন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। বড়লোকের চাকরদেরও ভাবগতিক একটু অন্য রকম। দেখাই যাক্ না, যদি এমনিই ব্যাপারটার হদিস হয় কোন।

বিকালে কি কাজ, কিংবা কোন কাজ আছে কিনা এখনও টের পাই নাই। তাহার কারণ প্রথম দিন আমার বিকালবেলার দিকে একবার পুরানো বাসায় যাইতে হইয়াছিল, ছাতাটা ফেলিয়া আসিয়াছিলাম সেটা লইয়া আসিতে। ফিরিতে রাত্র হইয়া গেল। প্রথমটা তো কাগজ পড়িবার জন্য ধরা পড়িলাম, সেটা শেষ হইলে ছাত্রছাত্রীরা ধরিয়া বসিল—আহার করিয়া যাইতে হইবে। নূতন চাকরি, কাটান দেওয়ার ঢের চেষ্টা করিলাম, সফলও হইতাম; কিন্তু বড় ছাত্রীটি এদিকে একটু চতুর হইয়াছে, বলিল, "না মাস্টারমশাই, আপনি যান, ওদের কথা শুনবেন না···তোমরা ব্যারিস্টারের বাড়ির মত ভাল খাবার দিতে পারবে ওঁকে? আদর-যত্ন করতে পারবে?"

কৃত্রিম রোষের সহিত 'ওদের' কথাটা বলিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চার বৎসরের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে, পূর্বে তাহাতে ধৈর্যাভাবও ছিল, ক্লান্তিও ছিল, এই নূতন বিচ্ছেদে কিন্তু সব সরিয়া গিয়া শুধু স্নেহটুকু গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। আর 'না' বলিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রেই দেরি,—বেশ একটু কুণ্ঠার সহিত বাসায় ফিরিলাম। আহার করিব না শুনিয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—শরীর ভাল আছে তো?

মোট কথা বিকালে ও সন্ধ্যার পর তরুকে লইয়া আমার কি ডিউটি প্রথম দিন সেটুকুও জানা গেল না।

দ্বিতীয় দিন বিকালে মীরার সঙ্গে দেখা হইল—আমার ঘরেই। পুরানো বাসা হইতে রিডাইরেক্টেড্ হইয়া বাড়ী হইতে একটা চিঠি আসিয়াছে—না যাওয়ার জন্য সবাই চিন্তিত,—সেই চিঠির জবাব দিতেছিলাম, মীরা তরুকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "আপনার ছাত্রীকে আজ একটু ছেড়ে দিতে হবে মাস্টারমশাই,

ডক্টর মল্লিকের ওখানে পার্টি আছে একটা, আসতে বোধ হয় রাত হয়ে যেতে পারে।”

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, “তা যাক।”

লজ্জিতভাবেই এইজন্য যে, এই দু-দিনের মধ্যে ওকে আমি ধরিয়া রাখিলাম কখন যে ছাড়িয়া দিতে হইবে? ওরা চলিয়া গেলে বাড়ি না যাওয়ার কারণ জানাইয়া চিঠিটা শেষ করিলাম; তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া ‘পুনশ্চ’ দিয়া লিখলাম “কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই আসিতেছি, কেন না কয়েকটা কারণে এমন সুবিধের চাকরিটা রাখিতে পারিব কিনা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।” চিঠিটা কাছেই একটা ডাকবাক্সে দিয়া আসিলাম।

বাস্তবিকই দু-দিনেই যে রকম ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে বসিয়াছে, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে এ-চাকরি চলিবে না। প্রথমত, এই আভিজাত্যের আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছি না; দ্বিতীয়ত, একটা রহস্য রহিয়াছে—বাড়ির মধ্যে কোথাও একজন গৃহকর্ত্রী আছেন, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের কোন পাকা রকম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। মীরাই তো দেখিতেছি সর্বময়ী। ব্যাপারটার সঙ্গে হয়তো আমার চাকরীর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তবুও যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে। আর, সকলের উপর অসহ্য হইয়াছে এই জগদ্দলের মত অবসরের বোঝা। তরু ভোরে কোথায় যায়? ট্যুইশ্যন পড়িয়া আসিতে? দুপুরে কোথায় যায়? স্কুলে? তবে অমন মোটা মাহিনা দিয়া আমায় রাখা হইল কেন? কাজের অভাবে বাড়িটার সঙ্গে কোন যোগসূত্র অনুভব করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা বড়মানুষি চাল!—লোক রাখিল, তাহার কাজ ঠিক করিয়া দিবে না! ঠিক উল্টা একেবারে—এর আগে সব জায়গাতেই গার্জেন-উপগার্জেনের দল হুমড়ি খাইয়া থাকিত—একটা মুহূর্তও ফাঁকি দিতেছি কিনা। সেও শতগুণে ভাল ছিল কিন্তু।

রহস্যটা সেই দিনই কতকটা পরিষ্কার হইল।

চিঠিটা ফেলিযা কথাগুলো মনে তোলপাড় করিতে করিতে বাগানে গিয়া একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিলাম। বাহির হইতে বাগানটা যে অতি-কৃত্রিমতায় বিসদৃশ বোধ হইতেছিল, এখন ততটা মনে হইতেছে না। বরং মনে হইতেছে এই ভাল। ঘাড়-রগ ঘেঁষিয়া চুলছাঁটা লোকের গায়ে যেমন আলখাল্লা মানায় না—কাটাছাঁটা বাহুল্যবর্জিত পাঞ্জাবিই শোভা পায়, এ-বাড়ির পক্ষে এ-বাগানও কতকটা সেই রকম। আমার বেঞ্চের পাশটাতেই একটা গোলাপের বেড্। হাতের কাছের গাছটিতে গুটি পাঁচ-ছয় ফুল ফুটিয়াছে। বাড়ির মধ্যকার হাওয়াটা যেন চিন্তায় চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিযাছে, লাগিল বেশ। গন্ধ-লুব্ধ হইয়া একটি ফুল আলগাভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি—পাপড়িগুলি ঝুরঝুর করিয়া ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িল। আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একবার চাহিয়া নিঃশব্দে স্থানটি ত্যাগ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বারান্দা হইতে

বেয়ারা "মেমসাহেব আপনাকে একবার ডাকছেন মাস্টার-মশা।"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম, চোখ দুইটা অবাধ্য-ভাবেই একবার ছিন্ন পাপড়িগুলার উপর গিয়া পড়িল। মেমসাহেব দেখিয়াছে—দুইটা কটু কথা বলিবে, যদি শত মোলায়েম করিয়াও বলে তো বুঝাইয়া দিবে—ফুলগাছসুদ্ধ টানিয়া নাকে চাপিয়া গন্ধ লওয়াটা যে-রুচির পরিচয়, এ-বাড়িতে সে-রুচির স্থান নাই।

অথচ ধর্ম জানেন আমার কোন দোষ নাই। ফুলটি ছিল ফুটিবার শেষ অবস্থায়, একটু পরে আপনিই ঝরিত, রূপে লুব্ধ করিয়া আমায় নিমিত্তের ভাগী করিল মাত্র।

বেয়ারার মুখের পানে অপরাধীর মত চাহিলাম,—এমনই অভিভূত হইয়া গিযাছি যে, আর একটু হইলে তাহারই শরণাপন্ন হইয়া বোধ হয় বলিয়া ফেলিতাম, "এ যাত্রাটা আমায় বাঁচাও কোন রকমে।"

বেয়ারা বলিল, "ওপর ঘরেই রয়েছেন তিনি, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরুপায় হইয়া অগ্রসর হইলাম।

মনে মনে কিন্তু স্থির করিয়া ফেলিলাম—আজই এ-কাজে ইস্তফা দিয়া বাড়ি চলিয়া যাইব। মীরাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ানও আর ভাল লাগে না, একটা গোলাপ আপনি পড়িয়াছে ঝরিয়া, তাহার জন্য কালো মেমসাহেবের লাঞ্ছনাও সহ্য হইবে না, ইহার অতিরিক্ত যে-সব বিড়ম্বনা সে তো আছেই। চাকরটা পর্যন্ত চলিয়াছে—যেন একটা কয়েদীকে বিচারাসনের সামনে হাজির করিতেছে।

বেয়ারা গিয়া পর্দার সামনে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "মাস্টারমশা এসেছেন মা।"

ভিতর হইতে আদেশ হইল, "আসতে বল্।"

বেয়ারা দুয়ারের পাশে দাঁড়াইয়া পর্দাটা তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

আদেশ হইল, "ব'স ঐ সোফাটায়।"

আমি ঘাড়টা সেই রকম গোঁজ করিয়াই আড়চোখে পিছনের সোফাটা দেখিয়া লইয়া কয়েক পা গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সেকেণ্ড কয়েক চুপচাপ; মনে মনে মহলা দিতেছি,—প্রথমে বুঝাইব প্রকৃতই ফুলটি আমি জানিয়া নষ্ট করি নাই। কালো-মেমসাহেবী মেজাজ নিশ্চয় বুঝিতে চাহিবে না। না চায় বলিব—চাকরি দিয়া ফুলের জন্য ক্ষতিপূরণ করিলাম। এ অশান্তির এইখানেই ইতি করিয়া দিব।

প্রশ্ন হইল, "তোমায় বাগান থেকে ডেকে নিয়ে এল?"

মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা উজবুক তো রাজুটা, আমায় এসে বললেই পারত তুমি বাগানে রয়েছ; আমার এমন কিছু তাড়াতাড়ি ছিল না।"

শান্ত, একটু অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর। বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। প্রথমেই সামনে দেওয়ালের উপর একটি গণেশ-জননীর মূর্তির উপর নজর পড়িল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন, পটের মূর্তিটাই নীচে নামিয়া আসিয়াছে।

বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হইবে। চওড়া টকটকে রাঙা পাড়ের একটা গরদের শাড়ি পরা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মাথার কাপড়ের পাড়ের সঙ্গে রঙে রঙে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে, হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে দু-গাছি শাঁখা।

মুখটা ঈষৎ ক্লান্ত, মনে হয় যেন অসুস্থ রহিয়াছেন। ঘরের এক পাশে কৌচের উপর দৃষ্টি পড়িতে ঠেলিয়া জড়-করা একটা র‍্যাগ দেখিয়া মনে হইল কৌচেই শুইয়াছিলেন এতক্ষণ, ওদিকে আমায় ডাকিতে পাঠাইয়া কুশন-চেয়ারটায় আসিয়া বসিয়াছেন।

ঘরটা বেশ প্রশস্ত। নীচে আসবাবের বাহুল্য নাই, উপরে ছবির কিছু বাহুল্য আছে এবং বাড়ির হিসাবে দেখিতে গেলে বিশেষত্বও আছে। চোখে পড়ে জগদ্ধাত্রী, কালীঘাটের একটি রাঙায়-কালোয় জলজলে কালীর পট, রবিবর্মার আঁকা একখানি শতদলের উপর কমলা-মূর্তি।

অর্থাৎ আমি, অথবা যে-কোন বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের ছেলে যাহাতে অভ্যস্ত, ঘরের মানুষটি হইতে আরম্ভ করিয়া মায় পট-ছবি সমেত ঠিক সেই রকম একটি পারিপার্শ্বিক। পরিবর্তনটাও এত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক যে, মনে হয় হঠাৎ ইহার মধ্যে যাদুবলে কিছু একটা যেন হইয়া গিয়াছে—আমার এই বাগান হইতে উঠিয়া আসিবার অবসরটুকুতে। দু-তিন দিনের যে আড়ষ্ট ভাবটা মনে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, অনুভব করিলাম সেটাও হঠাৎ অপসৃত হইয়া গিয়াছে। লিখিতে দেরি হইল, কিন্তু আমার এই ভাবান্তরটা ঘটিতে মোটেই দেরি হয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রথমটা বিব্রত হইয়া গেলাম, তাহার পর অল্প হাসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিলাম, "ডেকে এনে কি আর অন্যায় করেছেন!"

"এখন মরশুমী ফুলে বেশ চমৎকার হয়েছে বাগানটি, তাই বলছিলাম।" হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ডাকতে গেলে আমি তো চটতাম।"

একটু বিরতি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমিই তাহলে নতুন টিউটর এসেছ?"

উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"শুনলাম। দু-দিন থেকে ভাবছি ডাকব, শরীরটা ঠিক ছিল না; হয়ে ওঠেনি।"

আবার একটু হাসির সঙ্গে বলিলেন, "মীরা বলছিল, 'মুখচোরা ভালমানুষ লোকটি, উনি তরুকে পড়াবেন কি মা, তরুই উল্টে ওঁর মাস্টারি করবে।' জিজ্ঞেস করলাম—'তবে রাখতে গেলি কেন ওঁকে'?"

আমি কৌতূহলে মুখ তুলিয়া চাহিতে হাসিয়া বলিলেন, "সে তোমার আর শুনে

কাজ নেই বাপু।"

তাহার পর বোধ হয় আপত্তিজনক কিছু একটা মনে করিয়া লইতে পারি ভাবিয়া বলিলেন, "উত্তর আর কি, দুষ্টুমি!—'তরুর হাতে নাকাল হবেন, দিব্যি দেখব বসে—গোবেচারি কেউ নাকাল হচ্ছে দেখতে বেশ লাগে।'...ওর কথা সব সময় ধরা হয় না বাড়িতে; ওঁকেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বসে। যাক, তোমার ছাত্রী পড়ছে কেমন?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমি তাকে ভাল করে দেখিইনি এখনও।"

"তাই নাকি?—তা ওর দোষ দেওয়া যায় না।"

মিসিস রায় একটু চুপ করিয়া গেলেন। মুখে যে একটা লঘু প্রসন্নতার ভাব ছিল সেটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া মুখটা চিন্তায় একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখন যে পাবে দেখতে তা আমি ভেবে উঠতে পারি না। বাপেতে আর মেয়েতে মিলে সংকল্প করেছে এদিকে এশিয়া আর ওদিকে ইউরোপ—এ দুযের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে বেছে বেছে তরুর মধ্যে বোঝাই করতে হবে। আমার মত অন্য রকম, তাই ওসব কথার মধ্যে আর থাকি না, বলি তোমাদের যা ইচ্ছে কর গে বাপু।"

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপত্তি না থাকে তো আপনার মতটা জানতে পারি কি?"

মিসিস রায় যেন আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমার মত ওদের একজন শ্রেষ্ঠ কবির যা মত তাই। ওদের সঙ্গে আর কিছুতেই মেলে না, শুধু এই-খানটাতে মেলে,—ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এণ্ড ইস্ট ইজ ইস্ট, দ্য টোয়েন শ্যাল নেভার মীট্"—(**West is West and East is East, the twain shall never meet**).

আমি অতিমাত্রায় আশ্চর্য হইয়া মুখের পানে চাহিলাম। ইংরেজীর এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমি বাঙালী মেয়ের মুখে ইহার পূর্বে কখনও শুনি নাই, অন্তত কাছাকাছি যদি কিছু শুনিয়াও থাকি তো তাহা অতি-মেমসাহেবিয়ানায় দুষ্ট। মিসিস রায় কথাটা বলিলেন অতি সহজভাবে, তাহাতে যেমন একদিকে কৃত্রিমতাও ছিল না, অন্যদিকে তেমনই নিখুঁত বলিতে পারিবার জন্য আমার এই যে বিস্ময়, এজন্য স্ত্রীলোক বলিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচও ছিল না। খুব বেশি জানিবার মধ্যে যেমন একটা অনায়াস অবহেলা থাকে—ভাবটা অনেকটা সেই রকম। আমিই বরং একটু অপ্রতিভ হইয়া মুখে বিস্ময়ের ভাবটা মিলাইয়া লইলাম।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সামনে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "এরা আমার কথা মানতে চায় না, মীরা ঝগড়া করে, মীরার বাপও ঝগড়া করেন। আমাদের এই রাজায় রাজায় ঝগড়া, মাঝখান থেকে তরু-উলুখড়ের প্রাণ যায়। ওকে বিলেতে পাঠানো হবে—লরেটোতে জুনিয়ার কেম্ব্রিজের জন্যে

হাতেখড়ি চলছে ; অথচ সকালবেলায় উঠে নেয়ে-টেয়ে বেচারির লক্ষ্মী পাঠশালায় গিয়ে শিবপুজোর জন্যে চন্দন ঘষতে হয়। স্কুলে ওদের মিউজিক ক্লাস সেরে এসে বাড়িতে বিকেলে কীর্তন। আমি বলি—আপাতত একটা জিনিসে পাকা হোক, তারপর অন্যটা ধরলেই চলবে—আগে কীর্তনটা আয়ত্ত করে নিক না হয়। বলেন—না, তাহলে ঝোঁকটা একদিকে চলে যাবে, বেশ সরলভাবে নতুন জিনিসকে তুলে নিতে পারবে না······”

আমি বেশ নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলাম, “কথাটা কি সত্যি নয় ?”

মিসিস রায় কৌতুকচ্ছলে হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “নাঃ, আমার কপাল মন্দ ; মীরাব মুখে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হল বোধ হয় এত দিনে স্বপক্ষে একটি মানুষ পেলাম, তুমিও দেখছি ঐ দলেই !”

তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “না, আমি সে কথা বলছি না, বলছি —মিলতে গেলে ঐক্যের দিকগুলোয় ঝোঁক দিতে হবে, কিন্তু তা তো করা হয় না, বিরোধের দিকগুলোয় দেওয়া হয় জোর। এটা কি রকম তার জন্যে বেশি দূর না গিয়ে তরুর ব্যাপারটাই ধরা যাক না—ওকে এমন সুযোগ দেওয়া হবে যাতে ও একেবারে অতি-আধুনিক ইংরেজ যুবতী হয়ে উঠতে পারে। ও যখন লরেটোতে যায় তখন ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে এ-বিষয়ে আমাদের কোনদিক দিয়ে ত্রুটি নেই। এদিকে যাতে আবার বেশি দূর না এগোয়, অর্থাৎ দিদিমা-ঠাকুরমাদের কথা ভুলে কোন কেম্ব্রিজ ব্লুর গলায় মালা না দিয়ে বসে, সেজন্য তাকে দিয়ে শিবের মাথায়ও গঙ্গাজল ঢালানো হচ্ছে। এ-মনস্তত্ত্ব তোমরা যদি বোঝ তো বোঝ, আমি একেবারেই বুঝি না ; কেন না ঠাকুরমা-দিদিমাদের আদর্শ আর বিশ্বাস যদি মানতে হয় তো সেই আদর্শে গড়া শিবঠাকুর ওকে ঠেকাবাব জন্যে হিমালয় ছেড়ে কেম্ব্রিজের দিকে এক পা-ও বাড়াবেন না। তার কারণ গেলেই তাঁর নিজের জাত যাবে, আর ভক্তের খাতিরে যদি সেটাও না গ্রাহ্য করেন তো এইজন্যে যে কেম্ব্রিজে টাটকা বিল্বপত্র একেবারেই পাওয়া যাবে না।

“এই এক ধরনের মিলন। আর এক ধরনের আছে—নিজেদের সব ছেড়ে ওদের সব নেওয়া, মনে-প্রাণে সাহেব হয়ে গিয়ে উদয়াস্ত গায়ে সাবান ঘষতে থাকা। কিন্তু একে তো আর মিলন বলা যায় না, এ আত্ম-সমর্পণ ; বরং আত্ম-সমর্পণের মধ্যেও আত্মার কিছু বিভিন্নতা বজায় থাকে বোধ হয় ; এ একেবারে আত্মবিলয়—ওরাই রইল, বরং পুষ্ট হল, তুমি গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে। এটা সেই মনোভাব যার জন্যে মুখ থেকে বেরোয়—ইংরেজী শিখতে হলে ইংরেজী পড়তে হবে, ইংরেজীতে কথা কইতে হবে, ইংরেজীতে ভাবতে হবে, এমন কি স্বপ্নও দেখতে হবে ইংরেজীতেই

(To learn English, read English, speak in English, think in English, and even dream in English)—কে বলেছিলেন কথাটা? রমেশ দত্ত, না মাইকেল?—কিন্তু কেন তা করব? মায়ের দুধের সঙ্গে যে ভাষা আমার জিভে মিলিয়ে রয়েছে তাকে তাড়াতে যাব কোন্ দুঃখে?—এই আত্মবিলোপের জাত আমরা, ভাষার দিক দিয়েও আত্মবিলোপ, সভ্যতার দিক দিয়েও আত্মবিলোপ।"

মিসিস রায় সোজা হইয়া বসিয়া ছিলেন, ক্লান্তভাবে সোফার পিঠে হেলান দিয়া একটু চুপ করিলেন; চোখ দুইটি অন্যমনস্কভাবে সামনের দেওয়ালে কমলার ছবির উপর নিবদ্ধ।

আমার চোখ দুইটি নিজে হইতেই কৌচের উপর গিয়া পড়িল।

মিসিস রায় অসুস্থ, তাহার উপর হঠাৎ মনের এই আবেগ। বলিলাম, "আপনি এখন একটু আরাম করলে ভাল হত। আপনার কথার প্রতিবাদ করা যায় না, অন্তত ভেবে চেষ্টা করতে হয়—এখন আমি আসি, আবার যখন আদেশ করবেন, আসব।"

উঠিতে যাইব কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উঠিতে পারিলাম না। হাতের মধ্যে মুখের দুইটি পার্শ্ব ঈষৎ চাপিয়া, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন মিসিস রায়,—বুঝিলাম আত্মস্থ; আমার এতগুলো কথার একটাও কানে যায় নাই। একটু পরে কমলার মূর্তি থেকে ধীরে ধীরে প্রশান্ত চক্ষু দুইটি নামাইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "হতেই হবে।"

বুঝিলাম এখনও ঘোরটা কাটে নাই। তখনই যেন সচকিত হইয়া উঠিলেন, "বলছিলাম হতেই হবে, অর্থাৎ এই আত্মবিলোপের প্রতিক্রিয়া একদিন আসবেই। তাই কৈলাস আর কেম্বিজের এই জগাখিচুড়ি।"

আমি যেন কিছু একটা বলিবার জন্য বলিলাম, "কিন্তু এই একেবারে আত্ম-বিলোপের ভাবটা যেন যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।"

মিসিস রায় বলিলেন, "মোটেই নয়। পুরোদমেই চলেছে এখনও। যেটাকে তুমি যাওয়া বলছ, সেটা হল ঐ দুটোতে মিলে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া।"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "আজকাল জাহাজ থেকেই স্যুট ছেড়ে ধুতি-চাদর পরে আমাদের দেশের ছেলেরা নামছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।"

মিসিস রায় শেষ করিতে না দিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না তাই বলছ; আমি খুব জানি—আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত, আর এই আমার ছোট মেয়েকে এরা ..."

এমন সময় একটা ছোট্ট জাপানী কুকুর ত্রস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া মিসিস রায়ের পায়ের কাছে লুটিয়া গড়াইয়া একশা হইয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরা আর তরু এক রকম হুড়োমুড়ি করিতে করিতেই আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

৫

এ এক সম্পূর্ণ অন্য মীরা।

এমন কলহাস্য আর লুটোপটি করিতে করিতে প্রবেশ করিল যেন তরুর বড় বোন নয় মীরা, পরন্তু সমবয়সী সখী। পরে বোঝা গেল মাকে দখল করিবার জন্য মোটর হইতে নামিয়াই ওদের রেস আরম্ভ হইয়াছে। তরু ছোট বলিয়া ক্ষিপ্রগতি, সেজন্যও, এবং দুয়ারের পর্দার সঙ্গে মীরার আঁচল একটু জড়াইয়া যাওয়ার জন্যও, সেই-ই গিয়া আগে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মীরা কাছে গিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ, বাবা এসে বলবেন কি? তোমার হার্ম্যানের বাড়ির অমন ফ্রকটা যে একেবারে…!"

"কি হয়েছে, অ্যা!"—বলিয়া তরু সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিতেই মীরা তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে তাহার স্থানটা দখল করিয়া মুক্তকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল।

তরু ঠকিয়া গিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল, অনুযোগের স্বরে বলিল, "ওঠ দিদি, এ বেইমানি। হেরে গিয়ে…"

মীরা মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া উত্তর করিল, "তোমারও এটা বেইমানি।"

"আমার বেইমানি কিসে?"

"বেইমানি নয় মা?—তোমার আদর খাওয়ার পালা আগে আমার। ও পরে জন্মেছে, আমার থেকে এঁটোকুটো যা বাঁচবে তাই নিয়ে ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি তোমার লোভে যখন আর-জন্মে সাততাড়াতাড়ি মরে বসলাম, ও কাদের মায়ায় পড়ে ছিল? যাক্ না তাদের কাছে!…তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর কর তো মা—'মীরা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেপে'…"

তরু ভ্যাংচাইয়া বলিল, "কেলে সোনা…"

মীরা সেইভাবে মুখ গুঁজিয়াই দুষ্টামি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "মীরা আমার কালো সোনা; জগৎ মাঝে নাই তুলনা'…বল না মা—"

এরা জায়গাটা দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরটা সরিয়া গিয়া দূরে ঘরের কোণে একটা চেয়ারের নীচে আশ্রয় লইয়াছিল। দুইটি থাবার উপর মুখ রাখিয়া চক্ষু তুলিয়া ব্যাপারটা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তরু কতকটা নিরুপায়ভাবে মীরার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বোধহয় সুযোগের দিকেও নজর আছে। মীরা মেঝেয় আঁচল লুটাইয়া মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া কচি মেয়ের অভিনয় করিতেছে—তরুর রাগটাকে ইন্ধন জোগাইবার জন্য ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া এক-একবার তাহার দিকে উঁকি মারিতেছে। মিসিস রায়ের একটা হাত মীরার বেণীর উপর, মুখে মৃদু হাস্যের

সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভাব মিশিয়া গিয়া অনির্বচনীয় একটা মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। নিজের মাতৃত্বের রসে যেন বিলীন হইয়া গিয়াছেন। ওঁর মাথার উপর গণেশ-জননীর ছবিটা—তুষারমৌলি হিমালয়, তার সানুদেশে একটি শিলাখণ্ডের উপর শিশু গণপতিকে কোলে লইয়া পার্বতী, চক্ষু দুটিতে বিশ্বের সব বাৎসল্য আসিয়া যেন পুঞ্জীভূত হইয়াছে; পাশে রক্ষী ও বাহন পশুরাজ।

আমার অবস্থিতিটাও বোঝা দরকার।—

আমি ঘরটার একটু অন্য প্রান্ত ঘেঁষিয়া একটা নীচু সোফায় বসিয়া আছি। আমার সামনে একটা বেশ মাঝারি রকমের গোল মার্বেলের টেবিল। তাহার মাঝখানটিতে বড় একটা পিতলের পাত্রে একরাশ সদ্য-প্রস্ফুটিত সাদা লিলি; আশেপাশে কয়েক রকম মাউন্টে বসানো কয়েকটা ফটো। মোট কথা আমি এমনই কতকটা প্রচ্ছন্ন ছিলাম, তাহার উপর দোরটা আবার ঘরের মাঝামাঝি,—প্রবেশ করিয়া ঝোঁকের মাথায় সটান ওদিকে চলিয়া গেলে আমায় না-দেখিতে পাইবার কথা। ওরা নিজেদের আবদারের খেলা লইয়া দু-জনেই বরাবর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। মিসিস রায় দু-একবার গোপনে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, মানে তাহার নিশ্চয়ই এই—দরকার নেই জানিয়ে তোমার উপস্থিতির কথাটা, চুপ করে দেখ না তামাশাটা।

যিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া এইমাত্র পরিচয় পাইলাম, তাঁহার মধ্যে এই দুর্বলতা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। উনিও যেন ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে, সন্তান লইয়া তাঁহার এই নবমাতৃত্বের খেলায় কোন বাধা উপস্থিত হয়।

মা যেমন সন্তানদের বয়স হইতে দেয় না, সন্তানেরাও তেমনই মায়েদেরও নিজেদের বয়সের সঙ্গে টানিয়া রাখে।

মিসিস রায় তরুর হাতটা ধরিয়া নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এই সোফাটার হাতলের ওপর এসে বরং ব'স তরু, বড় বোনের সঙ্গে কি জেদাজেদি করে?···তোরা কিন্তু সাততাড়াতাড়ি চলে এলিকেন বললিনি তো মীরা?"

তরু মায়ের আহ্বানে রাজি হইল না। মুখটা গোঁজ করিয়া নাঁকিস্বরে বলিল—"সরেঁা বলছি দিঁ দিঁ, নৈলে···"

মীরা ওদিকে কান না-দিয়া বলিল, "ভাল লাগছিল না মা একেবারে—মাথাব্যথার নাম করে পালিয়ে এলাম।···মাথাব্যথাটা কী চমৎকার জিনিস মা!···"

মিসিস রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, চমৎকার কিরে! সত্যি করেনি তোর মাথাব্যথা?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "এই দেখ মায় বুদ্ধি! সত্যি হলে কখনও চমৎকার হয়?

চমৎকার বলছিলাম—এর জোরে স্কুল থেকে পালিয়েছি, পার্টি থেকে পালাচ্ছি—ব্যথা করার জন্যে মাথাটা যদি না থাকত তাহলে কি অবস্থাটাই যে হত ভাবতে মাথা গুলিয়ে যায়।"

মিসিস রায় হাসিয়া চকিতে একবার আমার পানে চাহিলেন। তরু বলিল, "মাথাব্যথা না হাতী! কিসের জন্যে মাথাব্যথা আমি সব জানি।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, জান তো চুপ করে থাক মশাই। তুমি আজকাল একটু বেশি ফাজিল হয়ে পড়েছ তরু।"

তরু বলিল, "তুমি সব না।"

মীরা মায়ের হাঁটু দুইটা আরও জড়াইয়া বলিল, "না, সরব না।"

একটু চুপচাপ গেল। মিসিস রায়ের স্মিতহাস্যটা আরও একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার উপস্থিতিটা যে পাকেচক্রে এখনও অপরিজ্ঞাত ইহাতে মুখে কৌতুকের ভাবটাও আরও স্ফুটতর। একটু যেন সংকোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে কে এসেছিল পার্টিতে?—মিস্টার লাহিড়ীর বাড়ির সবাই এসেছিলেন? নীরেশ এসেছিল?"

শেষের এই প্রশ্নটুকুতে মীরা যেন মুখটা আরও একটু গুঁজিয়া লইল।

প্রশ্নটা অনির্দিষ্টভাবে করিলেও আসলে মীরাকেই করা হইয়াছিল। কন্যার সংকোচে, শুধরাইয়া লইবার জন্য মিসিস রায় আবার তরুর দিকে চাহিয়া প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিলেন, "আমাদের নীরেশ এসেছিল তরু? কে কে সব এসেছিল?"

পিছন ফিরিয়া থাকিলেও বুঝিলাম তরু হাতের রুমালটার একটা কোণ দাঁতে চাপিয়া রুমালটাতে মুঠার টান দিতে দিতে মসৃণ করিতেছে, এই নবতর প্রসঙ্গে সে যেমন মায়ের কোল ভুলিয়াছে—তাহাতে তাহার চোখে-মুখে যে একটা কৌতুকের হাসিও ফুটিয়া উঠিয়াছে, না দেখিতে পাইলেও এটা আমি আন্দাজ করিতেছি। মাথাটা নাড়িয়া উত্তর করিল, "না, নীরেশ-দা আসেননি মা, তবে নিশীথ-দা আগেই এসেছিলেন, আমাদের মোটর পৌঁছুতে মিসেস মল্লিকের সঙ্গে তিনিই এসে নামালেন আমাদের, আবার দিদি যখন মাথাব্যথা বলে⋯"

মীরা মায়ের কোলের মধ্যে মুখটা ঘুরাইয়া বলিল, "একটু অতিরিক্ত বাচাল হয়েছ তুমি তরু। তুমি এখানে কেন? তোমার মাস্টারমশায়ের কাছে যাও।"

তরু কোলের কথা ভুলিয়া গিয়াছে; অন্যমনস্কভাবে গিয়া মায়ের সোফার হাতলের উপর বসিয়া মায়ের বুকে লুটাইয়া তর্কের সুরে বলিল, "বা—রে, আর তুমি কেন এখানে?"

মীরা বলিল, "আমার ঢের কাজ আছে। আমি তোমার পড়ার সম্বন্ধে মার সঙ্গে পরামর্শ করব।"

আমি এদিকে বেজায় অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছি। যতটা আন্দাজ করা গিয়াছিল

তাহার চেয়ে বেশি সময় আমার উপস্থিতিটা অজ্ঞাত রহিল। ইহার মধ্যে কথায় কথায় নীরেশ লাহিড়ীর ও নিশীথের সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গটুকু আসিয়া পড়িল সেটুকু শোনা আমার উচিত হয় নাই, তাহার উপর আবার আমার উল্লেখ হইয়া গেল। মিসিস রায় কথাটা প্রকাশ করিতেছেন না ; অথচ যে হঠাৎ কি করিয়া নিজেকে এদের সামনে ধরিব মোটেই ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। নিজেকে প্রকাশ করিলেই এতটা সময়ের অপ্রকাশের অপরাধ লইয়াই প্রকাশ করিতে হইবে ; অথচ সেই অপরাধটা প্রতি মুহূর্তেই বাড়িয়া যাইতেছে !

এদিকে হঠাৎ দু-জনের যে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবার ফাঁড়াটা মাথায় ঝুলিতেছে। মীরা যে-কোন মুহূর্তেই উঠিয়া পড়িতে পারে, কিংবা এদিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে। তরুর নজরে তো পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিলেই হয় ; আগাইয়া গিয়া এদিকে পিছন ফিরিয়াই মায়ের বুকে লতাইয়া পড়িল , তাহা না করিয়া সোফার হাতলে বসিয়া এই দিকে মুখ করিয়াই তো বোনের সঙ্গে তর্ক চালাইবার কথা। ও-ও বোধ হয় মাকে যথাসাধ্য দখল করিল ; কিন্তু এদিকে সোজাসুজি একবার মুখ করিলে আমার ধরা পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য।

মিসিস রায় এখনও কথাটা ভাঙিতেছেন না কেন ? সন্তান লইয়া এই মোহ ওঁকে কি আমার নিদারুণ অবস্থা সম্বন্ধে এতই অচেতন করিয়া তুলিয়াছে?··· ঘামিয়া উঠিতেছি।

মীরার কথায় তরু উত্তর করিল, "বেশ তো, আমার পড়ার কথাই তো ?—কর না পরামর্শ, শুনি !"

মিসিস রায়ের একটি হাত তরুর মাথায়, একটি হাত মীরার বেণীর উপর—দুইটিই ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। বাৎসল্যের স্রোত যেন দুইটি ধারায় নামিয়া আসিতেছে।

মীরা বলিল, "নিজের সম্বন্ধে সব কথা শোনা চলে না।"

তরু বলিল, "খুব চলে।"

মীরা বলিল, "ধর, যদি তোমার বিয়ের কথা হত, থাকতে বসে ?"

তর্কটার গলদ খুব স্পষ্ট ; কিন্তু উত্তর দেবার উপায় ছিল না এবং সেখানেই মীরার জিত। তরু মুখটা আরও গুঁজিয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "মা !"

তাহার পর কোলের মধ্যেই মাথাটা একটু ঘুরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মাস্টারমশাই বেড়াতে গেছেন ; তাঁকে এখন পাব না।"

মীরা বলিল, "যাননি বেড়াতে, তোমার মাস্টারমশাই ভয়ানক কুনো !'

মিসিস রায় কন্যাদ্বয়ের মাথার উপর দিয়া আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন।

তরু অনুযোগ করিল, "দেখছ মা, মাস্টারমশাইয়ের নিন্দে করছে দিদি !"

হার-জিতের দিক-পরিবর্তন হইয়াছে,—মীরা আরও রাগিয়া বলিল, "তোমার মাস্টারমশাই ভাল মানুষ, মুখচোরা, লাজুক, অমন মানুষেরা হয় বোমা করে, নয় বেকার কবি হয়—দু'জনের একজনকেও আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। সুতরাং যখনই তাঁর কথা উঠবে, তখনই নিন্দে ভিন্ন সুখ্যাতি বেরুবে না আমার মুখ দিয়ে!"

তরু মুখ ঘুরাইয়া দিদির মুখের উপর দৃষ্টি নত করিয়া একটু হাসিল, ভ্রূ উঁচাইয়া বলিল, "ইস্, আমি যেন জানিনে!···"

মীরা মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি জান শুনি?"

সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক, মেলা বাচালগিরি করে না।"

তরু শেষের হুকুমটা কানে তুলিল না, বলিল, "তুমি এই দু'জনকেই বেশি পছন্দ কর।"

আমার তখন যে কি অবস্থা! তরুর দৃষ্টিটা শুধু একটু তুলিতে দেরি!

মিসিস রায়ও যেন ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন,—কথাটার যে এমনভাবে মোড় ফিরিবে, আর এত অতর্কিতে—মোটেই আশঙ্কা করেন নাই। আমার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিতেছেন না। তরুকে মানা করিতে পারিতেছেন না। তরু নিতান্ত নিরীহভাবে তর্কের ঝোঁকে কথাটা বলিতেছে,—মানা করিতে গেলেই কোথায় আপত্তির প্রচ্ছন্ন কারণ আছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেটা হইবে আরও বিসদৃশ।

মীরা ধমকাইল, "চুপ কর তরু; তোমার কানে ধরে বলতে গিয়েছিলাম?"

তরুর জয়ের নেশা লাগিয়াছে। মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "সত্যি বলছি মা, দিদি ওর সই রমাদিকে বলেছে—ওর ভাল লাগে কবি, নয় তো···হ্যাঁ, সত্যি বলছি,—রমাদির বোন সতী আমায় বলেছে···"

মীরা অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "তরু!"

তরু মায়ের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "বাঃ, এতে ধমকের কি আছে মা? উনি বলছেন, মাস্টারমশাইকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না! আমি দেখাব না যে···আচ্ছা, এবার বল তো দিদি—সেদিন····"

উৎসাহের ঝোঁকে দিদির দিকে মুখ তুলিয়া ফিরিতে গিয়া তরু স্তম্ভিত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল, বলিয়া উঠিল, "ওমা! মাস্টারমশাই যে!"

আর দৃষ্টি না পড়িয়া উপায় ছিল না, কেননা, আমি প্রবল অস্বস্তিতে অন্যমনস্ক-ভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি।

মীরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া খানিকটা মুখ নীচু করিয়াই রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকৃতিতে স্পষ্ট দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করিয়াছিল যে মীরা,—শান্ত, দৃপ্ত, আরও একটা কি যেন। সকলেই আমরা প্রস্তরবৎ স্থাণু হইয়া গিয়াছি।

নিয়োগের সময় মাহিনার কথায় আমি যখন বলি—"আপনাদের যা সুবিধে হয় অনুগ্রহ করে দেওয়া"—সে সময় মীরার নাসিকার ডান দিকে যে কুঞ্চনটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটা আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মিসিস রায়ের মুখেও একটা ভয়ের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল,—এখনই একটা অঘটন ঘটাইয়া বসিবে মীরা, আমার এই চৌর্যবৃত্তির জন্য—এই অলক্ষ্যে সব কথা শুনিবার জন্য। তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যেই হঠাৎ আবার মুখটা তাঁহার প্রসন্ন হাস্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা ব'স শৈলেন, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? তোমার ছাত্রীরই পড়ার কথা হচ্ছিল।"

আমি যত দিন এখানে ছিলাম তাহার মধ্যে মাত্র দুই দিন এই মহীয়সী নারীকে মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এই এক। আমায় বাঁচানো দরকার ছিল, উনি সেই জন্য নিজের জিহ্বা কলুষিত করিলেন।

মীরা একবার মায়ের পানে চাহিল—যাচাইয়ের দৃষ্টিতে, তাহার পর তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চন ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মীরা মাকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাঁহার মিথ্যায় প্রবঞ্চিত হইয়াছে। বিশ্বাস করিয়াছে যে, আমি এই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এখনও আসন গ্রহণ করি নাই। সুতরাং এক-আধটা শেষের কথা যদি কানেও গিয়া থাকে তো তাহার প্রাসঙ্গিক মানেটা নিশ্চয় ধরা পড়ে নাই আমার কাছে। কতকটা ভাবহীন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

ওর মায়ের অনুরোধে নয়, অনুরোধের সুরে ঢালা ওর হুকুমে ধীরে ধীরে আবার উপবেশন করিলাম।

কিন্তু কোথায় কি একটা রহিয়া গেল যেন, কথাবার্তা আর জমিল না। আমার মনে হইল মায়ের কথা যদি বিশ্বাস করিয়াও থাকে, না বলিয়া নিঃসাড়ে প্রবেশ করিবার গ্রাম্যতাটা মীরা অন্তর দিয়া ক্ষমা করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে একটা ছুতা করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৬

দশ দিন হইল আসিয়াছি; রবিতে রবিতে আট দিন গিয়াছে, কাল সোম আজ মঙ্গল। মন্দ লাগিতেছে না। আমরা, যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে থাকি, বড়-মানুষ হওয়াটাকে সাধারণতঃ একটা অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লই, সেই জন্য উহাদের সম্বন্ধে কতকগুলো মনগড়া ধারণা করিয়া বসি। ভ্রান্ত ধারণাগুলি একে একে বিদায়

লইয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমায় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া দিতেছে। দেখিতেছি যেমন 'বিলাত দেশটা মাটির', তেমনই আবার বড় মানুষেরাও মানুষ,—মানুষের অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনই আবার মানুষের চেয়ে কমও কিছু নয়। ধারণা ছিল শুধু দুঃখের দাহনই খাদ নষ্ট করিয়া খাঁটি মানুষের সৃষ্টি করে; এখন দেখিতেছি সুখের মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব। সত্যই তো, মানুষ আওতাতেও যখন বাড়িবার শক্তি রাখে তখন আলো-বাতাসের স্বচ্ছন্দতায় কেন বাঁড়িবে না ?

কথাটাকে আরও একটু বাড়াইয়া বলা। আলো-বাতাস কিংবা আওতা তাহার মনে; বাহিরের অনুকূল অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল, অনিল বলে, "ভাই,—আসলে সুখ-দুঃখ অর্থ-দারিদ্র্যের মধ্যে কোন তফাত নেই, কাজেই খাঁটি মনের ওপর কোনটারই দাগ পড়ে না। মানুষ জা‌তটাই মামলাবাজের জাত, ঘর-ভাঙবার জা‌ত—অন্নপূর্ণা আর শিবকে চায় আলাদা করতে। একজনকে কাঁধে ফেলে হাত পাতায়, একজনকে দিয়ে সেই হাতের আঁজলার ওপর সোনার হাতা ওলটায়; ভাবে এবার বুঝি ভাঙল মন দু'জনের, পাক্‌লো মামলা। দু'জনে কিন্তু সুখ-দুঃখের যুগ্মরূপে চিরদিনই সেই একই চালার মধ্যে কাটিয়ে আসছেন, কাটাবেনও।"

একটু দার্শনিক উচ্ছ্বাস আসিয়া গেল কি ? আসলে কথাগুলা মনে আসিয়া পড়িল মীরার মা অপর্ণা দেবীর কথা তুলিতে গিয়া।—সুখের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রসঙ্গে।

উনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের এক পুরাতন রাজবাড়ির মেয়ে। জ্যাঠা-বাপ-খুড়ারা এখন কুমার-বাহাদুর, ছোট কুমার, মেজ কুমারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু ঠাকুরদাদা পর্যন্ত, কুহেলী-আবৃত অতীত হইতে সবাই 'রাজা-বাহাদুর,' 'রাজা-সাহেব,' 'রাজা' খেতাব ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। অথচ মনে হয় এ-বাড়ির আর সবাই এ-কথাটি জানিলেও অপর্ণা দেবী নিজে যেন জানেন না।

বাড়ির মধ্যে ওঁর স্থানটি একটু অদ্ভুত গোছের। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে যেন উনি একটি বৈরাগ্য-আশ্রম রচনা করিয়া বাস করি‌তেছেন। অপর্ণা দেবীর জ্ঞানের গভীরতার একটু আভাস এক জায়গায় দিয়াছি পরে জানা গেল ওঁর একটা কলেজ-জীবনও ছিল। সেই জীবনের কৃতিত্বও এত বে‌শি যে ওঁর অভিভাবকেরা ওঁকে বিলাত পাঠাইবার লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই, যদিও সেযুগে ওটা প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। অভিভাবকের মধ্যে পিতৃপক্ষ শ্বশুরপক্ষ উভয়পক্ষই ছিলেন, কেননা তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এত উগ্র আলোকের নেশার যে একেবারেই কারণ ছিল না এমন নয়,—উভয়পক্ষেই কয়েকজন আই-সি-এস্, ব্যারিস্টার ছিল, অর্থাৎ বিলাত জিনিসটা অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিলাতে,

ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারি খানা খাইতেছেন ; কথা হইল তিনি আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইবেন, স্ত্রী গিয়া কেম্বিজে ভর্তি হইবেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী কন্যা,—ওঁকে লইয়া অসাধারণ রকম কিছু একটা করিতেউভয়পক্ষই যেন মাতিয়া উঠিলেন।

সব ঠিকঠাক, অপর্ণা দেবী পা বাড়াইয়া আবার টানিয়া লইলেন।

তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসিতে লাগিল। যথাসময়ে স্বামী গুরুপ্রসাদ সাহেবী দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন এবং তালিম লইয়া ব্যারিস্টার মূর্তিতে ফিরিলেন। স্ত্রীকে বিলাতে না পান, একটা সান্ত্বনা ছিল বিলাতকে স্ত্রীর নিকট হাজির করিতেছেন। দেখিলেন স্ত্রী কালী ঘাটের কালী হইতে রবিবর্মার কমলা পর্যন্ত উগ্র শান্ত হরেক রকম দেবদেবীর আশ্রয়ে। পত্রাদিতে কোনরকম আঁচ পান নাই, একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। প্রায় বৎসর দুই ধরিয়া অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু তাঁহাকে সন্তীচ্যুত করা গেল না। এই সময়ে অপর দিকের ইতিহাস মীরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম—সে প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা। প্রায় ছয় বৎসর পরে মীরার জন্ম, আরও নয়-দশ বৎসর পরে জন্ম তরুর।

এই দশ দিনে জানা গেল মীরার দাদা নীতিশকে লইয়া এই বাড়িতে একটা ট্র্যাজেডির সুর আছে এবং এটাও বুঝিয়াছি এ-সুর অর্পণা দেবীর জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশি। জীবনের সঙ্গে অর্পণা দেবীর একটা সুস্থ ভোগের সম্বন্ধ আর নাই, উনি যেন সংসারে আছেন অথচ নাই-ও। দোতলার এক প্রান্তে নিজের ঘরটিতেই থাকেন বেশিক্ষণ, যতদূর জানিতে পারিয়াছি সাথী ওঁর অধিক সময়েই বই। কক্ষত্যাগের নিয়মিত সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুইটি,—এক সকালে, স্বামী যখন আহারে বসেন ;আর এক রাত্রে, স্বামী, মীরা, তরু—সকলে যখন আহারে বসে। উনি যে সংসারে আছেন এই সময়টা একবার করিয়া মনে পড়ে সবার। আমিও মীরাদের সঙ্গেই আহার করি, গল্পে নামাইবার চেষ্টা করি অর্পনা দেবীকে। এক-এক দিন উচ্ছ্বসিত স্রোতে নামিয়া পড়েন, অনেক আলোচনা হয়, হাল্কা এবং গুরুও—যেমন প্রথম দিন হইয়াছিল। এক-এক দিন অপর্ণা দেবী থাকেন অন্যমনস্ক, স্বল্পবাক্, ঘরটাতে একটা থমথমে ভাব জমিয়া থাকে, মীরাদের কি হয় জানি না, আমার তো আহার্যগুলাও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

আহারের সময় ব্যতীত এই দশ দিনে মাত্র তিনবার অপর্ণা দেবীকে তাঁহার কক্ষের বাহিরে দেখিয়াছি ; দুই দিন অপরাহ্ণে, বাগানের মধ্যে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বাগানটায় এই কয়দিনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। কাঁচির শাসন অবশ্য পূর্বরূপই, তবে নূতন বসন্তের সাড়া পাইয়া যেখানে যা ফুল ছিল এই শেষের দিকে সাত-আট দিনে যেন হুড়াহুড়ি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা রঙের কাপড়-চোপড়

পরা একপাল শিশু যেন কোথায় আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ মুক্তি পাইয়াছে। নূতন বসন্তের আতপ্ত অপরাহ্ণে রঙে-গন্ধে বোঝাই এই বাগানটা আমায় অমোঘ আকর্ষণে টানে। দুই দিন অপর্ণা দেবীও নামিয়া আসিয়াছিলেন। একদিন আলোচনা হইল ফুল সম্বন্ধে, কিছু উচ্ছ্বসিত আলোচনা। প্রত্যেকটি ফুলের নাম জানেন, অনেকগুলার ইতিহাস জানেন। ইহার আগে জানিতামই না যে, ফুলের আবার একটা ইতিহাস আছে এবং সেটা রাজারাজড়ার ইতিহাসের মত শিখিবার জিনিস। গল্প করিতে করিতে বেড়াইতে ছিলাম পরিচয় দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ একটা বিচিত্র বর্ণের মরশুমী ফুলের বেডের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ঘুরিয়া বলিলেন—"শৈলেন, এত ভাল লাগে আমার শীতের মাঝখান থেকে বসন্তের গোড়া পর্যন্ত এই সময়টা, সমস্ত বছর যেন প্রতীক্ষা করে থাকি। জান তো এ ফুলগুলো ওদের দেশের মাঝ-বসন্তের ফুল, আমাদের দেশে ফুটতে আরম্ভ করে বেশ একটু শীত পড়লে। ওরা এই সব দিয়ে আমাদের শীতের চেহারা বদলে দিয়েছে। ঐ ফুলগুলো চিরস্থায়ী হল এদেশে, আরও ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে এইগুলো থাকবে সান্ত্বনা হয়ে ·"

শুধু কথাগুলা নয়, বলিবার সময় ওঁর চেহারাও হইয়া উঠিয়াছিল অপরূপ। কতক যেন আবেশভরে বলিয়া যাইতেছেন—আয়ত চক্ষু দুইটি স্থির দৃষ্টিতে উপরে নীচে এক-এক জায়গায় বা আমার মুখের উপব এক-একবার নিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন। একটু যে বেশি ভাবালু হইয়া পড়িয়াছেন, আমি যে খুব বেশি পরিচিত নই এখনও; সে-সব দিকে লক্ষ্য নাই। উনি যেন চেষ্টা করিয়া কিছু বলিতেছেন না ওঁর অন্তর্লোকে যে-সব ভাবনা উঠিতেছে সেগুলাই যেন আপনা হইতে বাক্যে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র!—সেদিন ওঁর ইংরেজী বলিবার মধ্যেও এই জিনিসটি লক্ষ্য করিয়াছিলাম;—যা অন্তরে জাগে তা প্রকাশ করিবার মধ্যে সংকোচ বা কৃপণতা থাকে না।

এমন অনাবিল কবি-প্রকৃতি আমার নজরে আর পড়ে নাই।

কয়েক দিন পরে আর একবার ওঁকে বাগানে দেখি, দুপুর গড়াইযা গিয়াছে। আমি একটা ঘনপল্লবিত কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় একটি বেঞ্চে বসিয়া বই পড়িতেছিলাম, হঠাৎ ওঁর শাড়ির চওড়া পাড়ের উপর নজর পড়িয়া যাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অপর্ণা দেবী সস্মিত বদনে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ব'স তুমি।"

তাহার পর আগাইয়া গেলেন। বুঝিলাম আজ আরও পুষ্পাবিষ্ট!·· প্রায় ঘণ্টা-খানেক ছোট বাগানটিতে নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন।

এই দুই দিন।

৭

আরও একদিন তাঁহাকে বাহিরে দেখিয়াছিলাম। দিনটা কখনও ভুলিব না।

আমার রুটিনের মধ্যে একটা কাজ বৈকালে তরুকে লইয়া মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া; পূর্বে যে-সময়টা কলেজ হইতে ফিরিবার পথে তিনবার ইউনিভার্সিটি-ফেরত সেই ধাড়ি ছেলেটাকে লইয়া কসরৎ করিতে হইত।

মোটর আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। তরুর কি কারণে উপরে একটু বিলম্ব হইতেছে, আমি বেয়ারাটাকে তাগাদায় পাঠাইয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি।

মোটরের ক্লীনারটা গেট খুলিতে গিয়াছিল; হঠাৎ কানে আসিল সেখানে কাহার সহিত চেঁচামেচি লাগাইয়াছে। গাড়িবারান্দার বাহির দিকটায় তারের জাল বসাইয়া এক ঝাড় মর্ণিং গ্লোরির লতা তোলা হইয়াছে; ও-দিকটা দেখা যায় না। বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম ক্লীনারটা একটা ভুটানী বুড়ীর সহিত বচসা করিতেছে। ভুটানীটা বোধ হয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; গেটটা খোলা পাইয়া ভিতরে আসিবে, ক্লীনার আসিতে দিবে না। লোকটা অত্যন্ত ভীরু। ভীরু লোকদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা দুর্বল দেখিলে অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে, বোধ হয় এই করিয়া নিজেদের চরিত্রের ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে। বুড়ীকে দেখিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব তম্বি করিতেছে। ভুটানীটার মুখে আর কোন কথা নাই, অত্যন্ত দীন মিনতির সঙ্গে গ্রীবা হেলাইয়া এক-একবার কপালে হাত দিয়া সেলাম করিতেছে, এক-একবার ধীরে ধীরে হাতটা বুকে চাপিয়া বলিতেছে—"বেটা বেটা!" অত্যন্ত কাহিল, বাঁ-হাতে গেটের একটা ছড় চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমায় দেখিয়া ক্লীনার গলা উঁচাইয়া রসিকতা করিয়া বলিল, "কি আমার লবদুর্গার মত চারদিক আলো করে মাঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর বেটা হতে হবে!...ভাগো জলদি; নেই তো মোটরমে থ্যাঁৎলায়ে দেগা..."

ভুটানীটা যেন আর পারিল না; হাত তাহার আল্‌গা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে —"বেটা—বেটা!" বলিয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাতে বুক চাপিয়া সুরকির উপর বসিয়া পড়িল। ক্লীনারটা আর এক ঝোঁকে পৌরুষের সঙ্গে তাহাকে বোধ হয় টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, উপর তলায় অর্পণা দেবীর ঘর হইতে উৎসুক প্রশ্ন হইল—"কি বলছে ও মদন?—কি বলছে? বেটার কি হয়েছে ওর?"

দেখি অপর্ণা দেবী জানালা খুলিয়া দুইটা গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভাব, মুখটা ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, অমন শান্ত চক্ষু দুইটাতে

রাজ্যের উদ্বেগ। কিছু বুঝিলাম না; এমন কি হইয়াছে যাহার জন্যে তিনি এত বিচলিত একেবারে!

মদন বলিল, "দেখুন না মা, 'ব্যাটা-ব্যাটা' করে ভুজুং দিয়ে ভেতরে আসবার মতলব; গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, ব্যাটা হও ওনার!"

আবার টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, অর্পণা দেবী কর্কশকণ্ঠে একরকম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও ওকে! চলে এস তুমি, তোমার ব্যাটা হতে হবে না, ভাবনা নেই তোমার! ·এলে চলে? ·"

হঠাৎ জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন এবং বেশ বোঝা গেল অত্যন্ত চঞ্চল এবং অধৈর্য গতিতে নামিয়া আসিতেছেন। বাহিরে যাহারা ছিল সবার মুখে একটা স্তম্ভিত ভাব, সবাই সবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। অপর্ণা দেবী চাকরবাকরকে একটা উঁচু কথা বলেন না, আর এ একেবারে রূঢ় হইয়া পড়া! ক্লীনার মদন মাথাটা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া মোটরটার কাছে দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে ভূটানীর সামনে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক হাতে তাহার বক্ষোলগ্ন একটা হাত ধরিয়া অপর হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলেন, "কেয়া হুয়া হ্যায় বেটাকা?"

ভুটানীটা একবার মুখের পানে চাহিল, স্ত্রীলোক দেখিয়া আরও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল, বুকটা চাপিয়া বলিল, "বেটা—বেটা!···"

আমরা গিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছি। জায়গাটা নূতন আর বিরলবসতি হইলেও নিতান্ত রাস্তার ধারের ঘটনা—গেটের বাহিরে জনকয়েক লোক জড় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত খাপছাড়া দেখাইতেছে ব্যাপারটা,—অতিশয় নোংরা ময়লা আর ছেঁড়া, পুরু, ওদেশের লুঙ্গিপরা সেই ভুটানী, আর তাহার পাশেই এই অভিজাত মহিলা,—আশ্চর্যভাবে অধীর, কতকটা যেন পাগলের মত।··তরুর মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, চাকরদের সবাই ভীত, আমার মাথায় কোন ধারণাই আসিতেছে না—ব্যাপারটা কি। মীরা থাকিলেও না-হয় একটা কোন ব্যবস্থা হইত, সে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

অপর্ণা দেবী আমার মুখের দিকে একটু ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভয়ানক মুশকিলে পড়া গেলতো শৈলেন, ও আমার কথা বুঝতে পারবে না, অথচ এটা ঠিক যে ওর ছেলে নিয়ে উৎকট রকম কিছু একটা হয়েছে—আমি বুঝতে পারছি কি না···"

একবার প্রায় উপস্থিত সকলের মুখের দিকে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া লইয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন, "কি করা যায় বল দিকিন?"

বুড়ী বুক চাপিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে, তাহার জীর্ণ গালের রেখা বহিয়া অশ্রু

নামিয়াছে। বুক চাপিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে মাথা দুলাইতেছে, আর ঐ এক বুলি—"বেটা—বেটা!"

আমাদের পাশের বাড়িটা একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানের—এ বাড়ির সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, "পাশে এ বাড়িতে ভুটানী আয়া-টায়া নেই কি? আজকাল সায়েবরা প্রায় নেপালী কিংবা ভুটানীই রাখে।

অপর্ণা দেবীর মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বোধ হয় মুহূর্তমাত্র সময় যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য আমায় কিছু না বলিয়া একেবারে তরুকে বলিলেন, "ঠিক, যাও তো তরু মিসিস রিচার্ডসনকে বল—**Auntie will you please spare your** ayah **for a couple of minutes?—Mummy wants her badly,** ..run, there's a **dear**." (খুড়িমা, তোমার আয়াকে মিনিট দুয়েকের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে কি? মার বিশেষ দরকার ·দৌড়োও, লক্ষ্মীটি।)

বুঝিলাম উগ্র উত্তেজনায় অপর্ণা দেবীর সংযত জীবন ভেদ করিয়া তাঁহার কলেজ-যুগের কয়েকটা মুহূর্ত আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়ের সঙ্গে তাঁহাকে ইহার আগে এমনি কখনও ইংরেজী বলিতে শুনি নাই, পরেও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; এ-বিষয়ে তাঁহার স্বদেশীয়ানা। অত্যন্ত কড়া

আন্দাজ আমার ঠিক ছিল; একটা ঐ জাতেরই আয়া আসিয়া অপর্ণা দেবীকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা দেবী তাহাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিলেন, "একে জিজ্ঞাসা কর তো এর ছেলে সম্বন্ধে কি বলতে চায়—কি হয়েছে তার?"

চীনা ভাষার মত একটা ভাষায় উহাদের মধ্যে খানিকটা কি প্রশ্নোত্তর হইল। বৃদ্ধার কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া দিল—বুড়ির ছেলে আজ বৎসরাবধি নিরুদ্দেশ। গত বৎসর শীতে তাহারা কয়জন মিলিয়া কুকুর, ছাগল, চামরী-গরুর লেজ, হরিণ আর ছাগলের চামড়া প্রভৃতি লইয়া হিন্দুস্থানে ব্যবসা করিতে নামিয়াছিল। একদল গত বৎসরেই শীতের শেষে ফিরিয়া যায়। তাহার ছেলে তাহাদের মধ্যে ছিল না। গ্রামের একটি লোকের মারফত মায়ের জন্য সাতটি টাকা ও একটা ফুলকাটা জলজলে গোলাপী রঙের ইটালীয়ান র‍্যাপার কিনিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর খবর দেয় যে, তাহারা মাস দুয়েকের মধ্যে ফিরিবে। পাশের গ্রামের আর একটি দম্পতি নামিয়াছিল। দুই মাস নয়, মাস-পাঁচেক পরে তাহারা ফিরিল, বৃদ্ধার সহিত দেখা করিয়া পাঁচটা টাকা আর চব্বিশ-ফলার একটা ছুরি দিয়া বলিল—ছেলে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাদের হাজার বলা সত্ত্বেও কোনও মতে ফিরিল না। অন্য পথে একদল ভুটিয়া নামিয়াছিল, তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায় খুব সম্ভবত সেই দলের একটি তরুণীর আকর্ষণে—বলে মায়ের বড় কষ্ট, হিন্দুস্থানে কিছু রোজগার

করিয়া সে একেবারে ফিরিবে।

বৃদ্ধা বুকেব উপর হইতে নকল প্রবালের তিন-চার ছড়া মালা সরাইয়া জামার ভিতর হইতে সযত্নে পাট-কবা একটা গোলাপী রঙের ফুলকাটা র‍্যাপাব আর একটা নানা ফলাব ছুরি বাহির করিযা সাশ্রুলোচনে মাথা দোলাইযা আয়াকে কি বলিল। আয়া অপর্ণা দেবীকে বলিল—"বলছে, ও বুদ্ধেব মালা ছুঁযে শপথ করছে, ব্যাটার বউকে কিছু বলবে না, একটুও কষ্ট দেবে না, এই ব্যাপার আব ছুরি তাকেই যৌতুক দিযে দেবে, তাই কখনও নিজেব কাছ-ছাড়া করে না।"

দৃশ্যটা বড়ই করুণ, অনেকের চক্ষে জল আসিল, শুধু অপর্ণা দেবীব চক্ষু দুইটা যেন অধিকতব উত্তেজনায আবও শুষ্ক ও দীপ্ত হইযা উঠিল। একবাব আমাব দিকে একবার আযাব দিকে চাহিযা বিহ্বলভাবে বলিলেন, "এত লোকেব মাঝখানে খোঁজা আ‍‍ সে কোন্ শহবে আছে তাই বা কে জানে?"

হঠাৎ আযার উপব দৃষ্টি নিবদ্ধ কবিযা বলিলেন, "আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে কলকাতায এল কেন খুঁজতে ও?"

কি উত্তব দেয শুনিবার জন্যে আগ্রহে চক্ষু দুইটা যেন তাঁহার ঠিকবাইয়া বাহির হইযা আসিতেছিল।

টের পাওযা গেল—পাহাড় হইতে নামিযা বৃদ্ধা খবর পাইল কলিকাতা সবচেয়ে জনবহুল জাযগা, অনেক ভুটিযাও প্রতি বৎসব এখানে আসে, তাই সে বারটি টাকা সংগতি কবিযা পবশু এখানে আসিযা পড়িযাছে। তাহাদের গ্রামে তেরটি ঘরের বসতি, অনেক ছেলেবেলায একবাব ভুটানেব বাজধানী পানাখা দেখিয়াছিল, মহানগবী সম্বন্ধে কোন ধাবণা ছিল না,—এখানে আসিযা একেবারে অথৈ জলে পড়িয়া গিযাছে। এখনও পর্যন্ত একটি ভুটিযাব মুখ দেখে নাই, কেহ কথা বোঝে না, হাতে পযসা নাই, আজ সকাল থেকে কিছু খায নাই। সবচেযে নিরাশাব কথা—বুদ্ধ তাহাকে দযা কবিযা নিজের কাছে ডাব দিয়াছেন মুক্তি খুবই কাছে, কিন্তু ছেলেকে একবাব শেষ দেখিবাব সম্ভাবনাটা একেবারেই সুদূর হইযা পড়িযাছে।

অপর্ণা দেবী আরও আশ্চর্য কাণ্ড করিযা বসিলেন,—যেমন আশ্চর্য, তেমনি অশোভন, দাঁড়াইযা শুনিতেছিলেন, হঠাৎ বসিযা পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে বুকে জড়াইযা ধরিযা পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মিলেগা—বেটা মিলেগা, চলো উঠো, বুঢীমাঈ, উঠো।"

এই অপ্রত্যাশিত সমবেদনায বৃদ্ধা যেন একেবারে মুষড়াইয়া গেল। মাঝে মাঝে যে "বেটা—বেটা" করিতেছিল সেটাও বাহির হয় না মুখ দিয়া; শুধু চাপা কান্নার আওযাজ—জীর্ণ শরীরটা যেন শতধা ভাঙিয়া পড়িবে। বুঝিতে পারিলাম—অপর্ণা

দেবীরও কান্না নামিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শমিত হৃদয়াবেগ লইয়া অপর্ণা দেবী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, "উঠো।"

বৃদ্ধা ডান হাতে লোহার গরাদ ধরিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল। অপর্ণা দেবী তাহার বাঁ-হাতটা নিজের বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান হাতে তাহার পিঠটা জড়াইয়া, ধীরে ধীরে সুরকির রাস্তা অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। যেন একই শোকে আচ্ছন্না দুইটি সখী—সব জিনিসেরই অমিল—জাতির, বয়সের, সজ্জার, শুচিতার,—মিল শুধু এইটুকুতে যে, দু'জনের বুকে একই ব্যথা—হৃদয়ের একই তন্ত্রীতে ঘা পড়িয়াছে।

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম সেই রাত্রে।

তরু পড়িতেছে, আমি কিছু অন্যমনস্ক,—আজ বিকাল হইতে মনের সামনে একটা ছবি মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সুদূর হিমালয়ের এক জনবিরল পল্লীতে, একখানি গৃহে প্রবাসী পুত্রের পথ চাহিয়া এক বৃদ্ধা,—দিন যায়, মাস যায়, বৎসর ঘুরিয়া গেল পরিত্যক্ত ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দুর্বল কম্পিত চরণে বৃদ্ধা পাহাড়ের বিসর্পিত পথ বাহিয়া নামিতেছে,—ঘরের স্মৃতির সঙ্গে পাহাড়ের স্তূপ পিছনে পড়িয়া রহিল সামনে প্রসারিত হিন্দুস্থানের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতল কোথায় পুত্র? যোজনপ্রসারী দৃষ্টির মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না মরীচিকার মত কলিকাতার উর্মিল আকাশরেখা—সেই মরীচিকার মধ্যে বিকৃত তৃষ্ণা—"বেটা!—বেটা!" তাহার পর বিকালের সেই সমস্ত দৃশ্যটা, যাহার অর্থ এখনও ঠিকমত মাথায় আসিতেছে না · "বেটা—বেটা!" আর সেই বেদনাতুর অবোধ সান্ত্বনা—"উঠো, বেটা মিলেগা—বুঢ়ী মাঈ, উঠো···"

তরু পড়ার মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই, জানেন?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"মা কারুর ছেলের কথা হলে একেবারে কি রকম হয়ে যান, দাদার কথা মনে পড়ে যায়। আর একটা জিনিস মিলিয়ে দেখবেন'খন বলে দিচ্ছি আপনাকে।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি মিলিয়ে দেখব তরু?"

"মা ঠিক এবারে অসুখে পড়ে যাবেন। কালই উঠে দেখবেন আপনি। ওঁর সামনে কারুর ছেলে নিয়ে কোন কষ্টের কথা তোলা একেবারে মানা।"

আমার মুখের উপর আয়ত চক্ষু দুইটা রাখিয়া ঘাড় দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ মাস্টার-মশাই, একেবারে ডাক্তারের মানা। দাদার কাণ্ডটা "

সামলাইয়া লইয়া আড়চোখে আমার পানে একবার চকিতে চাহিয়া তরু অধিকতর

মনোযোগের সহিত আবার পড়িতে লাগিল। একটু অস্বাস্তর ভাব—এখনই যেন গূঢ় কি একটা পারিবারিক রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিত আর কি!

আমার মনে পড়িয়া গেল—প্রথম যেদিন অপর্ণা দেবীর সহিত পরিচয় হয়, প্রসঙ্গক্রমে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে ঐ রকম আত্মবিলুপ্ত।" মীরা-তরু আসিয়া পড়ায় কথাটা আর পরিষ্কার হয় নাই সেদিন।

রহস্যটা পীড়া দিতেছিল; কিন্তু তখন আর তরুকে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলাম না।

৮

পরিবারটি ছোট—মীরার বাবা, মা, মীরা, তরু; নেপথ্যে মীরার দাদা।

সে অনুপাতে চাকর-বাকর বেশি। বেয়ারার কথা বলিয়াছি। নাম রাজীবলোচন হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া রাজু। অনেকটা সর্দারগোছের। বাসন মাজিতে হয় না আর ঘর ঝাঁট দিতে হয় না বলিয়া কতকটা আভিজাত্য-গর্বিত। থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাঁধে একটা পরিষ্কার ঝাড়ন ফেলা; যখন অন্য চাকরদের উপর ফফরদালালি না করে, তখন সব ঘরের আসবাবগুলা ঝাড়িয়া মুছিয়া বেড়ায়। কতকটা ওর কাজের অভাবের জন্য এবং কতকটা ওর অধীনে চেয়ার, আরশির অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার জন্য অন্য চাকরেরা ওকে সম্ভ্রম করে। আরও একটা ক্ষমতা আছে লোকটার—খুব উঁচু দরের খবরের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করিয়া চারাইয়া দেওয়া। একদিন আমার ঘরের আসবাব-পত্রগুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, 'শুনেছেন বোধ হয় মাস্টারমশা।"

আমি মুখের দিকে চাহিতে বলিল, "আমেরিকা আর এদের একটি পয়সা ধার দেবে না।"

আমি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলাম; তাহার পর সত্যই ও কিছু বুঝে কিনা, জানে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম "কাদের?"

জানে না, কিন্তু ঠকিল না লোকটা; একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছুই খোঁজ রাখেন না দেখছি!"

তাহার পর পাছে আবার খোঁজ লইবার জন্য টাটকা-টাটকি উহারই দ্বারস্থ হই, সেই ভয়ে হাতের চেয়ারটাতে তাড়াতাড়ি ঝাড়ন বুলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কথাটা কিন্তু এখানেই শেষ হইতে দেয় নাই।—রাত্রে পড়িতে আসিয়াই তরু

মুখটা বিষণ্ণ করিয়াবলিল, "আপনারএখান থেকে অন্নজল এবার উঠল মাস্টারমশাই!"

এ রকম অপ্রত্যাশিত গুরুতর সংবাদে বুকটা ছাঁত করিয়া উঠিল, যতটা সম্ভব শান্ত ও নির্লিপ্ত ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিলাম,—"সত্যি নাকি ?—তা, হঠাৎ কি হল ?"

তরু মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিল, "বা—রে ! পড়ে কি হবে আপনার কাছে ? আমেরিকা যে অতবড় একটা মাড়োয়ারী মহাজন তার নাম পর্যন্ত জানেন না আপনি! গোয়েঙ্কা, মুরারকা, আমেরিকা—শোনেন নি এদের নাম ?—বাবার মক্কেলই তো কতজন আছে।"

আমার মুখের পরিবর্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সে-ও আর হাসি থামাইতে পারিল না। মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলিল, "রাজু বেয়ারা ঐ রকম মাস্টারমশাই,কিছু জানে না, বোঝে না, অথচ গালভরা খবর সব যোগাড় করে তাক লাগিয়ে দেবে।"

লোকটার চরিত্রে এই নূতন আলোকসম্পাতে আমার প্রথম দিনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—রাজু আমায় বলিয়াছিল ব্যাবিস্টার সাহেব একটা সিডিশান কেসে কুমিল্লায় গিয়াছেন। আমি একটু বিস্মিতও হইয়াছিলাম। তরুকে বলিলাম। তরু হাসিয়া জানাইল—রাজু বেয়ারার কাছে সিডিশানের যা অর্থ পার্টিশানেরও সেই অর্থ, অর্থাৎ কোন অর্থই নাই ; ও শুধু ব্যারিস্টারদের সঙ্গে খাপ খায় এই রকম একরাশ শব্দ সুযোগমত সংগ্রহ করিয়া গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যা-তা বলিয়া লোকদের ভুল খবর দেওয়ার জন্য প্রায়ই ধমক খায় মিস্টার রায়ের কাছে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখান। বরখাস্ত যে করা হয় না, সেইটেই রাজু নিজের মর্যাদার পরিপোষক করিয়া চাকর-দাসীদের মধ্যে আস্ফালন করে, বলে, "দিন না ছাড়িয়ে, বারো টাকায় ইংরিজী-জানা বেয়ারা ফলছে গাছে !"

তরু বলিল, বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই। রাজু বেয়ারা বলেন না বলেন রেজো বেয়াড়া।"

নামের এই কদর্থ অপভ্রংশে তরু আবার খুব এক চোট হাসিল।

রাজু বেয়ারার পরেই নাম করিতে হয় বিলাসের ; বরং আগে নাম করিলেই বেশি শোভন হইত, কেননা, এ-বাড়িতে রাজুর যদি এমন কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে যাহাকে সে ভয় করে তো সে বিলাস। প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও বরং বিলাসকে ছোট করা হয়। রাজু বেয়ারা আর সব চাকর-বাকরদের নিজের চেয়ে ছোট মনে করিয়াই তৃপ্ত, বিলাসের পূর্ণ বিশ্বাস রাজু একটা তৃণখণ্ড মাত্র, প্রয়োজন হইলে তাহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় অথবা বাক্যের স্রোতে নিরুদ্দেশ করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া চলে। তবে বিলাস এটুকু করাকে পণ্ডশ্রম বা শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করে, তাই নীরব অবহেলার দ্বারাই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপিয়া রাখিয়াছে। তরুর মুখে শুনিয়াছি রাজু বেয়ারা

যখন চাকর-বাকরদের মধ্যে কোন বড় কথা ফাঁদিয়া জমাইবার চেষ্টা করে, একবার খোঁজ করিয়া লয় বিলাস কাছে-পিঠে কোথাও আছে কিনা। যদি কোন প্রকারে আসিয়াই পড়ে গল্পের মাঝখানে, উপরের কোন ফরমাস লইয়া, তো রাজু থামিয়া যায়; আবার বিলাস প্রভৃতির বাহিরে চলিয়া গেলে নাক সিঁটকাইয়া বলে, "ছুতো করে শুনতে এসেছিল! আমার বয়েই গেছে এসব কথা ওকে শোনাতে; শখ হয়েছে তোদের বলছি, কোন বাদশাজাদীর বয়না নিয়ে তো কথকতা শোনাচ্ছে না রাজু..."

বিলাসের এই শক্তির মূলে একটি আত্মচেতনা বর্তমান, সে অপর্ণা দেবীর বাপের-বাড়ির ঝি, রাজবাড়ির পরিচারিকা। অপর্ণা দেবী নিজে মাটির মানুষ, বিলাসের বিশ্বাস রাজবাড়ির মর্যাদা যাহাতে তাঁহার এখানে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে অপর্ণা দেবীর সঙ্গে এখানে পাঠানো হইয়াছে; যদি সত্যই হয় বিশ্বাসটা, তো লোকবাছাইয়ে রাজবাড়ি যে ভুল করে নাই এ-কথা বেশ স্বাচ্ছন্দেই বলা চলে। আজ প্রায় পচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বিলাস রাজবাড়ি হইতে যে বায়ুমণ্ডল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এখনও সেটা বজায় রাখিয়াছে। এই জন্য সে এই আধুনিক রুচিসম্মত বাড়িতে কতকটা বেমানান,—তাহার চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি, গা-ভরা সোনা-রূপার মোটা মোটা গহনা, গালে অষ্টপ্রহর পান-দোক্তা, নাকে নথ আর চালের গুরুত্ব এই হালকা ফ্যাশানের বাড়িতে অনেকটা বিসদৃশ। মনে পড়ে প্রথম বিলাস যখন আমায় অপর্ণা দেবীর আদেশে ডাকিতে আসে, আমি তাহাকে নবপ্রথা অনুযায়ী কপালে জোড়কর ঠেকাইয়া নমস্কার করি, ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, ভাগ্যে পুরাতন প্রথাটা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, নয় তো নিশ্চয় পায়ের ধূলা লইয়া বসিতাম বিলাসের যত দিন ছিলাম মনে বরাবরই একটা ধুকপুকুনি লাগিয়া থাকিত—বিলাস কথাটা ফাঁস করিয়া দেয় নাই তো? কখনও কখনও এরূপও মনে হইয়াছে, নমস্কারটা বাড়ির মাস্টারের কাছে ওর ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়াই দেয় নাই ফাঁস করিয়া।

বিলাসের সঙ্গে ওর কর্ত্রীর এক দিক দিয়া একটা মস্ত বড় মিল আছে, ওকে দেখা যায় বড় কম,—আরও কম যেন; অপর্ণা দেবীর ঘরেও ওকে খুবই কম দেখিয়াছি। তবুও মাঝে মাঝে ওর প্রসঙ্গ এক-আধবার আসিয়া পড়িবে।

আর একটা কথা মনেপড়িয়া গেল। এই গম্ভীরা পরিচারিকাকে দু-এক বার মিস্টার রায়ের সঙ্গে স্মিতবদনে চটুল চপলতার সহিত পরিহাস করিতে দেখিয়াছি,—তাহাদের বাড়ির জামাই হিসাবে। আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে এই যে গুরু অপরাধ এটিও রাজবাড়িরই পুরানো চাল,—বিলাস বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। দেখিয়াছি মিস্টার রায় বেশ উপভোগ করিয়া প্রসন্ন-বদনেই উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ব্যাপারটা গোপনীয় নয়, অপর্ণা দেবীর সামনেই হইয়াছে। যতদূর মনে পড়িতেছে, একবার অন্ততঃ তাঁহাকেও বিলাসের পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে

একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য ছিল—চমৎকার একটি নির্মল সরসতা। মনে হইত এই সামান্যা পরিচারিকা হঠাৎ অপর্ণা দেবীর ভগ্নীতে রূপান্তরিতা হইয়া মিস্টার রায়ের শ্যালিকার আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

রাজু বিলাসের পরে, শুধু একজন ছাড়া, আর সবাই এক রকম সাধারণ বলিলেই চলে—সোফার, যেমন হয় আর সোফার, পাচক-ঠাকুর—যে কোন পাচক-ঠাকুরেরই মত। মিস্টার রায়ের জন্য, বিশেষ করিয়া পার্টি প্রভৃতি উপলক্ষ্যের জন্য একজন বাবুর্চি আছে—সেও অন্য সব বাবুর্চির মত অল্পভাষী এবং তাহার রন্ধনের আভিজাত্য এবং উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীটাকে কিছু নীচু নজরে দেখে। মাজা-ঘষা ধোওয়া-মোছার জন্য একটি সস্ত্রীক পশ্চিমা চাকর আছে; অত্যন্ত খাটে এবং যখন কাজ থাকে না আউট-হাউসে নিজেদের বাসায় বসিয়া পরস্পর কলহ করে। বাকি থাকে মালী; তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমার এ-কাহিনী ভালবাসারই কাহিনী; মালীর জীবনে ভালবাসার বা নারী-মোহের যে রূপ দেখিয়াছি তাহার একটু পরিচয় দিলে বোধহয় অন্যায় হইবে

ইমান্নুল মালীকে আমি প্রথম দেখি বাগানেই। বিকাল বেলা, অলসভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা বর্ণের ফুলের বেডগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম, ইমান্নুল বাগানের ওধার থেকে চারিটি ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে ফার্ণের শীষ লাগাইয়া একটা বাটন হোল তৈয়ারি করিয়া আমার হাতে দিল, ঝুঁকিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল, "সেলাম মাস্টারবাবু।"

বলিলাম, "সেলাম, তুমি এই বাগানের মালী?"

ইমান্নুল হাতের ডালকাটা কাঁচিটাতে একটা শব্দ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হেঁ বাবু।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এর পরে কি বলা যায়? বলিলাম, "বাগানটা রেখেছ চমৎকার, তোমার নাম কি?"

"ইমান্নুল।"

একটু বিস্মিত হইয়া চাহিলাম, মুসলমান—ইহাদের খুব একটা মালী হইতে দেখা যায় না। বলিলাম, "তা বেশ।…ইমান্নুল হক?"

আরও বিস্মিত হইতে হইল। ইমান্নুল হাসিয়া বিনীত গর্বের সহিত বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, আমরা কেরেস্তান—রাজার যা ধম্ম আর আপনার গিয়ে লাট সাহেবের যা ধম্ম তাই আর কি।"

ক্রীশ্চান বলিতে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে ধারণা জাগে এ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মসীতুল্য গায়ের রঙ, মুখের হাড়গুলা কিছু উঁচু, গলায় একটা কাঠের মালা, ডান হাতে রূপার একটা অনন্ত, মাথার তৈলমসৃণ চুলে একটা কাঠের চিরুণী গোঁজা।—বলিলাম, "ও, তাহলে তোমার নাম ইম্যান্নুয়েল—বাঃ, বেশ; আমি মনে করিলাম—

ইমানুল হক বুঝি।"

ইমানুল হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মুসলমান নয়, রাজার যা ধর্ম সেই।"

প্রশ্ন করিলাম, "বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি বাঁচি বাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।"

'ও। কি জাত?"

'ওরাঁও জাত আমরা।" ইমানুল বিকশিতদন্ত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল ওদিককার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীশ্চানের ছুট বড় বেশি বটে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি কাগজে ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছি অনেক। সেই সব জাতেরই একজনকে সামনে পাইয়া কৌতূহল জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা ইমানুল, ক্রীশ্চান কে হয়েছিল? তোমার বাপ, না ঠাকুর্দা?"

ইমানুল বলিল, 'না বাবু, আমি ধরম আপনি বদলিয়েছি।"

সামনেই একজন ধর্মান্তরগ্রাহীকে পাইয়া কৌতূহলটা আরও তীব্র হইয়া উঠিল—কি বুঝিল ইমানুল যে, নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিল? তাহার নিজের ধর্মের তুলনায় ক্রীশ্চান ধর্মের মহত্ত্ব? পাদ্রীর প্ররোচনা? রাজার সঙ্গে, রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসাম্যের লোভ? না কি?

প্রশ্ন করিলাম, "কি ভেবে ছাড়লে ধর্ম তুমি ইমানুল?"

ইমানুল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু মুখ নীচু করিয়া লজ্জিত হাসির সহিত বলিল, "যীশু আমাদের ত্রাণ করার জন্যে জান দিয়েছিলেন বাবু, তাই"

বেশ বোঝা গেল কিন্তু ইমানুলের এটা প্রাণের কথা নয়, কোথায় যেন একটা কি আছে। আরও কৌতূহল হইল, বলিলাম, "তাহলে তো আমাকে, মিস্টার রায়কে, রাজু বেয়ারাকে, জগদীশ সোফারকে—সবাইকেই ধর্ম পাল্টাতে হয় ইমানুল। বল, বাজে কথা বলছি আমি?"

অবশ্য বাজে কথাই বলিলাম, কিন্তু যাহা অভীপ্সিত ছিল সেটুকু হইল। তর্কের গলদ কোথায় ধরিতে না পারিয়া অথবা পারিলেও সেটা গুছাইয়া ধরিতে না পারায়—ইমানুল একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথাটা আবার নীচু করিয়া বগের কাছটা চুলকাইতে লাগিল।

আমি সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, ঠিক বলি নি আমি? মানে তোমায় দেখেই সন্দেহ হয়েছিল কি না যে এমন একজন চৌকস লোক"

ইমানুল একবার আমার পানে চাহিল, তখনই আবার মাথাটা নামাইয়া লইয়া বলিল, "ঠিক খেয়াল করেছেন আপনি বাবু। আপনাকে না বলে কাকেই বা বলি? ··· এখন কথা হচ্ছে আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে বাবু আমায়।"

গভীর রহস্যের আভাস পাইয়া আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তা লিখে দেব না? বাঃ, এক-শ বার লিখে দেব। ব্যাপারটা খুলে বল দিকিন আগে।"

ইমানুল কুণ্ঠিতভাবে ঘাড়টা চুলকাইতে আরম্ভ করিল, "আজ্ঞে—মানে…"

বলিলাম, "হ্যাঁ বল, আরে আমায় বলবে তাতে আবার…"

"পাদ্রী সাহেবকে লিখতে হবে বাবু,—রেভারেণ্ড স্যামুয়েল চাইল্ড সাহেবকে।"

"এ তো খুব সহজ কথা, কি লিখব বল?"

ইমানুল আবার খানিকক্ষণ নিরুত্তর রহিল, তাহার পর আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "পাদ্রী সাহেবকে লিখতে হবে—টাকা কিছু জমেছে, কিছু জোগাড়ও হবে, এবার তুমি নাথুর মারফত যা কথা দিয়েছিলে তার একটা…"

এমন সময় বারান্দা হইতে রাজু বেয়ারা হাঁক দিল—"ইমানুল, তোকে বড়দিদিমণি ডাকছেন, শীগ্‌গীর আয়। হারামজাদা আপনাকে বুঝি বাটন-হোল্ ঘুষ দিয়ে চিঠি লেখাবার জন্য ধরেছে মাস্টার-মশা?…এলি?—জল্‌দি আয়।"

প্রথম দিন এই পর্যন্তই টের পাই। ইমানুলের কথা আবার যথাস্থানে তোলা যাইবে।

৯

তরুর ঠাস-বোনা রুটিনের মধ্যে আমার জায়গা ঠিক হইয়া গেছে। কাজ বেশ নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ওদিকে কলেজে নাম লিখাইয়া লইয়াছি। প্রচুর অবসর রহিয়াছে; পড়াশুনা ঠিকমত আরম্ভ করি নাই, তবু আয়োজন চলিতেছে।

প্রচুর অবসর, কেননা, পাঁচটার পূর্বে তরুর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সকালে তাহার সেই লক্ষ্মীপাঠশালা, দুপুরে লরেটো, তাহার পর ঘণ্টাখানেক বৈষ্ণবসংগীত। কীর্তনের মাস্টার চলিয়া গেলে তরুর ভার আমার উপর পড়ে। প্রথমেই ওকে মোটরে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে হয়। কোন দিন ইডেন্ গার্ডেন্‌স্, কোনদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোন দিন অন্য কোথাও। ইহার মধ্যে দুই দিন কলিকাতার বাহিরেও হইয়া আসিয়াছি—একদিন দমদমার দিকে, একদিন বটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্। এই মোটর-অভিযানে তরুর প্রয়োজনের চেয়ে আমার নিজের শখের দিকটাই বেশি করিয়া দেখিতেছি আমি,—এ সত্যটুকু গোপন করিয়া কি হইবে? আমি একটু ভ্রমণবিলাসী, মাঝের চারিটি বৎসর আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বাসনাটিকে যেন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। মুক্তি পাইয়া, মুক্তির সঙ্গে সুযোগ পাইয়া সে যেন অন্ধ আবেগে ডানা মেলিয়া দিয়াছে।

আর একটা কথা—ইহার মধ্যে একদিন মীরা সঙ্গে ছিল, বরাবরই নির্বাক, বোধহয় বার-তিনেক তরুর সঙ্গে এক-আধটা কথা কহিয়া থাকিবে, আর একবার সোফারকে

একটা হুকুম ; আমার সঙ্গে একটাও কথা হয় নাই। কিন্তু ও যে পাশে ছিল, সেই বা কি এক অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর রোজই বেড়াইতে যাইবার সময় একবার ফিরিয়া বাড়িটার দিকে চাহিতাম—একটা আশা, যদি উপর থেকে কেহ বলে, "তরুদিদি একটু থেমে যেও, বড়দিদিমণি বোধ হয় যাবেন ওদিকে।"...মোটরের পা-দানিতে পা তুলিতে দেরি হইয়া যাইত।

বেড়াইয়া আসিয়া একটু এদিক-ওদিক করিয়া তরু আসে পড়িতে। পড়িবার নির্ধারিত সময় দুই ঘণ্টা। পড়ার মাঝে মাঝে গল্পগুজব সাঁদ করাইয়া তরু যে সময়টুকু আত্মসাৎ করে সেটার হিসাব রাখিলে তরু বোধ হয় বইয়ে দেয় ঠিক ঘণ্টাখানেক সময়। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে ;—ওইতেই পড়া হইয়া যায়, তা ভিন্ন নরেটোর পড়াইবার পদ্ধতিও এমন চমৎকার যে, পাঠ গ্রহণ করিবার সময়ই বোধ হয় ওর অর্ধেক পড়া হইয়া গিয়া থাকে। লক্ষ্মীপাঠশালায় পডিবার বিশেষ হাঙ্গামা নাই,—স্তব, পূজাপদ্ধতি, সব ওখানেই সারে; খান দুই-তিন হালকা বাংলা বই আছে, দেরি হয় না।

এই একরকম নিখুঁত দিনগুলির মাঝে মাঝে ছন্দপতন হইতেছে। সেটা ঘটাইতেছে মীরা। একটু আশ্চর্য বোধ হয় বৈকি। যে মীরা আমার জীবনের ছন্দ সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে সে-ই আবার ছন্দপতন ঘটায় কেমন করিয়া? একটা দিনের কথা বলিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইতে পারে। ছোট দু-একটা ঘটনার কথা বাদই দিলাম।

তরু একদিন নিজের পদ্ধতিতে প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই, শুনেছেন?"

জিজ্ঞাসা করি—"কি?"

"দিদি এইবার একদিন আসবেন বলেছেন—দেখতে যে আপনি কেমন পড়াচ্ছেন।"

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও দু-একদিন বলিল কথাটা।

বলি—"বেশ ভাল কথাই তো।"

লক্ষ্য করিয়াছি কথাটা বলিয়াই তরু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চায়। "ভাল কথাই তো" বলা সত্ত্বেও আমার মুখটা যে একটু মলিন হইয়া উঠে সেটা ওর দৃষ্টি এড়ায় না। একদিন বলিয়াও ফেলিল ভিতরের কথাটা। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেল এবং পর্দার বাহিরে একটু মুখটা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল ; তাহার পর কুণ্ঠিত চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "একটা কথা বলছি মাস্টারমশাই, কিন্তু বলুন কারুকে বলবেন না কক্ষণো..."

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা যদি এমনই গোপনীয় তো বলে কাজ নেই তরু,—বলতে হয় না অত গোপনীয় কথা।"

বাধা পাইয়া তরুর মুখের দীপ্তিটা যেন নিভিয়া গেল। অপ্রতিভ-ভাবে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, সে কখনও বলবও না আমি।"

পড়িতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি তরু অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছে না পড়ায়, কথাটা ওর পেটে গজগজ করিতেছে। চিরন্তনী নারীরই তো একটি টুকরা তরু—পেটে কথার ভার বহন করিবে কি করিয়া বেচারী ?

মনে মনে হাসিয়া ওর অবস্থাটা উপভোগ করিতেছি, তরু হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া মুখটা তুলিয়া হালকা তাচ্ছিল্যের সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কি আর এমন লুকুনো কথা মাস্টারমশাই ? লুকুনো হলে কখনও বলত দিদি—বলুন না ?"—এবং পাছে আবার কোন বাধা উপস্থিত করি সেই ভয়ে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "দিদি বলে—'পড়া দেখতে আসব বললে মাস্টার-মশাইয়ের মুখটা কি রকম হয় লক্ষ্য করে বলিস তো তরু।' আমি গিয়ে বলি। দিদি তাতে বলে—'করুন রাগ তোর মাস্টারমশাই, আমি যাব একদিন। সাবধান থেক তরু, যদি দেখি ফাঁকি দিচ্ছ!' দিই ফাঁকি আমি মাস্টারমশাই ?"

"না, পড় দিকিন!"

পর্যবেক্ষণ! ··মনে একটা গ্লানি জমিয়া উঠে। মীরার অর্থাৎ একটা মেয়ের এবং আমার চেয়ে বয়সে ছোট মেয়ের এই মুরুব্বিয়ানাটা বরাবর হজম করিয়া যাইতে হইবে ?···ব্যারিস্ট্যার রায় নাই, মন্দ লাগিতেছে না ; কিন্তু এক সময় কামনা করি তিনি আসিয়া পড়ুন অবিলম্বে,—যদিও তিনি শত বিভীষিকায় ভীষণ, তবুও! নিজের মনেই ব্যঙ্গ করিয়া বলি, 'এ সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার আস্ফালন সহ্য হবে না।"

এমন সময় মীরা একদিন আসিয়াই পড়িল। অপর্ণা দেবীর ঘরে যেদিন ইচ্ছা না থাকিলেও প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের আদর-আবদারের খেলা দেখি, তাহার ঠিক চারিদিন পরে। বোধ হয় এ ঘটনাটুকুর সঙ্গে আসার সম্বন্ধও ছিল, কেননা আমার 'মনিব' মীরা সেদিন আমার কাছে একটু খেলো হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও অপর্ণা দেবী মিথ্যা বলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষতিটুকু গাম্ভীর্য দিয়া না পূরণ করিয়া লইলে আমি বশে থাকিব কি করিয়া ?

মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবেশ করিলও ঠিক সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মতই। প্রথমে রাজু বেয়ারা পর্দার ভিতরে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "বড়দিদিমণি আসছেন মাস্টার-মশা" ; অর্থাৎ কায়দামাফিক অ্যানাউন্স করিল আর কি ; তাহার পর পর্দাটা তুলিয়া ধরিল ; মীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

মীরা সাজিয়া আসিয়াছে। একটা খুব হালকা চাঁপাফুলের রঙের শাড়ি পরিয়াছে, গায়ে ঐ রঙেরই একটা পাতলা পুরা-হাতা ব্লাউস, মণিবন্ধের কাছে ঝালরের মত করিয়া কাটা, তাহার মধ্যে দিয়া মীরার পুষ্পকোরকের মত হাত দুইটি বাহির হইয়া আছে,—দু-গাছি রুলি ঝিকমিক করিতেছে। পায়ে, মাঝখানটিতে একটি করিয়া ফুলতোলা

মথমলের স্যাণ্ডেল, কপালে একটি খয়েরের টিপ, মাথায় পরিষ্কার করিয়া গুছানো এলো খোঁপা, আর সেই অনবদ্য বাঁকা সিঁথি।

মীরা কালো—শ্যামাঙ্গীই বলি। পীতে-হরিতে তাহাকে দেখিতে হইযাছে ফুলে-ভরা একটি নবীন চম্পকতরুর মত।

বোধ হয এই সাজিবার জন্যই একটু কুণ্ঠিত হইযা একটা চেযারে বসিযা রহিল মীরা—অল্প একটু নিজেকে দ্রষ্টব্য করিযা তুলিলে যেমন হয। অবিলম্বেই আবার সে-ভাবটুকু সামলাইযা লইযা বেশ সহজ গলায সহজ গাম্ভীর্যের স্বরে বলিল, "আপনার ছাত্রীব পড়া দেখতে এলাম।"

উত্তর দেবার সময গলা দিয়া যেন একটা কঠিন বস্তুকে নামাইয়া দিতে হইল। বলিলাম, "বেশ করেছেন, ভালই তো!"

মীরা বলিল, "তরু একটু বিশেষ চঞ্চল, সেই জন্যই দেখে-শুনে আপনাকে রাখলাম।"

আমার সংশয়িত মনের ভুল হইতে পারে, কিন্তু 'রাখল'ম' কথাটিতে মীরা যেন বিশেষ একটি ঝোঁক দিল। হয তো আমারই ভুল, মীরা অত রূঢ় হয় নাই, কিন্তু আমি উত্তর যা দিলাম তা এই ধারণারই বশবর্তী হইয়া। একটু ইতস্ততঃ করিলাম, তাহার পর বলিলাম, "আপনার অনুগ্রহ।"

কথাটার মধ্যে মনের তিক্ততাটা বোধ হয় প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, যদিও স্পষ্টভাবে রূঢ় হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। মীরা একবার তাহার সেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া লইয়া আবার বেশ সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "না, না, অনুগ্রহ কিসের? আমরা উপযুক্ত লোক খুঁজছিলাম, আপনি উপযুক্ত লোক—এতে অনুগ্রহ কি আছে আর? আপনাকে রাখা এ তো নিছক স্বার্থ।"

মীরা কথাটা নরম সুরেই বলিল—একটু যেন অনুশোচনা আছে তাহাতে; আমাকে রাখা বিষয়ে যে দম্ভটুকু প্রকাশ করিযা ফেলিয়াছে সেটুকু যেন সামলাইয়া লইতে চায়। আমিও নরম হইয়া গেলাম। সত্য কথা বলিতে কি—এই নরম হইবার সুযোগটুকু পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। মীরা কি উদ্দেশ্যে ঠিক জানি না—ইচ্ছা করিয়া আমায় ক্ষুণ্ন করিতেছে; কিন্তু ওর উপর ক্ষুণ্ন হওয়া যে কত শক্ত আমার পক্ষে তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আঘাতে আকর্ষণে মীরা ইহারই মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাইতেছে। তরুর মুখে, ও আমার কাজ পরিদর্শন করিতে আসিবে শুনিলে মুখটা বোধ হয় অন্ধকার হইয়া যায়; কিন্তু উহারই মধ্যে কেমন করিয়া মনের কোথায় রঙীন বাসনা জাগিয়া থাকে। মীরা যে মূর্তিতেই আসিতে চায়, আসুক, শুধু আসুক ও। আহত পৌরুষের অভিমানে মুখ ভার করিয়া আমি প্রবল আশায় ওর পথ চাহিয়া

থাকি। ওকে যতটা চাই না তাহার শতগুণ চাইও আবার। মীরাকে দেখিবার আগে এ অদ্ভুত ধরনের অনুভূতির কখনও সন্ধান পাই নাই নিজের মধ্যে। তাই বলিতেছিলাম নরম হইবার সুযোগ পাইয়া আমি যেন বর্তাইয়া গেলাম।

আমার উত্তরের মধ্যে যে একটা ব্যঙ্গের ইসারা ছিল সেটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইবার জন্য সত্যই কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিলাম, "অনুগ্রহ যে নয় এ-কথা কি করে বলি ?—আমি উপযুক্ত কি না সে-কথা তো যাচাই করেন নি ; এসে দাঁড়িয়েছি, আপনি নিয়োগ করেছেন। আমার যে একটা অভাব ছিল, আমার যে আশ্রয়ের একটা প্রয়োজন ছিল —আমার চেহারার মধ্যে সে-কথাটা নিশ্চয় কোথাও ধরা পড়েছিল, আপনার দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই আপনি যাচাই করা দূরে থাকুক 'ভাল করে পরিচয়ও নেন নি আমার ; ডেকে নিলেন। অনুগ্রহ নয় তো কি বলব একে ?'

এ উচ্ছ্বাসটা দেখাইয়া ভাল করি নাই। অবশ্য, সে-কথাটা অনেক পরে জানিতে পারি, তাহার কারণটাও। মীরা কি এক রকম ভাবে, স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া এই স্তুতি শুনিল,—তাহার মুখটা কঠিন হইয়া আসিতে লাগিল এবং একেবারে শেষের দিকে, ধীরে ধীরে তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চনটা জাগিয়া উঠিল। কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া লইয়া, কতকটা অসংলগ্নভাবেই বলিল, "পড়ছে কি রকম আপনার ছাত্রী আগে তাই বলুন।''

সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি আপনার স্তব শুনতে আসি নি মাস্টারমশাই। এমন কি অসাধারণ কাজ করেছি যে…"

হাসি দিয়া মর্মান্তিক কথাটা বোধ হয় নরম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে মীরা, তবুও আমার গায়ে এমুড়া-ওমুড়া একটা কশাঘাতের মত বাজিল সেটা। মনে হইল সমস্ত শরীরটা একটা অসহ্য জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একেবারে অসাড় হইয়া গেল, নিজের দীনতার গ্লানি যেন ক্রমাগত ফেনাইয়া ফেনাইয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণমাত্র মীরার চক্ষের পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইলাম।

তরুও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে, একবার নিতান্ত কুণ্ঠিত, অপ্রতিভভাবে আমার মুখের উপর করুণ দুইটি চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে কোন্‌খানটা পড়ব মাস্টারমশাই ?" আমি উত্তর দিবার আগেই আবার মীরাকে প্রশ্ন করিল, "কোন্ পড়াটা শোনাব তোমার দিদি ?"

কোন উত্তর না পাইয়া মাথা নীচু করিয়া মনোযোগের সহিত ওর ইংরাজী রীডারটার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

ঘরটাতে বায়ু যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে ; অসহ্য গুমট একটা। তিনজনে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছি। একটু পরে মীরাই আবার গুমটটা ভাঙিল, বরং

ভাঙিবার চেষ্টা করিল বলাই ঠিক। কথাটাতে চপল হাস্যের ভাব ফুটাইবার প্রয়াস করিয়া বলিল, "যেটা খুশি পড় না, আমি দুটোতেই পণ্ডিত—যেমন তোমার লক্ষ্মীপাঠশালার শিবস্তোত্র বুঝি, তেমনই তোমার লরেটোর কচকচানি বুঝি; তুমি যেটা বলবে আমায় একই রকম ভাবে ঠকাতে পারবে। নয় কি মাস্টারমশাই ?... কিন্তু আজ আমি এখন উঠি, আবার সরমাদিকে কথা দেওয়া আছে—আটটার সময় আসব।" বলিয়া হাতঘড়িটা উল্টাইয়া দেখিয়া উঠিয়া পড়িল।

আবার একটু নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। কোন মতেই আঘাতের স্মৃতিটা যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। হঠাৎ কি করিয়া এবং কেন ব্যাপারটা এত কটু হইয়া উঠিল তাহাও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একটু পরে তরু আমার ডান হাতটা হঠাৎ জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল, 'একটা কথা বলব মাস্টারমশাই ?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া উত্তর করিলাম "বল!"

"না, আপনি রাগ করবেন; আমার ওপরও, দিদির ওপরও।"

হাসিয়া বলিলাম, "না, করব না, বল!"...এবং এই সুযোগে, তখনই যে-ব্যাপারটা হইল সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরও প্রাণখোলাভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "তোমার দিদির ওপর রাগ কেন করতে যাব?...দেখ তো!"

তরুর মুখটাও পরিষ্কার হইয়া গেল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ভয়ঙ্কর ভালবাসে দিদি আপনার লেখাগুলো মাস্টারমশাই। 'মানসী' 'কল্লোল' আরও অন্য অন্য মাসিক পত্র থেকে খুঁজে খুঁজে পড়ে, হ্যাঁ, দেখেছি আমি।"

কৌতুহল হইল; কিন্তু তাহার চেয়ে মুগ্ধ হইলাম বেশি। নারীর মন—উহারা পুরুষের অন্তস্তল পর্যন্ত এক দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইতে পারে, হোক না তরুর মত ছোট। আর জোড়াতাড়া দিতেও উহাদের হাত এইটুকু থেকেই দক্ষ। তরু তাহার দিদি আর আমার মধ্যে ভাব করাইয়া লইবার জন্য সদ্যসদ্যই ব্যস্ত হইয়াউঠিতেছে, দলিল-দস্তাবেজ হাজির করিতেছে আমার প্রতি ওর দিদির প্রীতির; অর্থাৎ এই মাত্র যা হইল, ওটা কিছু নয়, মীরা আসলে আমার লেখা ভালবাসে—যাহার মানে হয় আমায় ভালবাসে।

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "সত্যি নাকি ?"

তরু চক্ষু দুইটা বড় করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাস্টারমশাই!—দুটো পদ্য আপনার লিখেও নিয়েছে।"

"কিন্তু পেলে কোথা থেকে ?"

শান্তি স্থাপনের ঝোঁকে তরু এ-দিকটা ভাবে নাই, ভয়ে ওর হাতটা একটু আলগা হইয়া গেল। তখনি আবার ভাল করিয়া আমার হাতটা জড়াইয়া পাঁজরার কাছে

মাথা গুঁজিয়া ধরিল।

বলিলাম, "কি করে পেলে বল তো তোমার দিদি ?"

তরু অপরাধীর মত স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "আমি নিয়ে গেছলাম।"

তাহার পর অনুযোগের সুরে বলিল, "দিদিই কিন্তু বলেছিল মাস্টারমশাই।"

আরও একটু মৌন থাকিয়া অনুশোচনার স্বরে বলিল, 'আমি কুমারী মা-মেরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব'খন মাস্টারমশাই, না বলে নিয়ে যাবার জন্যে আপনার খাতা। ...দিদিকে কিন্তু বলবেন না।"

আবার সেই বোধহীনা বালিকা,—উহাদের কন্‌ভেণ্টের অভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছে।

সেই রাত্রে, যতদূর মনে পড়ে, আমার জীবনে প্রথম এক অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর অশান্তির আস্বাদ পাইলাম।

মীরা প্রথম দিনে আমার সামনে এক দৃপ্তরূপ লইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয় বার তাহাকে দেখি প্রচ্ছন্নতার অন্তরাল হইতে তাহার মায়ের কাছে সন্তানের হালকা রূপে। কোন্‌টা স্বাভাবিক মীরা জানি না,—হয়তো দুইটা রূপই স্বাভাবিক—নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু মীরা চায় না যে, আমি জানি ওর একটা হালকা দিকও আছে। আজ যে-মীরা আসিয়াছিল সম্রাজ্ঞীর গর্বিত বেশে—তাহার উদ্দেশ্যই ছিল দ্বিতীয় দিনের ছাপটা আমার মন হইতে ভালভাবে মুছিয়া দেওয়া। এক ধরনের আক্রোশ মীরার মনে,—সহজভাবে সে-ছাপটা সরাইতে না পারিয়া, সহজভাবে আক্রোশটা মিটাইতে না পারিয়া মীরা অস্বাভাবিকভাবেই একটু দাম্ভিকতা করিয়া গেছে আমার কাছে।...কিন্তু তাহার পর ? মীরার সজ্জায় আড়ম্বর ছিল কেন ? ঐ ছাপ মিটাইবার জন্য, না আরও কিছু ? —এই প্রশ্নই সে-রাত্রে কত স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া ছিল। মীরা বাহিরে যাইবার জন্য সাজে নাই আমাদের ঘর হইতে গিয়া সে যায় নাই কোথাও। যদি ধরা যায় সাজিয়াছিল বাহিরের জন্যই, কিন্তু গেল না কেন তবে ? আমায় আঘাত করিতে আসিয়া সে নিজেই আহত হইয়া গেছে—নিজের অস্ত্রেই ? যদি তাই হয় ? স্বপ্নের জাল যেন আরও সূক্ষ্ম হইয়া, আরও জটিল হইয়া উঠে।...আর সর্বোপরি তরুর সংবাদ —মীরা আমার লেখার পক্ষপাতী,—আমার দুইটি পদ্য—আমার অন্তরের দুইটি রঙীন বাণী মীরার সঞ্চয়ের খাতায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে...তরু সেদিন বলিয়াছিল মীরা কবিদের ভালোবাসে,—মীরা সমর্থন করিয়াছিল এই বলিয়া যে কবিদের যে দু'চোখে দেখিতে পারে না।

এই মীরাই আবার আজ আমায় আঘাত দিয়াছে—সূক্ষ্ম কিন্তু আমোঘ।

জীবনে এক নূতন আলো ;—অপরূপ তৃপ্তি, তাহারই পাশে কিন্তু গাঢ় ছায়া সুতীব্র বেদনা।

১০

দিন চারেক পরে মিস্টার রায় আসিলেন ; আমি—আসিবার ঠিক সতের দিনের দিন।

আমি আমার ঘরে বসিয়াছিলাম। ইমানুল রাজু বেয়ারার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড, তাহাকে চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে।—ইমানুলের পরিচয় আরও একটু পাইলাম আজ। রাঁচির দুই স্টেশন এদিকে জোনহা, সেইখানে নামিয়াই ইমানুলের বাড়ি যাইতে হয়, দুইটা পাহাড় ডিঙাইয়া। স্টেশন হইতে মাইল-দেড়েক দূরে জোন্‌হার জলপ্রপাত, ওদিককার একটা দ্রষ্টব্য বিষয়। রাঁচি হইতে মোটরে বা রেলযোগে প্রায়ই লোক দল বাঁধিয়া প্রপাত দেখিতে আসে, গাইড বা কুলি হিসাবে স্থানীয় লোকেরা এই থেকে কিছু কিছু উপার্জন করে, বিশেষ করিয়া যখন জোন্‌হা দর্শনের মরসুম, অর্থাৎ পূজার সময় হইতে শীতের খানিকটা পর্যন্ত। কতকটা এই সাময়িক উপার্জন আর কতকটা সামান্য একটু চাষ-আবাদ—এই লইয়া ইমানুলের চলিয়া যাইতেছিল। বাড়িতে বড় ভাই, ভাজ আর তাহাদের দুইটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বড় ভাই ক্ষেত-আবাদের দিকটায় নজর রাখে।

জোন্‌হার কাছে কি উপলক্ষ্যে একটা বড় মেলা বসে, লোক হয় বিস্তর, কিছু পাদ্রীরও আমদানি হয়। একদিন রেভারেণ্ড চাইল্ড গাড়ি হইতে নামিল, সঙ্গে একজন ওদেশী সহযোগী ও একটা পুস্তকের গাঁঠরি—মেলায় বিলি করিবার জন্য। মেলায় গাঁঠরিটা পৌঁছাইয়া দিবার জন্য ইমানুলকেই কুলি নিযুক্ত করিল সাহেব। সেই দিন পাদ্রী সাহেবের বক্তৃতায় যীশুর করুণার কথা ইমানুল ভাল করিয়া শুনিল। স্টেশনে ফেরত আসিবার সময় সাহেব যীশুর কথা আরও বলিল, খ্রীষ্টধর্মের গৌরব আর সমদর্শিতার কথা বলিল এবং ইমানুলের ঝোঁক দেখিয়া তাহাকে একটা টাকা দিয়া বলিল—সে যেন শীঘ্রই একদিন তাহাদের মিশনে আসে, সমস্ত ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।

মিশনে আসিয়া ইমানুল আর যা দেখিল, তা দেখিল, একটি দেখিবার মোহ তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। নূতন ধর্মের চক্ষু-ঝলসানো আলোয় ইমানুলের নজর সব চেয়ে বেশি করিয়া পড়িল মিস ফ্লোরেন্স চাইল্ডের উপর। মেয়েটি রেভারেণ্ড চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বাপ-মা নাই।...ইমানুল যখন কাহিনীটা বিবৃত করিতেছিল আমার অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিতেছিল,—অত উঁচুতে দৃষ্টিক্ষেপ কি করিয়া করিতে পারিল ইমানুল! মাথায়

ছিট আছে একটু নিশ্চয়, তবুও একেবারে পাগল না হইলে সম্ভব হয় কি করিয়া ?

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম অদ্ভুত হইলেও আশ্চর্য কি এমন ? চোখে লাগা চোখের ব্যাপার,—তাহার সঙ্গে নিজের গায়ের রঙ আর মুখের কাঠামোর কি সম্বন্ধ ? যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে তেমনই করিয়া আকর্ষণ করে; নিজের পানে চাহিয়া দেখিবার কি ফুরসত দেয় ? ইমানুলের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তখন আবার সাম্যের মোহ—সাম্যের অর্থ ই তো আকাশে মাটিতে মিতালি। একদিকে থাকিবে কদর্য ওরাওঁ যুবক, আর অপর দিকে থাকিবে দেবকন্যার মত তরুণী ফ্লোরেন্স, তবেই তো সাম্যের কথা উঠিবে !

আরও আছে। শুধু গায়ের চামড়া আর মুখের কাঠামোই কি সব ? ভালবাসার মূল যেখানে, সেখানে তো সেই একই রাঙা রক্তের তরঙ্গ তুলিতেছে।

ভেদাভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে দ্বিধা আশঙ্কাও গেছে,—ইমানুল কথাটা বোধ হয় স্বয়ং ফাদার চাইল্ডকে বলিত ! বর্বরেরা চিন্তা আর বাক্যের মধ্যে অবসর রাখিতে জানে না। তবে ইতিমধ্যে ফাদার চাইল্ডের সহযোগী ন্যাথেনিয়াল কথাটা টের পাইল। লোকটা খুব ধূর্ত এবং অভিজ্ঞ, যাহাকে বলা যায় পাকা খেলোয়াড। জানে যে যাহারা খ্রীষ্টান হয় তাহারা সব সময় ত্রাণকর্তা যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়া আসে না,—বরং অধিকাংশ সময়েই নয়। অবশ্য ইমানুলের এ-ব্যাপারটা একট বাড়াবাড়ি, একেবারে চাঁদে হাত বাড়ানো। কিন্তু সে কথাটা বাড়িতে দিল না। খলিফা লোক, যেমন বাড়িতে দিল না, তেমনই আবার নিরুৎসাহও করিল না; বলিল, "এটা এমন কিছু বেশি কথা নয়। তুমি পাবে, তবে সময় নেবে একটু। আগে কিছু উপার্জন কর, কিছু সঞ্চয় কর; তারপর আমি যথাসময়ে ফাদার চাইণ্ডের কাছে কথাটা ভাঙব। ইতিমধ্যে আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ইমানুল দীক্ষিত হইবার কয়েকদিন পরে, চাইল্ড-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া কলিকাতায় তাঁহার এক ব্যবসাদার বন্ধুর নিকটে ইমানুলের মালীগিরির চাকরি জোগাড় করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিল। বলিল, "এবার গিয়ে তুমি মাসে মাসে টাকা জোগাড় করতে থাক ইমানুল, আমি এদিকে পথ পরিষ্কার করতে থাকি। তুমি শুধু আমায় মাঝে মাঝে চিঠি দিতে থেক এবং দয়াময় যীশুর কাছে খুব প্রার্থনা করতে থেক।...পাবে বইকি মিস ফ্লোরেন্সকে, তবে সময় নেবে।"

ন্যাথেনিয়াল জানিত সভ্য জীবনকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেই এই বন্য ওরাঁওয়ের মোহ ভাঙিবে, তাহার পূর্বে নয়।

ইমানুল কলিকাতায় আসিল এবং চাকরি ও প্রার্থনা শুরু করিয়া দিল। এমনই রোজ প্রার্থনা করিত নিজের ঘরে, তাহার পর প্রথম রবিবার আসিতেই পাদ্রীর দেওয়া অতিরিক্ত বড় কোট-প্যান্ট পরিয়া সাহেব-পরিবারের সঙ্গে গির্জায় যাইবার জন্য তাহাদের

লদ নয়। ফলে সেইদিন তাহার দুইটি জিনিস ঘুচিয়া যায়—চাকরি আর সাম্যের মোহ। তাহার পর এখানে চাকরি করিতেছে। এখানেও প্রায় বছর-চারেক হইল;

আমি বলিলাম, "ইমানুল, তবুও রাজা-লাটসাহেবের ধরন সম্বন্ধে তোমার মোহটা গেল না?"

ইমানুল দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল, "সাহেব আমীর মাস্টার-বাবু, ওদের কথা যেতে দিন, ত্রাণকর্তা যীশু বলেছেন, একটা ছুঁচের ছেঁদার অন্দর দিয়ে একটা উট গলে যেতে পারে, কিন্তু একজন আমীর লোক স্বর্গে যেতে পারে না। কিন্তু ফাদার-চাইল্ড অন্য রকম লোক আছেন, তিনি ত্রাণ্‌কর্তা, যীশুর মতন, কাউকে নীচু দেখেন না। আপনি দিন লিখে বাবু নাথুকে। লিখুন, 'ভাই ন্যাথেনিয়াল পুরীনকে ইমানুল রোমানের হাজার হাজার সেলাম পৌঁছে'—ইংরিজীতেই লিখবেন বাবু, নাথু ইংরিজী জানে—পরে, এর আগের সব খাত নাথু ভাইকে জানিয়েছি, কিন্তু এখনতক কোন জবাব না পাওয়ায় মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি…"

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত চাহিতেই ইমানুল কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, 'মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা' লব্‌জটা নিশ্চয়ই লিখে দেবেন মাস্টার-বাবু, ইংরিজীতে—ক্লীনার মদন শিখিয়ে দিয়েছে খুব জোর আছে লব্‌জটাতে। মদন আপন ইস্তিরিকে হরেক চিঠিতে লেখে—'মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি'—খুব জলদি জবাব এসে পড়ে। লিখে দিন—মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি। ইংরিজীতে আরও ওজনদার হবে লব্‌জটা—হেঁ বাবু…"

এমন সময় গেটের বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা, আর পোস্টকার্ড তুলিয়া ইমানুল গেট খুলিতে ছুটিয়া গেল।

একটু পরেই মীরার সঙ্গে মিস্টার রায় গাড়ি হইতে নামিলেন।

আমি বাহির হইয়া গাড়ি-বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম, অভিবাদন করিতে মীরা সংক্ষেপে পরিচয় দিল—"তরুর নতুন টিউটর—শৈলেনবাবু।"

মিস্টার রায়— "দ্যাটস্ অল্ রাইট্!" (That's all right!) বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু শিরশ্চালন করিলেন, তাহার পর পিতা পুত্রীতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমার মনটা অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। ভীত, ক্ষুণ্ণমনে হাজার রকম অশুভ কল্পনা করিতে করিতে আমি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

কারণ ছিল। মিস্টার রায় যেন কল্পনার মধ্য হইতে মূর্তি লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন, —আমার বিভীষিকার ধ্যানমূর্তি। সেই বাঁকা টিকলো নাক, সেই ঈষৎ কোটরগত তীক্ষ্ণ চক্ষু, সেই কপাল, সেই মোটা ঘন ভ্রূ, বর্তুল চিবুক। মনটা আমার একটা অহেতুক অস্বাচ্ছন্দ্যে যেন নিজের মধ্যেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল। কল্পিত চেহারার সঙ্গে এ

মিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগিল না, কেন না এ-রকম মিল কখনও হয় না। কেবলই মনে হইতে লাগিল—ইহার পিছনে একটা দৈব অভিসন্ধি আছে।

আমার জীবনে আর একবার মাত্র এইরূপ রহস্যময় মিলের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনটাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। খুব ছোটবেলায় একবার আমাদের বাংলা স্কুলে থার্ড মাস্টারের পদ খালি হয়। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখিলাম নূতন থার্ড মাস্টার একজন আসিয়াছেন ;—মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, সুঁচাল দাড়ি, সবল চেহারা। আসিয়াই প্রথমে হেডমাস্টারকে চেয়ারসুদ্ধ তুলিয়া আছাড় দিলেন—ছেলেদের না ঠেঙাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সেকেণ্ড মাস্টার আগন্তুককে নমস্কার করিবার জন্য সহাস্য মুখে হাত তুলিতে যাইতেছিলেন, আকস্মিক বিপদ দেখিয়া ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। নূতন মাস্টার তাঁহাকে তাড়া করিয়া রাস্তা পর্যন্ত দিয়া আসিলেন, তাহার পর সেই অভিভাবকহীন স্কুলে ঢুকিয়া আমাদের মার। সে যে কি মার, স্বপ্ন হইলেও এখনও গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! যখন ভাঙিল স্বপ্ন, দেখি ঘামিয়া নাহিয়া গিয়াছি।

পরের দিন সত্যই থার্ড মাস্টার আসিলেন,—সেই টাক, সেই গোঁফ, সেই সুঁচাল দাড়ি, সেই চেহারা। প্রথম দিনই আমাদের ক্লাসের বলাইয়ের ঘাড়ে মার পড়িল। তেমন বিশেষ দোষ ছিল না ; কিন্তু থার্ড মাস্টার বলিলেন, "আজ ভাল দিন দেখে কাজে জয়েন করেছি, বৌনিটা সেরে রাখলাম। তোমাদেরও সুবিধে হল, হেডমাস্টারের মত আমার কাছে মামার বাড়ির আবদার খাটবে না, এটা জেনে রাখলে।"

তাহার পরদিন থেকেই মার আরম্ভ হইল। সে যে কি উৎকট অমানুষিক প্রহার!—পাঁচ দিনের মধ্যে সাতটা ছেলে বিছানা লইল। অবশ্য হেডমাস্টারকে মারেন নাই—স্বপ্নে একটু বাড়াবাড়িই হয়—তবে আমাদের পড়াইয়া অর্থাৎ প্রহার করিয়া যে সময়টা বাঁচিত সেটা মাস্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই করিয়াই কাটাইতেন। এগারটি দিন ছিলেন, তাহার পর স্কুল কমিটির বিশেষ অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে সরানো হইল। যাইবার দিন একটু অনুতপ্ত গোছের হইয়াছিলেন, হেডমাস্টার প্রভৃতিকে বলিলেন, "দুঃখু রইল—আমাদের পরস্পরের ভাল করে পরিচয়ই হল না : ফুরসত পেলাম কই?"

তাহার পর কল্পনা আর বাস্তবে আশ্চর্য এই মিল দেখিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি মন বড়ং বিমর্ষ হইয়া রহিল এবং সমস্ত দিন আমি মিস্টার রায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া কাটাইলাম বলা বাহুল্য, এই স্নিগ্ধ পরিবারের সঙ্গে পক্ষাধিক কাল কাটাইয়া আমার যে একটা অহেতুক এবং অস্বাভাবিক ব্যারিস্টার-ভীতি ছিল সেটা অনেকটা অপসারিত হইয়া আসিয়াছিল, বুঝিতে পারিতেছিলাম একটু বড় মহলে কখনও যাতায়াত না থাকায়

দরুনই বড়দের সম্বন্ধে আমার একটা অপরিচয়ের আতঙ্ক থাকিয়া গিয়াছিল, এ এক ধরনের হীনমন্যতা—ব্যারিস্টারভীতি তাহারই একটা উগ্র রূপ। বেশ কাটাইয়া উঠিতেছিলাম দুর্বলতাটুকু, সব ভণ্ডুল করিয়া দিল চেহারায় কাল্পনিক আর বাস্তব ব্যারিস্টারের এই কল্পনাতীত মিল। অবশ্য ভয় আর কিছু নয়। মিস্টার রায় যে খুব একটা অভদ্র রকম কিছু করিবেন এমন নয়, তবে ব্যারিস্টারিপদ্ধতিতে খুব কড়া জেরায় ফেলিয়া আমায় ভদ্রভাবে অপদস্থ করিতে পারেন; আমার চাকরির মধ্যেই তাঁহার জেরার প্রচুর মালমশলা রহিয়াছে।—এত বেশি মাহিনার টুইশনি যে লইয়া বসিয়া আছি কি বিশেষ যোগ্যতা আমার? তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া এক অনভিজ্ঞা বালিকাকে কি এমন বুঝাইয়াছি যে, সে নির্বিচারে নিয়োগ করিয়া ফেলিল? গৃহকর্তা বাড়ি নাই দেখিয়াও আমি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিলাম না কেন?

কতকটা আড়ালে আডালেই কাটাইলাম এবং বৈকালে তরুকে লইয়া যখন বেড়াইতে গেলাম খুব সন্তর্পণে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলাম—মিস্টার রায় আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নাদি করিয়াছেন কিনা। তরু বলিল—"কিচ্ছু না"…এ উত্তরে নিশ্চিন্ত হইবার কথা, কিন্তু আমি আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল লোকটা কিছু একটা মতলব আঁটিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। একটা নূতন লোক বাড়িতে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিলও অথচ তাহার সম্বন্ধে না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলে না, এ তো ভাল লক্ষণ নয়।

আহারের সময় আবার সাক্ষাৎ হইল। রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "ওঁরা ডাইনিং রুমে এসেছেন, সায়েব আপনাকে ডাকছেন।……সায়েব ভয়ঙ্কর খাপ্পা হয়েছেন মাস্টার-মশা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন রে?"

"গভর্ণমেণ্ট বলছে—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি দিল্লীতে নিয়ে যাবে।"

আশ্বস্ত হইলাম—রাজুর সেই পাকামি! তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিলাম এবং মিস্টার রায়কে নমস্কার করিয়া নিজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

মিস্টার রায় সত্যই কি একটা লইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছিলেন, আমি দাঁড়াইতেই আমার পানে চাহিয়া স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "আই সী! (I see) তুমিই তরু-মার টিউটর হয়েছ? দাঁড়াও একটু দেখি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বাঃ, তোমরা সবাই খেতে বসেছ, আর ও বেচারি চেয়ার কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তুমি ব'স শৈলেন।"

মিস্টার রায় অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "O, sorry, I didn't

mean that ! (না, তা বলবার উদ্দেশ্য নয় আমার)—তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলব কেন, ব'স ব'স···মিলিয়ে দেখছিলাম মীরা-মা তোমার যেমনটি বর্ণনা করে লিখেছিল আমায়, ঠিক সেই রকমটি তুমি—exactly, মীরা লিখেছিল···"

মীরা যেন প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার চেষ্টায় বলিল, "বাবা, পদ্মার কথা ছেড়ে দিলে কেন ? মাস্টারমশাইও নিশ্চয় শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন।" যাহাতে আমি ব্যস্ত হইয়া উঠি সেজন্য আমার পানে কতকটা প্রত্যাশা ও মিনতির দৃষ্টিতে চাহিল।

বলা বাহুল্য, মীরা কি লিখিয়াছিল সেইটকু শুনিবার জন্যই আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছি, তবু আগ্রহের অভিনয় করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "পদ্মার কথা হচ্ছিল নাকি ? তাহ'লে তো···"

মিস্টার রায় বলিলেন, "পদ্মার কথা বলব বই কি, না বললে আমার আহার পরিপাক হবে না ; She is sublime (পদ্মা মহিমময়ী)···হ্যাঁ, কি বলছিলাম ? ঠিক কথা —মীরা-মা লিখেছিল—You are too grave for your age, তা সত্যিই তুমি বয়সের অনুপাতে বেশি ভারিক্কে—if I am any judge of physiognomy (আকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে)...মীরা-মাঈ, কত বয়স লিখেছিলে মাস্টারমশাইয়ের ?"

অবাধ্যভাবেই আমার দৃষ্টি একবার টেবিলের চারিদিকে ঘুরিয়া গেল—সকলে যেন কাঠ মারিয়া গিয়াছে। শুধু তরু তাহার শৈশবসুলভ অনভিজ্ঞতায় কিছু কৌতুকের আভাস পাইয়া একবার এর, একবার ওর মুখের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে।

সামলাইল মীরাই, উপস্থিত-বুদ্ধি তাহারই বেশি, সামলাইলও, আবার সুযোগ পাইয়া আমার গাম্ভীর্যকে ব্যঙ্গও করিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন লিখে থাকব বোধ হয়, ঠিক মনে পড়ছে না।"

মিস্টার রায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "O no, you naughty girl ! He is hardly twenty-four—বাইশ-তেইশের বেশি হতেই পারে না। Yes, let me see··· (থামো দেখি) না, তুমি আমায় বয়সের কথা লেখইনি মীরা,—না লেখনি —রয়েছে চিঠি আমার কাছে। লিখেছ, লোক ভাল, লিখেছ, সাহিত্যিক—মানে, তরুকে ওদিকে ট্রেনিং দিতে পারবেন—অর্থাৎ তোমার সিলেক্‌শন যাতে আমি রদ না করে দিই সেই জন্যই বোধ হয় আর সব কথাই লিখেছ ওঁর সম্বন্ধে, কিন্তু বয়সের কথা···'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে মীরার নমিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মাঝপথেই থামিয়া গেলেন। অপর্ণা দেবী এই সময় মুখটা একট নীচু করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "লেখেনি নিশ্চয় বয়সের কথা।"

মাথা নীচু করিয়া থাকিলেও বেশ বুঝিলাম, কথাটকু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী স্বামীর

দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়াছে। মিস্টার রায় সঙ্গে সঙ্গে চিঠির প্রসঙ্গটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া নির্বাকভাবে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় মিনিট পাঁচেক শুধু সবার কাঁটা-চামচ-প্লেটের ঠোকাঠুকির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল,—মাঝে মাঝে শুধু এক-একবার মিস্টার রায়ের—"I see ··হু বুঝেছি।" একবার বোধ হয় উপরে উপরেই অপর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ তুমি, Yes, you are right ··ভুল হয়েছে···"

সামলাইতে যাইযা যে আরও বেসামাল করিয়া ফেলিতেছেন সেদিকে হুঁশ নাই।

খানিকক্ষণ পরে কথাবার্তা আবার স্বাভাবিক ধারায় প্রবর্তিত হইল। কুমিল্লার কথা, আট ঘণ্টা পদ্মার উপর ষ্টিমার-যাত্রার কথা, তরুর লেখাপড়ার কথা, মল্লিকদের বাড়িতে পার্টির কথা। মীরা আর অপর্ণা দেবী সাবধানে প্রসঙ্গটা ঠিকপথে চালিত করিয়া রাখিলেন। তবু মিস্টার রায় তরুর পড়িবার আলোচনায় শেষের দিকটায় আবার একটা বেফাঁস করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আমার আইডিয়া ছিল বেশ একজন বয়স্ক দেখে টিউটর ঠিক করা; তোমায় সে-কথা বলেছিলাম কি কখনও মীরা-মাঈ ?"

মীরা আবার রাঙিয়া বলিল, "কই, না তো বাবা !"

অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে খাওয়া, এইবার তাহলে ওঠ তোমরা; তুমি আবার রাত জেগে আছ।"

উঠিয়া হাত মুছিতে মুছিতে মিস্টার রায় কতকটা চিন্তিতভাবে আপন মনেই বলিলেন, "তাহলে বলিনি। আর ভালই হয়েছে—যারা ছোট, অল্প বয়স, তাদের চোখের সামনে সর্বদা আমাদের মত বুড়ো একজন থাকা ভাল কি-না সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—তাতে তারাও বুড়িয়ে যেতে পারে···"

কথা শেষ হইবার আগেই যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা সে-ই প্রথমে পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

১১

রায়-পরিবারের সঙ্গে দিন দিন বেশ ভাল করিয়া মিশ খাইয়া যাইতেছি। আর সবাই চমৎকার, এক আশঙ্কা ছিল ব্যারিস্টার রায়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি তাঁহার মত অমায়িক লোক অল্পই দেখা যায়। বরং বলা চলে তিনি একদিক দিয়া আমায় নিরাশ করিয়াছেন কেন না যে-জিনিসটা সম্বন্ধে একটা উৎকট রকম ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছি, যদি দেখা যায় যে, সেটা উৎকট হইবার ধার দিয়াও গেল না তো মনে একধরনের নৈরাশ্য আসে। মনটা যেন উৎকটকে গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহার পর দেখে তাহার কষ্ট করিয়া অত তোড়জোড় করাই বৃথা হইয়াছে। আমার তো মস্ত

বড় একটা উপকার করিয়াছেন, একটা পেশা সম্বন্ধেই আমার ভ্রান্ত ধারণা একেবারে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমার আদর্শ ব্যারিস্টারের চেহারাওলা লোকই যখন এই রকম তখন আর কোন দ্বিধা সন্দেহই নাই আমার ও-সম্প্রদায় সম্বন্ধে। এখন এমন একটা অদ্ভুত ধারণা এককালে ছিল বলিয়া নিজের পানেই বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহি মাঝে মাঝে

তরুর পড়াশুনা চলিতেছে। ওকে এইভাবে যে কি করা হইবে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অন্তত এই দোটানার মধ্যে ওর শিশু-মন বিভ্রান্ত এবং কখন কখন সেই বিভ্রমের জন্যই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এটা বেশ বুঝা যায়। একদিন লরেটো থেকে আসিয়াই সোজা আমার ঘরে উপস্থিত হইল এবং বইয়ের স্যাচেলটা আমার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া একেবারে আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রশ্ন করায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি আর যাব না লরেটোয় মাস্টারমশাই, কখনও যাব না আমি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল তো, কি হল ?"

"না, ওদের মেয়েরা গালাগাল দেয় আমাদের শিবঠাকুরকে, বলে, **'He is a mad snake-charmer'** (পাগলা সাপুড়ে)। আমি বলেছি তাদের—**'I will ask him to curse you'** (আমি তাঁকে বলব তোমাদের শাপ দিতে)। শাপ দিয়ে দেবেন'খন সবাইকে ভস্ম করে। কিন্তু আমি যাব না ওদের স্কুলে, মাস্টারমশাই……"

তাহার পরদিন লক্ষ্মীপাঠশালা হইতে দশটার সময় আসিল বেশ প্রফুল্লভাবে। মোটর থেকে নামিয়াই আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন কতকটা বিজয়োল্লাসে প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই ইম্যাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শুন্ কি সম্ভব ?"

আমি লিখিতেছিলাম, স্তম্ভিতভাবে ঘুরিয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া একটু কড়াভাবেই প্রশ্ন করিলাম, কে শেখালে তোমায় এ কথা তরু ?"

আমার ভাবগতিক দেখিয়া তরু একেবারে হতভম্ব হইয়াআমার মুখেরপানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একেবারে ভগ্নস্বরে আমতা-আমতা করিয়া বলিল. "না, কেউ বলেনি আমায়···ওদের জিজ্ঞেস করতে বলে দিয়েছে···!"

কথাটা বুঝিলাম, লক্ষ্মীপাঠশালায় গিয়া শিবনিন্দার কথা প্রচার করায় এই ফলটি দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় কোন অগ্রণী বয়স্থা ছাত্রী প্রশ্নের আকারে এই পাল্টা জবাব প্রেরণ করিতেছে ; ব্যাপার দাঁড়াইতেছে কবির লড়াইয়ের মত। তরুর আবার যাহাতে বেশি কৌতুহল উদ্রেক না হয় সেই উদ্দেশ্যে বলিলাম, "ও-কথা বললে ওদের ঠাকুরকেও পাগল বলা হয় তরু, তাই তোমায় কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটা কি তোমার বলা উচিত ? ধর্ম নিয়ে কারুর মনে কষ্ট দিতে আছে ?"

তরু লক্ষ্মী মেয়ের মতই উত্তর করিল, "না মাস্টারমশাই ; তাভিন্নমহাদেব তো শুধু

আমাদের ঠাকুর, ক্রাইস্ট যীশু ওদের, আমাদের—সব্বারই ত্রাণকর্তা। মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে অন্যদের মারেন, ক্রাইস্ট তো নিজেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।”

এও এক জগাখিঁচুড়ি হইয়া যাইতেছে, লরেটোর শেখানো বুলি লক্ষ্মীপাঠশালার বর্ম ভেদ করিয়া শিশু হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এ-কথা সেদিন মিস্টার রায়কে বলিলাম। আহারের পর উনি গিয়া একটি ঘরে একটু একান্তে বসেন। ওঁর শখের আলোচনা জ্যোতির্বিজ্ঞান,—সেই সময় কখন কখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ওই সময়টিতে ওঁর একটু পানের অভ্যাস আছে। দু'এক পেগের পর ওঁর অমায়িক মনটা আরও উদার হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে আমায় দুই-একদিন ডাকিয়া কিছু এদিক-ওদিক আলোচনাও করিয়াছেন। আজ আমার কথাটা শুনিয়া অনেক কথাই বলিলেন, বেশির ভাগই ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে। স্বীকার করিলেন, ওঁর ওই উগ্র পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা উনি অপর্ণা দেবীর জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন, পুত্রের দিক দিয়া তো বটেই, বোধ হয় মীরার দিক দিয়াও। এখন তরুকে লইয়া আসলে একটা পরীক্ষা চলিতেছে। মিস্টার রায়ের মত, তাঁহার সন্তানেরা তাহাদের মায়ের দিকে না গিয়া তাহাদের বাপের দিকেই গিয়াছে অর্থাৎ বাপের মারফত পাশ্চাত্য ভাবটা তাহাদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে একেবারে। এই যদি তাহাদের প্রকৃতি তো সে-প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া সুফলপ্রদ হইবে না। তাই নমনীয় অবস্থাতেই তরুর উপর দিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুইটি ধারার পরীক্ষা চলিতেছে। তরু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় মায়ের দিকে যাইবে। মিস্টার রায় বলিলেন, **“I am hoping, Sailen, I may give at least one of our children to their Poor mother”** (শৈলেন, আমার আশা, আমাদের অন্তত একটি সন্তান ওদের মার হাতে দিতে পারব)।

মিস্টার রায় পেগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে একটু চুমুক দিলেন, তাহার পর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, “শৈলেন, অথচ এই পাশ্চাত্য ভাবের জন্যে দায়ী ওদের মা-ই, অপর্ণা।' আমি নীরব প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। মিস্টার রায় মাথাটা নাড়িয়া একটু জোরের সহিতই বলিলেন, **“Yes Aparna. Except for her saree you could not know her from a European girl in those days”** (শাড়ি না থাকলে সে-যুগে ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে ওর কোন পার্থক্যই ধরা যেত না)। কলেজের প্রথম ছাত্রী,—ডিবেটে বল, টেনিসে বল, স্টাইলে বল ও ইংরেজ ছাত্রীদেরও পেছনে ফেলে যেতে। আমি তখন বিলেতে, পুরোপুরি ওরই উপযোগী হবার জন্যে পাশ্চাত্য ধরন-ধারনে কত যত্নে কত ব্যয়ে হাত পাকালাম, তারপর যখন আমি তোয়ের, **the miracle came** (বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটল)। ওর প্রতিভা দেখে ওকেও বিলেতে পাঠাবার কথাবার্তা বহুদিন থেকে চলছিল—সে-যুগে একটা দুঃসাহসের ব্যাপার। কথা

'ঠিক-ঠাক, নেক্স্ট স্টীমারেই অপর্ণা বিলেতে আসছে, কেম্ব্রিজে ভর্তি হবে, ভারতীয় মেয়ের প্রতিভা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে, হঠাৎ 'কেবল' পেলাম—অপর্ণা আসছে না। পাছে শক পাই আসল কথাটা কেউ আর আমায় খুলে জানালে না। বিলেত থেকে আমি একেবারে full-fledged সাহেব হয়ে ফিরলাম and then I had the shock of my life (জীবনের সবচেয়ে মোক্ষম আঘাতটা পেলাম)। Where was the Aparna of my dreams ? (আমার স্বপ্নের সে অপর্ণা কোথায় ?) দেখলাম শাড়ি-সিঁদুর-শাঁখা-আলতায় এক ভট্টচায-গিন্নী সামনে উপস্থিত।"

মিস্টার রায় রসিকতাটুকু হাসিতে হাসিতে করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কত বৎসর পূর্বের কথা হইলেও হাসিটুকুতে সেদিনের সেই নৈরাশ্যটুকু লাগিয়া আছে। পেগে আর এক চুমুক দিলেন, তাহার পর পাত্রটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া কৌচে হেলিয়া পড়িয়া ছাদের দিকে খানিকটা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কালের ব্যবধান ভেদ করিয়া কত দূরে গিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার। একটু পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া কতকটা-যেন আত্মগতভাবেই বলিলেন, "পরিবর্তনটা টের পেলেও যে আমি অপর্ণাকে ছাড়তে পারতাম এমন নয়—I was over head and ears in love with her" (আমি ওর প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম)।

একটু থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "She is a wonderful girl, believe me Sailen" (বিশ্বাস কর, আশ্চর্য মেয়ে অপর্ণা)।

মিস্টার রায় স্মৃতির আলোড়নে ভাবাতুর হইয়া পড়িয়াছেন। আমারও কিছু একটা বলা দরকার এখানে, প্রাণের অন্তরতম কথাটাই আপনি বাহির হইয়া আসিল, বলিলাম, "আমি ওঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করি।"

মিস্টার রায় সেই রকম আবিষ্টভাবেই আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, And she deserves" (তার যোগ্যও সে)। তাহার পর অকস্মাৎ আলোচনার মোড় ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া উঠিলেন, "Bye the bye, মীরাকে তোমার কি রকম বোধ হচ্ছে ?"

আমি একবারে নির্বাক হইয়া গেলাম। মিস্টার রায় সাধারণ কৌতূহলেই বোধ হয় কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমার মনে যে কোথায় ঘা দিলেন তাহার খোঁজ রাখেন নাই, তবু আমি বেশ নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিতে পারিলাম না, একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে···মীরা দেবী···মানে, আমি এই মাস-দুয়েকের কাছাকাছি সামান্য যতটুকু দেখছি, তাতে তো খুব ভাল, মানে···"

এই কয়েকটি কথা বলিতেই কপালে ঘাম জমিয়া উঠিল, মিস্টার রায় চুরুটের ধূম্রজালের মধ্য দিয়া আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—সেই আমার চিরকালের

বিভীষিকার ব্যারিস্টার, খাঁড়ার মতন নাক কি একটা রহস্য ভেদ করিবার জন্ত উন্তত হইয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটা পাইপের উপর চাপা, তাহাতে চিবুকটা আরও ধারাল হইয়া উঠিয়াছে যেন।...আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, হঠাৎ থামিয়া গিয়া দৃষ্টি নত করিলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ গেল ; সে এক অসহ্য অবস্থা, আমি অপরাধের গুরুভার লইয়া চক্ষু নত করিয়া বসিয়া আছি, অনুভব করিতেছি—আমার ললাটে আসিয়া পড়িতেছে বিচারকের দৃষ্টি। আমি রায়-পরিবারে আতিথেয়তার অবমাননা করিয়াছি, মীরার আমি পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি, আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছি।... ধরাইয়া দিয়াছি আমি নিজেকে নিজেই, মিস্টার রায় বোধ হয় নিতান্ত সাধারণ কৌতূহলেই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন—মীরাদের প্রসঙ্গটা তো চলিতেই ছিল, আমার বিবেক আমার কণ্ঠে জড়তা আনিয়া দিয়া তাঁহার কাছে কথাটা ফাঁস করিয়া দিল যে, আমি চক্ষু নত করিয়া অনুভব করিতেছি, আমার স্বেদসিক্ত ললাটে মিস্টার রায়ের উদ্যত দৃষ্টির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—দেখিতেছি না, কিন্তু তাহার জ্বালা অনুভব করিতেছি।

অসংযতভাবেই চক্ষুর পল্লব একবার উপর দিকে উঠিল। কী স্বস্তি! মিস্টার রায় আমার দিকে মোটেই চাহিয়া নাই, কৌচের পিঠের উপর মাথাটা উল্টাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া, চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে পাইপটা টানিতে লাগিলেন।

আরও একটু গেল।

তাহার পর সেই ভাবেই পাইপ-মুখে প্রশ্ন করিলেন, "So you have joined yous M.A. class already" (তাহ'লে এম-এ পড়া শুরু ক'রে দিয়েছ)?

উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হুঁ... ।"

আরও খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল, তাহার পর মিস্টার রায় সোজা হইয়া প্রশ্ন করিলেন "Suppose you go abroad and fetch a European degree" (যদি ইউরোপ গিয়ে সেখান থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এস তাহ'লে কেমন হয়)?

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন ; "মীরাকে কেমন বোধ হচ্ছে"—তাহার চেয়ে শতগুণে অপ্রত্যাশিত। আমি কয়েকটা অদ্ভুত, অস্পষ্ট অনুভূতির মিশ্রণে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম ; হাঁ-না, কোন রকমই উত্তর মুখে জোগাইল না।

আরও একটু পরে মিস্টার রায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাও শোও গে রাত হয়েছে, আমি স্টেট্‌স্‌ম্যানে তোমার ফ্রেণ্ড মিস্টার করের অ্যাস্ট্রনমি সম্বন্ধে সেই লেখাটা ততক্ষণ পড়ি। ...গুড্‌ নাইট্‌...হ্যাঁ, তরুর কথা শুনলাম, আর একদিন দু-জনে বসে ভাল ক'রে আলোচনা করতে হবে।... গুড্‌ নাইট।"

দুঃখের জীবনে বিনিদ্র রজনী অনেকই কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু সেদিনের সেই কে

তন্দ্রাহীন রাত্রি যা দীর্ঘ হইয়াও সুখের তীক্ষ্ণতায় আমার কাছে অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কথা এ-জীবনে কখনও ভুলিব না। শিশু যেমন অতি সামান্য খেলনা লইয়াই কল্পনায় নিজের আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলে, মিস্টার রায়ের তিনটি অতিসামান্য কথা লইয়া আমি আমার জীবন-মরণ সৃষ্টি করিয়াছি সেই রাত্রে—মীরাকে কি রকম বোধ হচ্ছে? এম্‌-এ তাহ'লে শুরু ক'রে দিয়েছ? আচ্ছা, ইউরোপে গিয়ে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে কেমন হয়?

নিতান্ত খাপছাড়া তিনটি কথা, কিন্তু প্রশ্নে-উত্তরে, আশায়-আবেগে এই তিনটি লইয়াই যে কত গড়াপেটা সেদিন, এখনও ভাবিলে বিস্মিত হই। কত অসংলগ্ন অসম্ভব কল্পনা, সবকেই সূত্রের মত বাঁধিয়া রাখিল, সবের মধ্যেই সামঞ্জস্য আনিল শুধু একটি প্রশ্ন—"মীরাকে তোমার কেমন বোধ হচ্ছে?"

হয়তো নিতান্ত নিরুদ্দেশ ভাবেই মিস্টার রায় প্রশ্ন তিনটি করিয়াছিলেন, হয়তো যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সবটুকুই মিথ্যা তবু সেই রাত্রিটি একটা চরম সত্যরূপে আমার জীবনে শাশ্বত হইয়া আছে।

১২

মাস চারেক কাটিয়া গেল। মীরা আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমিও কি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি ওর জীবনে? ও আমার লেখা খোঁজে, মাস্টারির অভিনয় করে তরুকে লইয়া—যখন বোঝে আমি টের পাইয়াছি, হঠাৎ ভারিক্কে হইয়া উঠিয়া মনিবের গুরুতর সম্বন্ধটা মেরামত করিতে লাগিয়া যায়। এ আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্য দিয়া কি হইতেছে সব সময় ঠিক ধরিতে পারি না, সন্দেহ হয়।

একদিন মিস্টার রায় বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি। কারণটা ঠিক মনে পড়িতেছে না, খুব সম্ভব বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছিল না। আমি আসিবার এই মাস চারেকের মধ্যে মীরা চার-পাঁচটি ছোট-বড় পার্টিতে যোগদান করিয়া আসিল দেখিলাম, তাহার মধ্যে তরুর সঙ্গে একটিতে আমিও ছিলাম; সেই সব নিমন্ত্রণের পাল্টা-নিমন্ত্রণ হিসাবে মীরা বোধ হয় পিতাকে রাজি করাইয়া এই বন্দোবস্তটা করিয়েছে। খুব ব্যস্ত ;—সাজানর প্ল্যান্‌, মেনুর (খাদ্য-তালিকার) নির্ণয়; যন্ত্র-সংগীতের জন্য ভবানীপুর হইতে অরকেস্ট্রা ঠিক করা, যাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত, কার্ড ছাপানো, বিলির বন্দোবস্ত—এই সব লইয়া কয়েকদিন তাহার যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই। উৎসাহের দীপ্তি, কর্মচঞ্চলতার কতকটা আলুথালু ভাব এবং তাহারই মাঝে মাঝে একটু ক্লান্তির অবসাদে তাহার এক যেন নূতন রূপ ফুটিয়াছে। মাঝে মাঝে পরামর্শ চায়। আমি এ-সমাজের অল্পই বুঝি, বিশেষ

করিয়া 'পার্টির বিষয় তো আরও কম। বলিলে মীরা বলে, "ও-সব শুনছি না। আপনি গা-ঝাড়া দিতে চান, শৈলেনবাবু। বাবার ফুরসত কম, একবার সেই রাত্তিরে খাবার সময় দেখা হবে, মাকে তো দেখছেনই, দাঁড়ান আপনিও স'রে, আমি দাঁড়িয়ে অপমান হই…।"

মীরা কথাগুলো একটু অভিমানের সুরে বলে। এ কয়দিন থেকে সেই কতকটা দৃপ্ত মীরা যেন লুপ্ত; মীরা কর্মের মধ্যে কতকটা যেন এলাইয়া গিয়াছে, তাহার চিরন্তনী অসহায় নারী-প্রকৃতিটা স্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমি অবশ্য তাহারই সাহায্যে তাহাকে পরামর্শ দিই, সে যাহা বলে, কিংবা কোন সময় বলিয়াছে সেই সব কথাই খানিকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার মন্তব্য জানাই, তাহাতেই সে প্রীত। মীরা এই কয়টি দিনে কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ভুলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারেই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ও বুঝিতেছে না, ফুরসত নাই ওর বুঝিবার, এমন কি পরিবর্ধমান অন্তরঙ্গতার মাঝে কখন "মাস্টারমশাই" ছাড়িয়া যে "শৈলেনবাবু" বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহারও হিসাব নাই বোধ হয় ওর; কিন্তু আমার হিসাব আছে, আমি সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিতেছি; এই লুকোচুরিটুকু যে কত মিষ্ট লাগিতেছে!…মীরা আমায় পাইতেছে না, কিন্তু মীরাকে আমি পাইতেছি।

বলিল, "আপনি নেমন্তন্নটা নতুন ক'রে লিখে দিন না—বাংলায় আজকাল যেমন নতুন কত ধরনের লেখে দেখতে পাই…"

লেখা হইলে মুখের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে, আমি মাথা খুঁড়লেও পারতুম না। আপনাকে যে কী বকশিস দেব তাই ভাবছি।"

আজ মীরা কি সত্যই এত কাছে?—যেন বিশ্বাস হয় না। আমি আমার যতটুকু সীমা ও অধিকার তাহার মধ্যেই একটা শোভন উত্তর খুঁজিতেছিলাম, মীরা হাসিয়া একটু চিন্তিতভাবে ভ্রূ-যুগল কুঁচকাইয়া থাকিয়া বলিল—"হয়েছে—ওর জন্যে কার্ড পছন্দ ছাপানো সব আপনার হাতে, আমি একেবারে আর ওদিকে চাইব না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অসহযোগিতাও একটা বকশিস নাকি?"

মীরাও তর্কের উৎসাহে অভিনয় করিয়া বলিল, "বাঃ নিজের একটা সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দেওয়া বকশিসের মধ্যে পড়ে না? ধরুন যদি…"

শেষ করিবার পূর্বেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি ওর কথার সরল অথচ অনভীপ্সিত মানেটা যেন ধরিতে পারি নাই, কিংবা ওর লজ্জাটাও যেন চোখে পড়ে নাই এইভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তা বেশ, আমার কিন্তু প্লেন কার্ড পছন্দ, মেলা ফুলকাটা-ফুলকাটা ভাল লাগে না। আপনার সঙ্গে রুচির মিল না হতে পারে তাই আগে থাকতে বলে রাখছি।"

মীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার আমার পানে চাহিল—ভান করিতেছি,না সত্যিই কিছু বুঝি নাই ? তাহার পর সহজভাবেই বলিল,"প্লেন তো নিশ্চয়ই, আমারও তাই পছন্দ।"

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কি ভাবিল মীরা আমায় ? স্থূলবুদ্ধি ? অরসিক ? জড় ? না, বুঝিতে পারিল আমি তাহার কথাটার অন্য যাহা মানে হইতে পারে তাহা পুরাপুরিই বুঝিয়াছি, না বুঝিবার ভান করিয়া তাহার লজ্জাটা সামলাইয়া লইয়াছি মাত্র ?

যাহাই ভাবুক, কাজটা কিন্তু ঠিকই করিয়াছি। মীরা লজ্জিত হইবে আর আমি ওর জ্ঞাতসারে সেই লজ্জা উপভোগ করিব সেদিন এত শীঘ্র আসে না।

পার্টিতে অনেকগুলি নূতন মানুষ দেখিলাম, মীরা সাধারণত তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতিরই। মীরাপ্রথম ঝোঁকটায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, বসাইতে ব্যস্ত ছিল, কতকটা নিশ্চিন্ত হইলে আমায় ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার মধ্যে একজন রেবা ;—মীরার বিশেষ বন্ধু। মীরা যখন কয়টা দিন সরগ্রামে মাতিয়া ছিল, রেবাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়াছি। মেয়েটি মীরার চেয়ে এক-আধবছরের ছোট হইতে পারে, খুব সুন্দরী, খুব শৌখীন এবং অত্যন্ত লাজুক। এর আগেও এবং পরিচয়ের পরও রেবাকে দেখিয়া আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, ও নিজের সৌন্দর্যকে এত ভালবাসে যে না সাজাইয়া গোছাইয়া যেন পারে না ; অথচ এই সাজানর জন্যই ওর অপরিসীম লজ্জা। এই মেয়েটিতে এই একটা নূতন জিনিস দেখিলাম, যেহেতু সুন্দরীরা একটু লজ্জিত বেশি হয় একথা সত্য হইলেও শৌখীনদের ভাগ্যে লজ্জা একটু কমই থাকে—কেননা শখ জিনিসটাই হইতেছে পরের চক্ষে নিজেকে বিশিষ্ট করিয়া দেখা।

রেবাকে অবশ্য এ-কাহিনীর মধ্যে আর পাওয়া যাইবে না, কারণ আমি আসিবার কিছু দিন পরেই হঠাৎ বিবাহ হইয়া রেবা লাহোর চলিয়া গেল। সৌন্দর্য, শখ আর লজ্জার অদ্ভুত সমাবেশে ও আমার মনে একটা কৌতূহল জাগাইয়াছিল, বলিয়া ওর কথা একটু না তুলিয়া পারিলাম না।

আর একটি যুবতী সম্বন্ধে আমার কিছুদিন হইতে কৌতূহল জগিয়াছিল, তাহার কারণ আগন্তুকদের মধ্যে তাহাকেই সবচেয়ে বেশি দেখিয়াছি এ-বাড়িতে, আর তরুর মুখেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। অর্পনা দেবী আজ সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন। জীবনে তাহাকে কখনও ভোলা চলিবে না। শুধু তাহাই নয়, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব তাহার স্মৃতির পাদপীঠে অনির্বাণ শ্রদ্ধার বাতি জ্বালিয়ারাখিব।

অপর্ণা দেবী গোড়া হইতে উপস্থিত ছিলেন ; কাল রাত্রি হইতে তাঁহার শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পার্টিটা আর পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না ; তবে

তিনি একটু বিলম্ব করিয়া নামিলেন, যখন প্রথম অভ্যর্থনার বেগটা কতকটা প্রশমিত হইয়া সবাই একটু স্থির হইয়াছে। তাঁহার সেই গরদের চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মুখে প্রসন্ন হাসি ঈষৎ ক্লান্তির সহিত মিশিয়া একটা অপার্থিব কারুণ্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অভ্যাগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফিরিলেন একটু। উনি নামিয়াছেন পর্যন্ত আমার নজরটা বেশির ভাগ ওঁর দিকেই রহিয়াছে। আমার মন আর দৃষ্টি ওঁকে বরাবরই খোঁজে, কম পায় বলিয়া আরও বেশি করিয়া খোঁজে।

এক সময় মীরা এক যুব-দম্পতির সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল—"শৈলেনবাবু,আপনার লেখার খোরাক, নিয়ে এলাম, পরিচয় করুন—তপেশবাবু, আর অনীতা—মিস্টার তপেশ বোস আর অনীতা চট্টোপাধ্যায়-অবশ্য এখন বোস—বুঝতেই পাচ্ছেন জ্যান্ত রোমান্স।"

আমি ওঁদের নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "রোমান্সের দিক থেকে ওঁদের অভিনন্দিত করছি।"

তপেশ হাসিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় অপর্ণা দেবী একটু যেন চঞ্চলভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখে একটা উদ্বেগের ভাব, চাপিবার প্রয়াস থাকিলেও বেশ প্রকট। প্রশ্ন করিলেন, "সরমাকে দেখছি না তো মীরা, আসেনি?"

মীরা যেন এতক্ষণ একটা দরকারী জিনিস ভুলিয়া ছিল, একটু চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া বলিল, "কই, দেখছি না তো!"

"আসেনি নিশ্চয়, কেন এল না বল তো? কার্ড পাঠাতে ভোল নি তো?"

"তাকে আমি নিজের হাতে কার্ড দিয়েছি। আসতও তো বরাবর কেমন হচ্ছে-না-হচ্ছে খোঁজ নিতে।"

"তবে!"

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ফোনে একবার দেখ মীরা, লক্ষ্মীটি!"

মীরা পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মোটর আসিয়া গেটে প্রবেশ করিল। "ঐ যে সরমাদের গাড়ি" বলিয়া মীরা ত্রস্তপদে অগ্রসর হইল।

সরমাকে আমি এই বাড়িতে পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি এবং এর-তার মুখে, বিশেষ করিয়া তরুর কাছে তাহার অল্প-বিস্তর পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় তাহার সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; দু-একটা কথা বলিতে চাই।

সরমাকে দেখিলে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া যায়,—স্থির-বিদ্যুৎ। এ-এক আশ্চর্য সৌন্দর্য যাহার পানে একবার চাহিলে আপাদমস্তক ভাল করিয়া না-দেখিয়া চক্ষু ফিরাইবার উপায় থাকে না। আমি ঠিক এই ধরনের সৌন্দর্য জীবনে আর একবার মাত্র দেখিয়াছি—একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মধ্যে। বোটানিক্যাল গার্ডেনসে

একটা লেকের ধারে সে, একজন আয়া আর একটা ছোট মেয়ে বসিয়া ছিল ; বোধ হয় তাহার ভগ্নী। আমার খেয়াল হইল যখন ছোট মেয়েটা বলিল—"Look, Kate, the Babu is staring at you" (কেট্, দেখ, বাবুটি তোমার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে)। আমি অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কেট্ অপ্রস্তুত বা বিস্মিত কিছুই হইল না। তাহার মানে কেট্ এতে অভ্যস্ত—লোকে তাহার দিকে একবার চাহিলে যে চাহিয়া থাকিবেই—কেটের এটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য আমি নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া সরমার দিকে চাহিয়া থাকি নাই। বাহাদুরি লইতেছি না ; সৌন্দর্য যেমন আপনাকে এবং আর সবাইকে আকৃষ্ট করে, আমাকে তাহার চেয়ে কিছু কম করে না, তবে আমি সেই—'Look Kate, the Babu is staring at you'-এর পর থেকে অতিরিক্ত সাবধানে থাকি, সৌন্দর্যকেও বিশ্বাস করি না ; চক্ষুকেও নয়। তবুও আলাদা ছিলাম, অভদ্রতার ততটা ভয় ছিল না, সরমার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখিলাম খানিকটা।

সরমার মাথায় এলো খোঁপা, চুলটা ঈষৎ কুঞ্চিত বলিয়া চিক্ চিক্ করিতেছে, বাঁকা কি সিধা কোন সিঁথিই নাই, চুলটা শুধু টানিয়া আঁচড়ানো। মুখটা বেশ পুরন্ত। মুখের ভাবটা একটু ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ গোছের, রঙটা খুব গৌর এবং একটু হলদেটে—অর্থাৎ রঙে রক্তাভা থাকিলে যে একটা উগ্রতা থাকে সেটা নাই। বিদ্যুৎও স্থির হইয়া গেলে এই রঙেই দাঁড়াইবে।

সরমার পরনে খুব হালকা কমলালেবুর রঙের একটা শাড়ি, সেই রঙেরই পুরা-হাতা ব্লাউস, কানে দুইটি ঝুমকা দুল, হাতে দু-গাছি রুলি চারগাছি করিয়া আসমানি রঙের রেশমী চুড়ি।

সরমা অসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে আরও যা অসামান্য তা তাহার শান্তি, যাহা প্রায় বিষাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।...বিদ্যুৎ শুধু স্থির নয়, তাহার দাহও হারাইয়াছে।

অপর্ণা দেবীও একটু আগাইয়া গিয়াছিলেন। মীরা হাসিতে হাসিতে সরমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "এসেছে তোমার সরমা, মা ; এই নাও।...মা হেদিয়ে উঠেছিলেন সরমাদি। ওঁর ভয় আমি তোমাকে কার্ড দিতেই ভুলে বসে আছি।"

সরমা লজ্জিতভাবে একবার অপর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। অপর্ণা দেবী তাহার মস্তকে হাত দিয়া হাতটা ধীরে ধীরে পিঠে নামাইয়া লইলেন, হাসিয়া বলিলেন, "আমার সরমাই তো, তোর হিংসে হয় নাকি ?"

সরমা হাসিয়া অপর্ণা দেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি রকম হ'ল কাকীমা ?

এদিকে বলছেন 'আমার সরমাই তো', আবার ওদিকে ধরে রেখেছেন যে কার্ড না পেলে আসতাম না। আমার জোর রইল তাহ'লে কোথায় ?"

আবার তিনজনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলেন। অপর্ণা দেবী একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বাঃ, কার্ড না দিলে আসবে না এ-কথা কেন বলব ? বলছিলাম মীরার পদে পদে যা ভুল,—তোমায় কার্ড বোধ হয় পাঠানই হয়নি। তোমার গুণের কথা চাপা দিচ্ছিলাম না, ওর দোষের কথা, ওর ভুলের কথা বলছিলাম।"

মীরা গম্ভীর হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, "সেইটেই কি ভুল হ'ত মা ?"

অপর্ণা দেবী তাহার পানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "বা রে! কার্ড না দেওয়াটা ভুল হ'ত না ? কী যে বলে মীরা !"

মীরা আরও তর্কের ভঙ্গিতে বলিল, "বা—রে, হ'ত ?—যে-সরমা তোমার এত আপনার যে মীরারও হিংসে হচ্ছে বলছ, তাকে কার্ড পাঠানই কি ভুল হয়নি ?"

সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য ঠেলিয়া তাহার হাসি উছলিয়া উঠিল।

ওর গাম্ভীর্যের পিছনে এই কৌতুক লুকানো ছিল দেখিয়া সরমা ও অপর্ণা দেবীও হাসিয়া উঠিলেন। অপর্ণা দেবী দুইজনের নিকটই পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হয়েছে, ওদিকে চল একটু! তোমরা দু-জনেই সমান।"

মীরা একটু আবদারে হুকুমের সুরে বলিল, "বল—দু-জনেই তোমার সমান আপনার অর্থাৎ সরমাদি আমার চেয়ে বেশি আপনার নয় ?"

অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "দু-জনেই সমান দুষ্টু, আর আপনার।...এস সরমা।"

ঘুরিতেই অল্প দূরেই আমায় দেখিলেন। আমি তখন অন্য দিকে চোখ-কান যে নাই আমার সেইটা প্রমাণ করিবার জন্য খুব মনোযোগের সহিত কেট্‌লি হইতে চা ঢালিতেছি। অপর্ণা দেবী কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি বড় একলা পড়ে গেছ তো শৈলেন। নতুন মানুষ... ।"

মীরা বলিল "আমাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে একটু জানা-শোনা ক'রে নিন্ না, মা।" একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যা একলষেঁড়ে মানুষ !"

অপর্ণা দেবী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তা বেশ তো। কিন্তু দাঁড়াও, আগে তোমাদের পরিচয়টা করিয়ে দিই। এটি আমাদের তরুর নতুন মাস্টার। এ সরমা, এ হচ্ছে · "

অপর্ণা দেবী হঠাৎ থামিয়া গেলেন; কি যেন একটা প্রবল কুণ্ঠা আসিয়া গেল মাঝখানেই। সরমাও একটু রাঙিয়া উঠিল।

অপর্ণা দেবী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না

শৈলেন।"

সরমা আবার একটু রাঙিয়া উঠিল, তাহার পর আমার নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন!"

আবার সবাই হাসিয়া উঠিলাম।

আমি উত্তর করিলাম, যোগ্যের প্রশংসায়—মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে কিনা, সরমা দেবী।"

সরমা সেইভাবেই বলিল, "শুনলেন—বললাম মিছিমিছি প্রশংসা করেন।"

আমি বলিলাম, "ঐটেই তো যোগ্যতার চিহ্ন!—আপনি যোগ্য বলেই তো মনে করেন আপনাকে যে প্রশংসাগুলো করা হয় সেগুলো আপনার প্রাপ্য নয়; যে অযোগ্য সে মনে করবে তার মত প্রশংসার পাত্র জগতে বিরল, অথচ লোকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলে না।···যা শূন্যগর্ভ তাই তো ভরে ওঠবার জন্যে হাহাকার করতে থাকে।"

যাহাকে ভালবাসা যায় সে কাছে থাকিলে একটা তৃতীয় নয়ন খোলে মানুষের। আমি যখন সরমার কথার উত্তর দিলাম—এই বলিয়া যে, সে প্রশংসার উপযোগী—তখন অপর্ণা দেবী, মীরা দুইজনে স্মিতহাস্য করিল; কিন্তু দেখিলাম মীরার হাসিটা যেন কতটা নিষ্প্রভ, অন্ততঃ মীরার কথা যে অল্প হইয়া গিয়াছে এটা তো বেশই স্পষ্ট। অবাধ্যভাবেই যেন চক্ষু গিয়া মীরার উপর পড়িল, সেই মুহূর্তেই আবার সরাইয়া লইলাম। মীরার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তাহার তৃতীয় নয়ন আমার চেয়েও শতগুণে জাগ্রত; ঐটুকুতেই সে বুঝিল সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হইয়া গেল।

১৩

শুধু সতর্ক হইল বলা ঠিক হইবে না; মীরার মূর্তিও গেল বদলাইয়া।

আমিও সতর্ক হইয়া গেলাম; কিন্তু শেষরক্ষা যে করিতে পারি নাই সেটা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে টের পাওয়া যাইবে।

পরিবর্তনের প্রথম তো এই দেখা গেল যে মীরা আরও সহজভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, বরং একটু বেশি করিয়াই। সরমার বাঁ-হাতটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এবার চল সরমাদি একটু ওদিকে, শচী তোমায় খুঁজছিলও, মা এস।"

আমি সতর্ক ছিলামই। আমি এখানে আসিয়াছি তরুকে পড়ানর কাজ লইয়া, আর একটা কাজ প্রকৃতির খেয়ালে আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—মীরাকে পড়া। আমি ওর অন্তস্থল পর্যন্ত ভালভাবে পড়িয়া ফেলিয়াছি। মীরা জেদী মেয়ে,

আমার মুখে সরমার প্রশংসাটা ওর কটু লাগিয়াছে। বেশ বুঝিলাম আমায় না ডাকিবার জন্যই মীরা উহাদের দুইজনকে এত ঘটা করিয়া ডাকিতেছে। আঘাতটা কাটাইবার জন্য আমি তখনই চায়ের কেট্‌লিটা তুলিয়া নিজের কাজে লাগিয়া গেলাম। মীরা মনে মনে বোধ হয় একটা কুটিল হাস্য করিয়া থাকিবে; নিজের পরাজয়টা বুঝিয়া তখনই অস্ত্র পরিবর্তন করিল, দুই পা গিয়াই গ্রীবা বাঁকাইয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "বাঃ আপনিও আসুন শৈলেনবাবু।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "ও বেচারি চা-টা ঢালছে; খেয়ে নিয়েই না হয় আসবে; এইখানেই তো আছি আমরা।"

মীরা বলিল, "বাঃ, বাড়ির লোক উনি, নিজের চা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? একটু দেখতে-শুনতে হবে না সবাইদের?

মিস্টার রায় অন্য একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়িলেন, মীরার শেষ কথাটারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু দেখ-শোনগে সবাই তোমরা, সার্ভিস্‌টা ঠিক হচ্ছে কিনা।"

তাহার পর সরমার মাথায় হাত দিয়া তাহার মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি আরও রোগা হ'য়ে গেছ সরমা-মাঈ—**You are killing yourself by inches; no**..." (তুমি তিল তিল ক'রে নিজেকে হত্যা করছ! ঠিক নয়...)!"

সরমা যেন অতিমাত্র সংকুচিত হইয়া গেল। মিস্টার রায় বিশেষ করিয়া যেন তাহাকেই বলিলেন, "যাও, দেখ-শোনগে সব। এবারে এদের স্ট্রিং-কন্‌সার্টটা বেশ ভাল হয়েছে, যে ছোকরা ব্যাঞ্জো ধরেছে তার হাতটি চমৎকার নয় কি?...হ্যালো!"

অভিমতের সমর্থনের অপেক্ষা না করিয়াই অন্য একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

মীরা আবার আমায় ডাক দিল, "আসুন শৈলেনবাবু।"

অপর্ণা দেবীও বলিলেন, 'এস শৈলেন, ও ছাড়বার পাত্রী নয়।"

মেয়ে-পুরুষে-শিশুতে প্রায় এক শতেরও অধিক লোক। সমস্ত বাগানটাতে, গাড়ি বারান্দার সামনে গোল ঘাস-জমিটাতে ছোট-বড় টেবিল পাতা। কোথাও দুইটা, কোথাও বা ততোধিক চেয়ার দেওয়া। সুবিধামত বসিয়া আহারের সঙ্গে সবাই গল্পগুজব করিতেছে; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ বেশির ভাগ করিল মীরাই, তাহার পর অপর্ণা দেবী, সরমা নমস্কার করিয়া প্রয়োজনমত এক-আধটা প্রশ্ন করিল বা উত্তর দিল, আমি একেবারেই রহিলাম নীরব।

একবার রাস্তার পাশের দেওয়ালের দিকটায় নজর পড়িল। ... গেটের থেকে

আরও একটু সরিয়া ইমান্থল, ক্লীনার মদন এবং অন্য গাড়িরও কয়েকজন ড্রাইভার দাঁড়াইয়া আছে, তামাসা দেখিতেছে। একটু দূরে, গেটের ওদিকটায় একটা ঝাড়ুদার মেথর, তাহার ঠিক পিছন দিকে একটা ঝুড়ি, উচ্ছিষ্ট সঞ্চয়ের জন্য একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। ইমান্থলকে চিনিতে একটু বেগ পাইতে হইল, সে একটা ঝলঝলে স্যুট পরিয়া একটু আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইমান্থল হঠাৎ কোটপ্যাণ্ট পরিল কেন? এই রকম একটা দিনে কি ওর বেশি করিয়া মনে পড়িয়া যায় যে ও লাট-সাহেবের সমধর্মী? ·· সেই দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়—"এই যে, আপনারা এখানে? নমস্কার"—বলিয়া একটি যুবক আমাদের দলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন,—"এই যে নিশীথ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

নিশীথের পরনে নিখুঁত কায়দামাফিক ইভনিং-স্যুট, বাঁ-হাতে হরিণের শিঙের মুঠি লাগানো একটি চেরির ছড়ি, ডান হাতে একটা পাইপ। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, বয়স সাতাশ-আঠাশ আন্দাজ হইবে।

নিশীথ পাইপে একটা টান দিল, তাহার পর বাঁ হাতের ছড়িটার উপর একটু চাপ দিয়া সেটাকে ধনুকাকার করিয়া বলিল, "আমার আসতে একটু দেরিই হ'য়ে গেছল। প্রথমতঃ কর্নেল ব্রেটের ছেলে গ্লাসগো থেকে লাস্ট মেলে ফিরেছে খবর পেলাম, একটু সন্ধানটন্ধান নিতে গেছলাম। আমরা ক-জনে ওদিকে ঐ টেবিলটাতে বসে আছি; আপনাদের পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে, আমার ওপর। চলুন।"

বলিয়া নিজের রসিকতায় সাহেবী ধরণের হাস্য করিয়া পাইপে আর একটা টান দিল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আমার একটু ঘোরাফেরা দরকার, অন্তত যতক্ষণ পারি। তুমি এঁদের নিয়ে যাও বরং।···ইনি হচ্ছেন তরুর টিউটর, নাম শৈলেন মুখোপাধ্যায়; আর এ আমাদের নিশীথ, শৈলেন; তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে এর সম্বন্ধে।"

অল্প অল্প শুনিয়াছি, দু-একবার দেখিয়াছিও, পরিচয় হয় নাই। একটা আবছা উত্তর দিলাম, "ও, ইনিই?"

নমস্কার করিলাম। নিশীথ আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া পাইপটা একটু কপালের কাছে তুলিয়া দিয়া একটা দায়েঠেকাগোছের প্রতিনমস্কার করিল, তাহার পর কালক্ষেপ না করিয়া মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনারা চলুন মিস রায়, সরমা দেবী আসুন।

আমার প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ করিতে যে অভদ্রতাটা জাহির করিল সেটা অন্ততঃ অপর্ণা দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস শৈলেন, আরও

কয়েক জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

মীরা একটু আবদারের সুরে বলিল, "না মা, ওঁকে আমাদের সঙ্গে আসতে দাও।"

নিশীথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "হ্যাঁ, সেই বেশ হবে, আসুন আপনিও।"

আমি একটু বিমূঢ়ভাবে অপর্ণা দেবীর পানে চাহিলাম। অপর্ণা দেবী হাসিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিলেন, "কি করবে?"

তাহার পর সমস্যাটা আমার পক্ষে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া সেইরূপ ভাবেই আসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে যাও ওদের সঙ্গেই, আমি এক্ষুণি ওপরে চলে গেলে তুমি আবার একলা পড়ে যাবে। ...সরমাকে ছাড়বে না।"

মীরা সরমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না—তোমার ঐ মিসিস সেন আসছেন।"

নিশীথ অযথাই মীরাকে সমর্থন করিয়া বলিল, "বাঃ, ওঁকে কি ক'রে ছাড়ব আমরা!"

অপর্ণা দেবী একবার মুগ্ধ নয়নে সরমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এক্ষুণি যেন পালিও না সরমা, আর যাবার আগে নিশ্চয় একবার আমার সঙ্গে ওপরের ঘরে দেখা ক'রে যেও; নিশ্চয়। আমি বোধ হয় আর বেশিক্ষণ নীচে থাকতে পারব না।"

মীরা যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, "পালানো সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেক।

নিশীথও ঘুরিয়া, দাঁতে পাইপ চাপিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "পালানো শক্ত আমাদের কাছ থেকে, সেদিকে আপনার কোন চিন্তা নেই।"

বোধ হয় ভাবিল এ রসিকতাটুকু একেবারে চরম-গোছের হইয়াছে; ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সাহেবী কায়দায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

১৪

আমি টানা পড়িলাম বটে কিন্তু আমার যেন পা-উঠিতেছিল না। বাড়িতে আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি হইলেও তরুর সঙ্গে এর পূর্বে বার-দুয়েক বাইরে পার্টিতে গিয়াছি এবং দুইবারে যা অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আরও দুইবার যাওয়ার যখন প্রয়োজন হইল তখন ছুতানাতা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার কারণ এই পার্টিতে আমার এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অসামঞ্জস্যটা যতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত, অন্য কোন ব্যাপারেই ততটা হইত না। এধরনের পার্টিগুলা আসলে দেখিলাম স্বয়ংবর সভা, একেবারে মুখ্যতঃ না হেকে নিতান্ত গৌণতঃও নয়। মীরা, শচী, মিস্টার মল্লিকের কন্যা দীপ্তি, রেবা—আরও কত সব তাহাদের নাম জানি না —ইহাদের কেন্দ্র করিয়া ভাগ্যান্বেষীরা কথাবার্তা, আধুনিকতম ফ্যাশন, মাঝে মাঝে

বোধ হয় উপলক্ষ্যে-অনুপলক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে অবিরাম নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া যাইতেছে। মীরাকে যাহারা আগলাইয়া থাকে তাঁহাদের মধ্যে আছে নীরেশ লাহিড়ী, বি-এ, ক্যাণ্টাব, নবীন ব্যারিস্টার; জার্মানী-প্রত্যাগত মৃগাঙ্ক সোম, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার; শোভন রায়, কি তাহা এখনও খোঁজ লইয়া উঠিতে পারি নাই; অলোক সেন, কলেজের ছাত্র; আর এই নিশীথ চৌধুরী। এই লোকটি রাজসাহী প্রান্তের কোন এক রাজার ভাগনে। বিদ্যাবুদ্ধি কতটা আছে বলা যায় না, তবে যে-সমাজে চলাফেরা করে, কিংবা মীরাকে লইয়া যাহাদের সঙ্গে রেষারেষি তাহাদের সঙ্গে মানানসই হইবার জন্য আমেরিকা হইতে কিছু টাকা দিয়া গোটাছয়েক অক্ষর আনাইয়া লইয়াছে এবং শীঘ্রই নাকি 'হায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং' পড়িবার জন্য গ্লাসগো রওনা হইবে। মোটের উপর বিদ্যা, প্রতিপত্তি, অর্থ, সাজানো কথা এবং অঙ্গের সাজগোজ লইয়া ঈর্ষা-অভিনয়ের মধ্যে এখানে যে বায়ুমণ্ডল সৃষ্ট হয়, এক ধুতি-চাদর-পরিহিত গৃহশিক্ষকের সেখানে স্থান নাই। আমি সেটা অনুভব করিয়াছি; বলিয়াই তুইবার কাটান্ দিয়াছি, পার্টিতে যাই নাই। এবার একেবারে নিজেদের বাড়িতে—উপায় ছিল না, তবু আশা ছিল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইয়া দিব, কিন্তু পাকেচক্রে ধরা পড়িয়া গেলাম।

আজ আবার বিশেষভাবে আমি এড়াইতে চাহিতেছিলাম, তাহার কারণ সরমা-ঘটিত ব্যাপারটুকুর পর থেকেই মীরার হঠাৎ পরিবর্তন। মীরার চরিত্রের এইদিকটাকে আমি একটু ভয় করি। এই কয়দিন হতে মীরা কর্মচাঞ্চল্যের অনবধানতায় অল্প অল্প করিয়া আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওর এই খুবই কাছে আসাটাকে আমি যেমন প্রার্থনা করি, তেমনি আবার সন্দেহের চক্ষেও দেখি,—লক্ষ্য করিয়াছি মীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যখন খুব কাছে আসিয়া পড়ে তাহার পর হইতে অতি সামান্য একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া—কখন বা উপলক্ষ্য না থাকিলেও—ঝপ করিয়া দূরে সরিয়া যায়। এই সময় জাগে তাহার সেই নাসিকার কুঞ্চন। আমাদের তু-জনের দূরত্বটা—যাহা মীরাই মিটাইয়া আনে—আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে।

নিশীথের পিছনে পিছনে চলিলাম। মীরা আলাপ-জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যাইতেছে, নিশীথ কয়েক জনকে তাহার 'হায়ার এঞ্জিনীয়ারিং'-এর জন্য গ্লাসগো যাত্রার কথা বলিল; আমরা বাগানের শেষের দিকটায় গিয়া পড়িলাম। তিনখানি টেবিল একসঙ্গে করা, তাহার চারদিকে খান-আষ্টেক চেয়ার। দেখিলাম নীরেশ, মৃগাঙ্ক প্রভৃতি মীরা-কেন্দ্রিকদের প্রায় সকলেই রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিবার পূর্বেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, অভ্যর্থনায় একটা কাড়াকাড়ি পড়িল। নীরেশের বাম চোখে ফিতাবাঁধা একটা মনক্ল্ চশমা আঁটা; সেটা খুলিয়া ধীরে ধীরে মুছিতে মুছিতে মীরার পানে

তাহিয়া বলিল, "আমরা এখানে খান-তিনেক টেব্‌ল্‌ একত্র ক'রে বেশ জমিয়ে বসব স্থির করলাম ; কিন্তু কোন মতেই জমছে না দেখে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই হয়নি। যা মৃত তা জমাট বাঁধতে পারে, কিন্তু জমে না। অবশ্য আপনি ঘুরতে ঘুরতে একবার না-একবার আসতেনই দয়া ক'রে, কিন্তু সেই অনিশ্চিত 'একবারে'র জন্য ধৈর্য ধরে বসে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠল বলে আপনাকে কাজের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে আমরা মিস্টার চৌধুরীকে পাঠালাম। এখন কি কি ক'রে যে মার্জনা চাইব বুঝতে পারছি না।"

বিলাতী কায়দায় 'হিয়ার হিয়ার' বলিয়া একটা সমর্থন হইল, কিন্তু বেশ বোঝা গেল কথাটা যেন সবার কণ্ঠে একটু বেশ আটকাইয়া বাহির হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নিশীথের,—তাহার আপশোষ বোধ হয় এই জন্যে যে তাহাকে খুঁজিয়া-পাতিয়া আনিবার ভার দিয়া ইহারা দিব্য ততক্ষণ বসিয়া রুচিকর ভাষা গড়িয়াছে। তাহার মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে সে ভব্য রকম একটা কিছু বলিবার জন্য ভিতর ভিতরে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরের কথার প্রতিধ্বনি করা ভিন্ন অন্য শক্তি না থাকায় পারিয়া উঠিতেছে না।

দুইটা চেয়ার কম ছিল বলিয়া আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, একজন ওয়েটার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাতিয়া দিল।

চেয়ারে বসিতে বসিতে মীরা হাসিয়া বলিল, "এদিকে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনারা ধন্যবাদের কাজ ক'রে উল্টে কেন মার্জনা চাইছেন।"

কথাটার অর্থ ধরিতে না পারিয়া সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে মীরার মুখের দিকে চাহিল। মীরা বলিল, তা নয় তো কি বলুন ?—ওদিকে থাকলে কিছুই যে কাজ করছি না সে হাতে-হাতে ধরা পড়ে যেত ; আপনাদের এই অনুগ্রহ ক'রে ডেকে নেওয়ায় বরং সবার মনে একটা ধারণা থেকে যাবে—বেচারিকে ওরা ডেকে নিলে তাই, নইলে মীরা যদি এদিকে থাকত, কাজ কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিত।"

কথাটাতে, বিশেষ করিয়া চোখ পাকাইয়া ঈষৎ মাথা দুলাইয়া বলিবার ভঙ্গিতে, সবাই হাসিয়া উঠিল।

ওয়েটার ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া চা-য়ের সরঞ্জাম লইয়া সামনে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল "চা আর লাগবে কারুর ?"

নিশীথ একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেল, বলিল, "না, চা একবার হয়ে গেছে।" তাহার পর একটা জুতসই কথা বলিতে পারিবার আনন্দে সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "এই দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চা-কে প্রবেশ করতে দিতে মন সরে না ; তাহ'লে এত যে মার্জনা চাওয়া চাওয়ির

ব্যাপার, আমরা নিজেদেরই মার্জনা করতে পারব না।"

মীরা একটু বিব্রতভাবে নিশীথের দিকে চাহিয়া ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিয়া প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মৃগাঙ্ক বলিল, আমার মত কিন্তু অন্য রকম, অবশ্য সেটা বলতে গেলে আগে মীরা দেবীর কাছ থেকে অভয় পাওয়া দরকার।"

মীরা লজ্জিতভাবে চক্ষু তুলিয়া বলিল, "আমার অভয় দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি? কই, এ-সম্পদের কথা তো জানতাম না!"

মৃগাঙ্ক উত্তর করিল, "জানেন না বলেই তো পাবার আশা করি। ধরুন, ফুলের গন্ধ আছে জানলে সে কি আর পাপড়ি খুলে সেটা ধরে বিলোতে পারত?"

সকলে আবার একটু মলিন হাসির সঙ্গে অনুমোদন করিল। ধোঁয়ার আড়ালে নিশীথের হাসিটা যে কত মলিন সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

মীরা আবার লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল, "বেশ, তা'হলে আপনার কথামতই তো আমার না দেওয়ারই কথা অভয়,—ফুলকে যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তার গন্ধ-সম্পদের কথা, কেনই বা বিলোতে যাবে?"

এ-সমস্যায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল—উত্তর আমার ঠোঁটে আসিয়াছে; কিন্তু এ-পরিবেষ্টনীতে আমার মুখ খোলা উচিত কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পরিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশের ইচ্ছাই জয়ী হইল; বলিলাম, "কৃপণ বলে বদনাম হওয়ার আশঙ্কা আছে তো?"

সকলে একটু চকিত হইযা আমার মুখের পানে চাহিল। উত্তরটা ওদের পক্ষেরই, কিন্তু নবাগতের হঠাৎ প্রবেশটা উহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিল। তবুও সমর্থন না করিয়া উপায় ছিল না, কাষ্ঠহাসির সহিত সবাই জড়াজড়ি করিয়া বলিল, "ঠিক, ঠিক বলেছেন উনি, বাঃ, কৃপণ হওয়ার একটা আশঙ্কা আছে তো?"

মীরা একেবারে বিজয়ের হাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল, চমৎকার! যে পরকে অভয় দেবে তার নিজেরই আশঙ্কা!"

সকলে আবার একচোট থ' হইয়া গেল, কিন্তু উহারই মধ্যে খুশিও হইয়াছে, কেননা মীরা এই উত্তরটা আমায়ই দিয়াছে মুখ্যত। আমি প্রত্যুত্তর দিতে আরও খানিকটা সময় নিলাম, বুদ্ধির দৌড়ের পরীক্ষাও হইয়া যাক না একটু। নীরবতা কাটে না দেখিয়া অবশেষে বলিলাম, "কিন্তু এ আশঙ্কা যে অভয়েরই উল্টা দিক। তার কৃপণ হওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই তো অভয়ের জন্য তার কাছে হাত পাততে যাই, যাচকের তো দাতার কাছে জোরই এইখানে। আর এই আশঙ্কা আছে বলেই তো দাতা ও মহৎ।"

সকলে আবার স্খলিত কণ্ঠে যোগ দিল, "বা ঠিকই তো...জোরই তো ঐখানে...আপনাকে কৃপণ বলা হবে—নেই এ-ভয়টা আপনার?"

মৃগাঙ্ক এই জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আলাদা করিয়া বলিল, "জোর বইকি, দিন অভয় এবার।"

মীরার স্তবের নেশা আসিয়া গিয়াছিল, স্তাবকের কাছে হারিয়াই তো আনন্দ ; কি একটা মুগ্ধ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার পানে চকিতে চাহিল যেন বরমাল্যটা আমাকেই তুলিয়া দিল সে। মীরা সাধারণভাবে খোশামোদ ঘৃণা করে। এখানে সে সব নারী হইতেই স্বতন্ত্র, সে বিশিষ্টা। মনে পড়ে প্রথম দিন যখন আমি টুইশ্যনির জন্য তাহার সহিত দেখা করি, কি একটা কথায় আমার মুখে খোশামোদের ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই মীরাই আবার স্বয়ংবর-সভায় সব নারীর সঙ্গে এক হইয়া যায়, পুষ্পবৃষ্টি হইলে সঞ্চয়ের জন্য আঁচল বাড়াইয়া ধরে। এখানে সে সাধারণ।··· একটু অনুযোগের সুরে হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এসে আপনি ঐদিকে হয়ে গেলেন ? This is not fair" (এটা ন্যায়সঙ্গত হলো না)।

তাহার পর মৃগাঙ্কর পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা বলুন, আপনার মতটা কি ?

লজ্জিত ভাবে ঘাড় কাত করিয়া হাসিয়া বলিল, "না হয় দেওয়াই গেল অভয়।"

ব্যাপার ততক্ষণে অন্য রকম দাঁড়াইয়া গেছে ;—আমার ওকালতিতে জিতিয়া স্বয়ংবর-সভায় সকলের মনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে অভয় যখন পাওয়া গেল তখন কি জন্য যে অভয় চাওয়া সেটা বিলকুলই ভুলিয়া বসিয়াছে। ওয়েটারও চা-য়ের সরঞ্জাম লইয়া চলিয়া যাওয়ায় মনে পড়িবার সম্ভাবনা আরও কম। মৃগাঙ্ক ব্যাকুলভাবে হাতড়াইতেছিল, আমি বলিলাম, "নিশীথবাবু দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চা-য়ের প্রবেশ পছন্দ করছিলেন না, আপনি বললেন আপনার মত এই যে—"

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ও ইয়েস্, থ্যাংক ইউ, ঠিক, আমি বলছিলাম চা একবার হয়ে গেছে বটে কিন্তু লোভ বলে আমাদের একটা প্রবল রিপু আছে—যদি মীরা দেবীর ক্লেশ না হয় তো চা যদি আর একবার ওঁর হাতের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তো সেটাকে অনধিকার-প্রবেশ না বলে বরং···"

সকলে উল্লাসিতভাবে সমর্থন করিয়া কথাটা আর শেষ হইতে দিল না। ওদের পক্ষে জয়যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিশীথ পর্যন্ত নিজের পরাজয়ের কথা ভুলিয়া অকুণ্ঠভাবেই যোগদান করিল। ওয়েটারটা ততক্ষণে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে, উৎসাহিত ভাবে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পাকড়াও ক'রে আনছি। চা পান না করিয়ে ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি ?"

প্রতিধ্বনির জন্য ওর কণ্ঠ চুলকাইয়া উঠিয়াছে। এই আগেই দেওয়া নিজের অভিমতটা চা-কে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার কথাটা—আর কি মনে থাকিতে পারে ?

১৫

আগেই বলিয়াছি আমার এ একটা দুরদৃষ্ট—অভিশাপই আছে জীবনে—মীরার যখন খুব কাছটিতে আসিয়া পড়িব, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতে হইবে। এবারে মীরার ততটা দোষ ছিল না, সরমার প্রশংসায় সে অবশ্য চটিয়া ছিল, কিন্তু, সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে স্তুতির মাদকতায় ভরপুর, তাহার চিত্তে দাক্ষিণ্যের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট, ঘটনার চক্রান্তে ব্যাপারটা আবার অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইল।

সুরু থেকেই একটা কথা আমার বড় বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। মাঝে নিজেই তর্কের ঝোঁকে পড়িয়া একটু বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আবার সেটার দিকে দৃষ্টি গেল। লক্ষ্য করিতেছি সরমাও যে আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিয়াছে সেদিকে কাহারও বিশেষ হুঁশ নাই। সব যেন মীরাকে ঘেরিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সরমাকেও সবাই সমুচিতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছে, এক-আধটা প্রশ্নাদিও করিয়াছে মাঝে মাঝে, আর ব্যাপার যাহা হইতেছে তাহা হইতে সে যে একেবারে বাদ পড়িতেছে এমন নয়, হাসিবার সময় সেও হাসিতেছে, এক-আধটা অভিমতও দিয়া থাকিবে—শান্তভাবে যেমন হাসা, যেমন কথা বলা তাহার স্বভাব; কিন্তু একটা ত্রুটি হইয়াই গিয়াছে তাহাদের তরফ হইতে। স্তব, প্রশংসা বা ইংরেজীতে যাহাকে বলে কমপ্লিমেণ্ট, মীরার ঘাড়ে জড় করিতে সবাই এত উন্মত্ত যে এই সভাতেই যে আরও একটি মহিলা বসিয়া আছেন সেদিকে খেলায়ই নাই কাহারও। ইহারা ইংরেজদের নকল করিতে যায়, কিন্তু সমাঞ্জস্য রক্ষা করিবে এমন সাধারণ বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত ঘটে রাখে না। বিশেষ করিয়া পাশেই একজন লেডিকে যথাস্থানে ছাড়িয়া দিয়া আর একজনকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবে, ওরা যে-সভ্যজগতের নকল করিতেছে তথাকার নিতান্ত অসভ্যরাও এ-কথা ভাবিতে পারে না!···আমি সরমার পানে খুব সন্তর্পণে এক-আধবার চাহিয়া লইয়াছি, বুঝিয়াছি এর দাগ পড়ে নাই ওর মনে। ওর মনের কোথায় যেন একটা বেদনার উৎস আছে। যোগী যেমন নিজের মূর্ধার অমৃতরসে জিহ্বাগ্র সংলগ্ন করিয়া ধ্যানস্থ থাকে, সরমারও যেন কতকটা সেই রকম ভাব, সেও যেন সেই দুঃখের অমৃতরসে জিহ্বা দিয়া আত্মস্থ। বাহিরে ও হাসে, কথা কয়; একটা প্রসন্নতার আবরণও আছে ওর সব জিনিসের উপর; কিন্তু তাহার সঙ্গে ওর ভিতরের যোগ নাই।

হইতে পারে সবাই ওর ঔদাসীন্য জানে বলিয়াই ওকে একান্তেই থাকিতে দেয়, কিন্তু তবুও ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশদৃশ, প্রায় একটা দুষ্কৃতির কাছাকাছি; আমি তো হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম।

পাকড়াও করিয়া অনিবার নিশীথের একটা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা আছে স্বীকার

করিতে হইবে, শুধু চা-য়ের সরঞ্জাম ঘাড়ে ওয়েটারকে পাকড়াও করিয়া আনিল না, আরও আনিল শোভনকে আর দীপ্তিকে। শোভনের বাহুটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, "দীপ্তি আর শোভনকেও ধরে আনলাম, দু-জনকে দু-জায়গা থেকে।"

প্রকাণ্ড একটা বীর সে!

মীরা চা ঢালিতে সুরু করিয়া দিল। চমৎকার দেখাইতেছিল মীরাকে। উঠিয়া সামনে ঝুঁকিয়া চা ঢালিতেছে, একগুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল কপাল হইতে স্খলিত হইয়া নতশীর্ষ লতার তন্তুর মত মুখের উপর দুলদুল করিতেছে, কানের ঝুমকা দুইটা সামনে গড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাদের মুক্তর ঝুরিগুলা গালের উপর পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে! সকলেরই কথা একটু বন্ধ, শুধু লুব্ধভাবে একের পর এক করিয়া মীরার সামনে পেয়ালা বাড়াইয়া দিতেছে; মীরা যেন ক্রমেই পরিবর্ধমান লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছে; কেহ যে কথা কহিতেছে না, সেইজন্য ও নিশ্চয় অনুভব করিতেছে, ওকে সবাই দেখিতেছে বলিয়া কথা কহিতেছে না। মীরার যে-সমাজে স্থিতি-গতি সেখানে মেয়েরা নিজেদের প্রত্যেক ভঙ্গিটির সম্বন্ধেই সচেতন;—মীরা জানে তাহার ঈষন্নত দেহযষ্টি, তাহার কপালের আলগা কুন্তল-গুচ্ছ, তাহার কানের লুটান ঝুমকা চারিদিকে একটা শান্ত বিপর্যয় ঘটাইতেছে, এ-সবের উপর তাহার আরক্তিম লজ্জাটি সম্বন্ধেও সে সচেতন, তাহাতেই তাহার লজ্জা আরও বেশি।...আমি যথাসাধ্য সংযত ছিলাম, তবু নিজের দৃষ্টি বলিয়াই অযথা তাহার সাধুতার বড়াই করিতে পারি না। দৃষ্টির দোষ ছিল না, আজ খোশা-মোদের অর্ঘ্য দেওয়ার পর মীরার কাছে দৃষ্টি আমার প্রশ্রয়ই পাইয়াছে।

দীপ্তি একটু দূরে, ওদিকটায় কোন একজনের সঙ্গে কি কথা কহিতে গিয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরার চেয়ে দীপ্তি বছর-চারেকের ছোট, একটু বেশি চটুল, মাথার দুইপাশে দুইটি বেণী, চলে শরীরটা একটু সামনে ঝুঁকাইয়া আর দুলাইয়া—সর্বসমেত বেশ একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। কথা বলিবার ভঙ্গি খুব জোরাল,—কতটা সত্য বলিল, কতটা মিথ্যা বলিল ভ্রূক্ষেপ করে না, শ্রোতাদের উপর দাগ বসিল কিনা সেইটিই তাহার লক্ষ্য। আসিয়াই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটাকে যেন একটু টানিয়া তুলিয়া মুখের উপর হাত দুইটা জড় করিয়া বলিল, "ওমা! তুমি এখানে মীরাদি? অথচ তখন থেকে তোমায় এত খুঁজছি যে রীতিমত সাধনা বললেও চলে।...সরমাদিও দেখছি যে! বাঁচলাম, কে যেন বলছিল আপনার শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না! এত ভাবনা হয়েছিল! মনে হ'ল সব ফেলে ছুটে যাই, একবার দেখে আসি।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "না এলেই হ'ত ভাল; কিন্তু শরীরের দোহাই তো মীরার কাছে চলবে না, ভাই...।"

নীরেশ আবার কি একটা লাগসই কথা ভাবিতেছিল, জোগাড় হওয়ায় সরমাকে

শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "মীরা দেবীকে পেতে হ'লে তো সাধনারই দরকার মিস মল্লিক ; আমাদের সাধনাটা একটু বেশি ছিল, সেই জন্যেই··· ।"

বোধ হয় অজ্ঞানকৃত, অথবা নিছক মূঢ়তা, তবুও নীরেশের অভদ্রতাটা আমার সহ্য হইল না—অর্থাৎ এই সরমার কথাটা শেষ করিতে না দিয়া নিজের মন্তব্য আনিয়া ফেলা। নীরেশের কথাটাও শেষ হইবার পূর্বেই সেটা যেন চাপা দিয়াই সরমাকে প্রশ্ন করিলাম, "হ্যাঁ, তাই বলে কি বলতে যাচ্ছিলেন সরমা দেবী ? বোধ হয় মীরা দেবীর জন্যেই এসেছেন, কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা সেজন্যে কিছু কম হবে না ।"

মীরা আমার কাপে চা ঢালিতেছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ তুলিল। খানিকটা চা টেবিলের ঢাকনার উপর পড়িয়া গেল। মীরা তখনই আবার সমস্ত ব্যাপারটা সামলাইয়া লইল। চা-টা পড়িয়া যাওয়ার অজুহাতে তাহার তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "এক্সকিউজ মি, মাফ করবেন ।"

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক কথাবার্তা হইল। কথাবার্তাটা একটু বেশি উদ্যোগী হইয়া চালাইল মীরাই। যখন বুঝিল সরমা-সম্পর্কীয় ব্যাপারটা তাবৎকালের জন্য আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, বা যাওয়া সম্ভব, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই সাহিত্যের কথা তুলিল, ওদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাঝখানে আপনারা সাহিত্য-চর্চার জন্যে একটা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান তৈরি করবেন বলে বসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু, কি হ'ল তার ?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "তারও উৎস তো আপনারাই। দেখলাম দু-চার দিন কথার পর আপনার উৎসাহই নিভে এল···"

কেন যে নিভিয়া আসিয়াছিল তাহা এদের রসজ্ঞানের যেটুকু নমুনা দেখিলাম তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। মীরা বলিল, "না, ঠিক নেভেনি ; বাবা কুমিল্লায় চলে যেতে প'ড়ে গেলাম একলা, মা'র শরীর খারাপ, নানা ঝঞ্ঝাটে আর ওদিকে মন দিতে পারিনি। আপনাদের সঙ্কল্প যদি আবার রিভাইভ্ করেন তো খুব একজন উপযুক্ত লোক পেতে পারি আমরা। আমাদের শৈলেনবাবু একজন উদীয়মান কবি এবং সাহিত্যিক,—আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই এঁর···"

যে যেমনটি ছিল একেবারে চিত্রার্পিতের মত স্থিরদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কাহারও পেয়ালা ঠোঁটের কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, কাহারও টেবিলের কাছাকাছি নামিয়া ; কেহ একটা চুমুক টানিয়াছে, না গিলিয়া গলা ফুলাইয়া চাহিয়া আছে, কেহ ঠোঁটে পেয়ালা ঠেকাইয়া বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আমায় দেখিতেছে,—একটু একটু করিয়া পেয়ালার গা গড়াইয়া টেবিল-ক্লথের উপর চা পড়িতেছে, আশ্চর্যের অভিনয়ে বাধা পড়িবে বলিয়া সেদিকে আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে যেন সম্বিত পাইয়া কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, "ইনিই

"আমাদের শৈলেনবাবু ?"

নগণ্যতা থেকে একেবারে খ্যাতির শিখরে উঠিয়া গেলাম। বাস্তবের তবু খ্যাতিহীনতা আর খ্যাতির মাঝখানে একটা রাত্রির ব্যবধান ছিল, আমার বোধ হয় একটা মুহূর্ত'ও নয়। উদীয়মান' সাহিত্যিক'কে অভিনন্দিত করিবার জন্য একেবারে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল যেন। অলোক বলিল, "বর্ণচোরা আম মশাই আপনি, হু কুড থিংক্ যে আপনিই আমাদের শৈলেনবাবু···নাউ ! প্লীজ ·· "

শেক্‌হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। লজ্জিতভাবে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া হাতটা টানিয়া লইব, মৃগাঙ্ক হাত বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, বাঃ আমাদের হাতে সাহিত্য বেরোয় না বলে অস্পৃশ্য নাকি ? হাঃ হা হা—"

নীরেশ একটু দূরে ছিল, টেবিলের ও-প্রান্তে ; আগাইয়া আসিয়া হাতে একটা কড়া ঝাঁকুনি দিয়া হাতটা মুষ্টিবদ্ধ রাখিয়াই মীরার পানে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে কোনমতেই ক্ষমা করতে পারব না মিস রায়, এ-হেন লোককে এতদিন আমাদের কাছে অপরিচিত রাখবার জন্যে।"

শেক্‌হ্যাণ্ডের সঙ্গে একটা মানানসই কথা বলাও দরকার। সেটা সংগ্রহ না হওয়ায় নিশীথ এতক্ষণ হাত বাড়ায় নাই, এইবার নীরেশের কাছ থেকে হাতটা প্রায় ছিনাইয়া লইয়াই খানিকটা মৃগাঙ্কের কথা, খানিকটা নীরেশের কথা একত্র করিয়া বলিল, "আসুন, হাত মিলিয়ে নেওয়া যাক, এইবার থেকে এই কাঠখোট্টা হাত দিয়েও কবিতা বেরুবে ফরফরিয়ে।···সত্যি মিস্ রায়, আপনাকে আমরা ক্ষমা করতে পারব না, কখনও না, নেভার..."

মীরা হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আমায়ই কি উনি বলেছেন নাকি কখনও ? আমি নিজে আবিষ্কার করলাম 'কল্লোলে' ওঁর একটা লেখা দেখে।"

নীরেশ নিজের সীটে না বসিয়া আরও এদিকে দীপ্তির চেয়ারের পাশটাতে দাঁড়াইল তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি শৈলেনবাবুর লেখা পড়েননি মিস্ মল্লিক ?"

বেশ বুঝিলাম দীপ্তি একটু ফাঁপরে পড়িয়াছে। ও যেন ভয়ে ভয়েই ছিল এই রকম গোছের একটা প্রশ্ন এদের মধ্যে কেউ না কেউ করিয়া বসিল বলিয়া ! অপরাধীর মত কুণ্ঠিত ভাবে একটা বগ টিপিয়া বলিল, "ঠিক মনে হচ্ছে না, তবে নিশ্চয় পড়ে থাকব।"

"নিশ্চয় পড়েছেন,—শৈলেন—শৈলেন।"

মীরা সাহায্য করিল, "শৈলেন মুখার্জি।"

তর্জনী দিয়া বিলাতী কায়দায় তিনবার কপালে টোকা মারিয়া নীরেশ বলিল, "ডিয়ার মি ! পদবীটা পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। ঠিক, শৈলেন মুখার্জি-

শৈলেন মুখার্জি। ওঁর লেখা তো প্রায়ই চোখে পড়ে, এই সেদিন তো 'প্রবাসী'তে একটা চমৎকার কবিতা পড়লাম···।

যে-সময়ের কথা, তখন 'প্রবাসী' আমার স্বপ্নেরও অতীত। তাহার মাস আষ্টেক পূর্বে আমার দুইটি কবিতা 'অঞ্জলী' নামক একটি মাসিকে উপরি-উপরি দুইবার প্রকাশিত হয়, তৃতীয় মাসে কাগজটি উঠিয়া যায়, বোধ হয় সে গুরুপাপেই। তাহার পর 'মানসী' ও 'কল্লোলে' গুটি দু'য়েক গল্প বাহির হইয়াছে। ··এই অল্প পুঁজির উপর এ রকম রাশীকৃত যশের চাপে আমি গলদঘর্ম হইয়া উঠিতেছিলাম।

মীরা বোধ হয় বিশ্বাস করিল 'প্রবাসী'-ঘটিত কথাটা, একটু অভিমানের স্বরে বলিল, "বাঃ, কই, আমায় তো বলেননি শৈলেনবাবু?"

যশের মোহ অথচ তাহার মিথ্যার গ্লানি,—আমি আমতা-আমতা করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নিশীথ প্রতিধ্বনি তুলিল, "কেন, আমিও তো সেদিন ইয়েতে ওঁর একটা প্রবন্ধ পড়লাম; আমাদের মধ্যে কত ডিসকাশন্ হয়ে গেল সেই নিয়ে। কি আর্টিক্‌লটার নাম মিস্টার মুখার্জি?

যেমন অসহ্য, স্বীকার করিয়া লইলে তেমনি বিপজ্জনক। আমি বিনীতকণ্ঠে নিবেদন করিলাম, "কই আর্টিক্‌ল্ তো আমি লিখিনি কোথাও!"

নিশীথ চা-য়ের পেয়ালাটা নামাইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, টেবিলে একটা ঘুঁষি মারিয়া বলিল, "লিখেছেন; আমি নিজে পড়েছি, এখানে 'না' বললে শুনব? আত্মগোপন করা তো স্বভাব আপনাদের সাহিত্যিকদের।"

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! আমি নিরুপায় লজ্জার সহিত কথাটা মানিয়া লইয়া বিনয়োচিত মৃদুহাস্য করিতে লাগিলাম।

উদ্ধার করিল শোভন। লোকটা ক্রমাগত চুরুট টানিতে টানিতে সামনের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, কথা কয় কম। তবে যেটুকু বলে তাহাতে স্পষ্টতার ছাপ থাকে। আমার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্য হইতে ঐ একটি লোক নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে এখন পর্যন্ত। এদের অভিমতে শোভন একটু দেমাকী।

চুরুট টানার ফাঁকে ফাঁকে বলিল, "মিস্টার মুখার্জিকে পাওয়া তো আমাদের খুবই সৌভাগ্য, তোমার আর্টিকেলের কথাও তো উনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন, নিশীথ, কি করা হবে তোমাদের ওঁকে নিয়ে সেটার একটা ঠিক করে ফেল।"

"করা—মানে···" নিশীথ মীরার পানে চাহিল, অর্থাৎ কী সে মূল প্রস্তাব যাহার প্রতিধ্বনি সে করিবে?

মীরা টেবিলের উপর আঙুলগুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিল, "আমি

বলছিলাম শৈলেনবাবুকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের একটা সাহিত্যবাসর গড়ে তুললে কেমন হয়?…তুমি কি বল সরমাদি?"

সরমা বলিল, "খুবই ভাল হয় তো; খাঁটি একজন সাহিত্যিককে পাওয়া …"

সবমার কথাব দাম অন্য রকম; আমি প্রকৃতই লজ্জিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

নীরেশ বলিল, "তাহ'লে ওঁকে কেন্দ্র করার মানে…"

মৃগাঙ্ক সমর্থনের জন্য মীরার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কেন্দ্র করা মানে মীরা দেবী মীন করছেন সভাপতি আর কি।"

মীরা বলিল, "ওই তো ওঁর প্রকৃষ্ট আসন। আজ এখান থেকেই আমাদের সভা প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়া যাক না কেন—শৈলেনবাবুর সভাপতিত্বে। আমি প্রস্তাব করছি"…

'হিয়ার হিয়ার!' বলিয়া সকলে সমর্থন করিতে গিয়া হঠাৎ মীরার পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। মীরা উদ্বিগ্নভাবে সোজা হইয়া বলিল, "কিন্তু কি ক'রে হবে? ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল!…আপনার তরু কোথায় মাস্টারমশাই? আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে বসে আছি। তার বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যে নিতান্ত দরকার। ডাক্তার বোস বিশেষ ক'বে বলে রেখেছেন। আপনাকে তো সে-কথা বলেওছি মাস্টারমশাই, দেখছি আজকের গোলমালে আপনিও ভুলে বসে আছেন। ·মাস্টারমশাইকে আমরা সবাই পার্টিতে খুবই মিস্ করব কিন্তু ওঁর যা আসল কাজ‥ "

মীরা যেন নিরুপায়ভাবে একবার সবার পানে চাহিল। এক মুহূর্তে সবার মূর্তি বদলাইয়া গেল। আবার চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠল—"ও ইয়েস্, মিস্ করব বইকি, কিন্তু ডিউটি ইজ্ ডিউটি‥ আচ্ছা, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আবার আলাপ হবে এ-বিষয়ে…সাহিত্য-চর্চার সময় তো আর চলে যাচ্ছে না, কিন্তু কর্তব্য তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না…শি ইজ্ এ স্টার্ন মিসট্রেস" (কর্তব্য বড় কড়া মনিব)।

কে একজন ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের একটা কবিতা থেকে উদ্ধার করিয়া বলিল, "স্টার্ন ডটার অব্ দি ভয়েস্ অব্ গড" (**Stern daughter of the voice of God**)

শিখর হইতে পতন যে কি তা সেই দিন বুঝি। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার সময় যেন স্বপ্নে তাড়া খাওয়ার মত পা মুড়িয়া যাইতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও মুখের পানে দৃষ্টি যায় নাই, গিয়াছিল শুধু একবার সরমার মুখের দিকে, সত্য এবং শিষ্টতা আহত হইল কিনা দেখিবার কৌতূহলে।

সে আরক্তিম মুখে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া ছিল।

আমার ডায়েরির সেই দিনের পাতায় মাত্র দুইটি কথা লেখা আছে,—"সাবাস মীরা!" কেন লিখিয়াছিলাম মনে আছে—

মীরা নিপুণ শিল্পী, যাহা ফুটাইতে চাহিতেছে তাহা কিসে ফুটিবে, অর্থাৎ যাহাকে শিল্পীর সেন্স্ অব্ এফেক্ট বলে মীরার সেটা পূর্ণ আয়ত্তে। পার্টিতে সরমার আসিবার পর হইতে, বিশেষ করিয়া আমি তাহাকে প্রশংসা করিবার পর হইতেই মীরা মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল আমায় নামাইবে, মনে করাইয়া দিবে ওরা প্রশ্রয় দেয় তাই, নহিলে আমি কত নগণ্য। নামাইলই সে, যাহাতে আমার বা দর্শকদের মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্য প্রথমে উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়া তাহার পর নামাইল; শূন্যে একটা স্পষ্ট সুদীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া অতলে বিলীন হইয়া গেলাম আমি।

কিন্তু কেন নামাইল মীরা? আমার অপরাধটা কি ছিল? আগাগোড়া একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।—

ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় সরমাকে লইয়া, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি;—সরমাকে সেদিন পরিচিত করাইবার সময় অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না শৈলেন।" সরমা হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "যোগ্যের প্রশংসায় একটা মস্ত বড় আনন্দ আছে কিনা সরমা দেবী···

কথা লঘুভাবেই বাড়িয়া যায় এবং সরমাকে আমি আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিই। এই খানে মীরার নিষ্প্রভ হাসির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পছন্দ হয় নাই মীরার। পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে আমি সরমাকে অর্থাৎ সরমার মত সুন্দরীকে প্রশংসার এত যোগ্য ঠাহর করিতে গেলাম কেন? মীরার যে এটা ভাল লাগে নাই তাহাই নয়, এই ভাল না-লাগার ব্যাপারটা যে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি সেটা মীরা টের পাইয়াছিল। ব্যাপারটা এইখানে সামলাইয়া যাইত, কিন্তু তাহা না হইয়া আরও বাড়িয়াই গেল; মীরার কটু লাগিতেছে জানিয়াও আমায় আবার এই দ্বিতীয়বার বলিতে হইল যে, সরমা আমাদের মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। মীরার ঈর্ষাকে কোথায় ঠাণ্ডা করিব, না উদ্রিক্ত করিয়া তুলিলাম। কিন্তু উপায় ছিল না; ওইটুকু না বলিলে ঘোরতর অন্যায় হইত।

মীরা চা ঢালিতেছিল, ঠিক এই সময়টিতে তাহার হাত হইতে ছলকিয়া খানিকটা চা টেবিল-ক্লথের উপর পড়িয়া যায়। ইহার পরই মীরার প্রতিশোধ আরম্ভ হয়; অনাড়ম্বর,

কিন্তু অব্যর্থ।

একটু পরেই, কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন মীরা সাহিত্য-চর্চার কথা তুলিল ; আমার পরিচয় দিল ।···আমি স্বীকার করিতেছি মীরার হঠাৎ এই দিক্-পরিবর্তনে আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারি নাই। নিজেকে দোষ দিব না—অবশ্য মীরার উপগ্রহদের প্রশংসার কথা ধরি না, মীরার নিজের মুখের দুইটা প্রশংসার কথায় যে কি সুধা আছে তাহা দুইটা মসির আঁচড়ে আপনাদের কি করিয়া বুঝাইব ? —আমি তাই সতর্ক থাকিতে পারি নাই ; আমি আমার মোহের সাজা পাইয়াছি।

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, প্রশংসার আড়ালে মীরা আমার জন্য নিদারুণ অপমানকে আগাইয়া আনিতেছে। সভাপতি করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় জানাইয়া দিল,—সভাপতি হইব কি, আমার এদের সভায়, এদের পার্টিতে বসিবার অধিকারই নাই। কাণ্ডটা যে উদ্দেশ্যে করা, তদনুরূপ ভাষায় প্রয়োগ করিলে দাঁড়াইত- 'যে কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রাখা তাই করুনগিয়ে। বাড়িতেপার্টি হচ্ছে তো আপনার কি সম্পর্ক তার সঙ্গে ? আর সভাপতি যখন হবেন, হবেন ; আপাতত সে-সব বড় কথা ছেড়ে তরুকে বেড়িয়ে নিয়ে আসুন।'

পূর্বে বোধ হয় বলিয়াছি, মীরার এ-আক্রোশ একটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মিথ্যার একদিকে আমার যেমন দারুণ লজ্জা, অপরদিকে তেমনই সুনিবিড় তৃপ্তি। লজ্জা এই জন্যে যে, মীরা ভাবিল আমি সরমার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি, তাই এত লোক থাকিতে সরমার যোগ্যতার দিকে আমারএতদৃষ্টি, তার উপস্থিতির জন্য এত কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি।—এত লজ্জা জীবনে বোধ হয় আমার কমই ঘটিয়াছে। আমি সরমার বিষয় যাহা শুনিয়াছি, এ-বাড়িতে তাহার যে প্রতিষ্ঠা, তাহার জন্য তাহার প্রতি আমার একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। আমার বিশ্বাস যে, যে সরমার তিল তিল করিয়া আত্মোৎসর্গের কথা জানিবে, সে ওকে না ভালবাসিয়া পারিবে না ; যে জানিবে, তাহার পরও যদি বাসনা দিয়া সরমার বায়ুমণ্ডল কলুষিত করিতে চায়, বিশেষ করিয়া এই বাড়িতেই থাকিয়া, তো তাহার মনুষ্যত্বে সন্দেহ হইবারই কথা।

এই একই মিথ্যার অন্য দিকে আছে চরম তৃপ্তি।—মীরা যদি ধরিয়াই লইয়া থাকে আমি সরমার পক্ষপাতী তো তাহাতে তাহার কি ?—ঈর্ষা ? যদি তাহাই হয় তো কোথায় সে ঈর্ষার উৎস ?—আমার আর মীরার মাঝে নূতন করিয়া সরমা—এর মধ্যেই নয় কি ?

কিন্তু এ-সব কথা যাক্।

তখনকার সব চেয়ে বড় কথা যা মনের সামনেই ছিল তা এই যে মীরাদের বাড়িতে আমার এই শেষ দিন। মীরা আমায় কয়েকবারই খুব নিকটে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়াছে, কিন্তু আজ চরম। তীব্র অপমানে শরীরটা কি ভারী করিয়া দেয় ? পার্টির

মধ্য হইতে বাহির হইলাম যেন সমস্ত মাটি তিল তিল করিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছি,-পা উঠিতেছে না যেন—আমার অদ্ভুতচলার দিকে সবাই যেন চাহিয়া আছে—প্রত্যেকটি চক্ষুতে যেন ব্যঙ্গের কটাক্ষ—আমি এদের স্তরের একজন মেয়েকে ভালবাসিতে গিয়াছি··· স্পর্ধা !

তরুকে লইয়া তাড়াতাড়ি মোটরে বাহির হইয়া গেলাম।

মাঠের পর গঙ্গার ধার, তাহার পর ট্রাণ্ড রোড অতিক্রম করিয়া ব্যারাকপুর রোড—আশ মিটিতেছে না, ইচ্ছা করিতেছে দূরে—আরও দূরে যাই, যেখানে আজকের অপরাহ্নের স্মৃতি আর পৌঁছিতে পারিবে না। ড্রাইভারকে আদেশ দিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, তরু প্রশ্ন করিয়াছে, এক-আধটা উত্তরও দিয়া থাকিব, কিন্তু কি প্রশ্ন আর কি উত্তর তা একেবারে মনে নেই। শুধু একটা কথা মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে—কালই, তার বেশি আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। কাজ তো গৃহশিক্ষক, বাড়িতে এত বড় একটা উৎসবের মধ্যেও যাহার তিলমাত্র স্থান নাই বলিয়া মীরাই জানাইয়া দিল,—তাহার জন্য আবার নোটিশ দেওয়া কি ?

ফাঁকা রাস্তা, মোটরের হুড নামাইয়া দিয়াছি ; হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লাগিতেছে। তবুও ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে বলিতেছি, "আরও একটু জোর দেওয়া যায় না জগদীশ ?"

ফিরিবার সময় মাথাটা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। বেশ একটু রাত হইয়াছে, কিন্তু তখনও কলিকাতার বাহিরে। রাত্রির প্রশান্তির মধ্যে চিন্তার ধারা বদলায়। প্রতিজ্ঞা এরই মধ্যে একটু শিথিল হইয়াছে। অল্পে অল্পে নিঃসাড়ে একটা প্রশ্ন আসিয়া মাথায় জাঁকিয়া বসিয়াছে—মীরার দোষ কোথায় ?

—আমি গৃহস্থসন্তান ; ঠিক তাহাও নয়, দরিদ্রসন্তান। পড়িব এই উচ্চাশা লইয়া টুইশ্যন করিতেছি, তাহাতে ভগবান আমার আশার অতিরিক্ত সুযোগ দিয়াছেন। ফলও পাইতেছি ;—সর্বপ্রকার সুবিধা এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে পড়াশুনা করিতে পাওয়ায় আমি এখন এম্-এ ক্লাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র। আমি এর বেশি আর কি আশা করিতে পারি ? কন্তু অচিন্ত্যনীয় সফলতাকেও অতিক্রম করিয়া আমার বাসনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল,—আমি চাই মীরাকে—আমার মনিবের সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, অসাধারণ তীক্ষ্ণধী কন্যা মীরাকে, যে-কোন এক রাজকুমারেরও পরম কাম্য ধন !

না, মীরার দোষ নাই। মীরা আমার উপকার করিয়াছে। আমি দিশাহারা হইয়াছিলাম, মীরা বন্ধুর মতই আমায় আমার নিজের জায়গাটিতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বোধ হয় ব্যাপারটা বেশ সুমিষ্টভাবে করে নাই ; ভালই করিয়াছে, রুচিকর করিতে গেলে আমার চৈতন্য হইত না।

না, নিজের স্বার্থের জন্য থাকিতে হইবে, থাকিতে হইবে নিজের গণ্ডী সম্বন্ধে সচেতন

হইয়া।

মনে রাখিতে হইবে—আমার গণ্ডীর মধ্যে আছে মাত্র তরু, আর সবাই, সব কিছুই গণ্ডীর বাহিরে।

বাসায় যখন ফিরিলাম তখন আমার প্রতিজ্ঞা একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। অথবা এমনও বলা চলে, প্রতিজ্ঞাটার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সেটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। অর্থাৎ থাকিতে হইবে।

সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি ; মনটা মীরার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিতেছে।

১৭

ফিরিতে বেশ রাত হইয়া গেল। পড়ার হাংগাম নাই, তরু উপরে চলিয়া গেল।

দেখি ইমান্নুল আমার দুয়ারের কাছে, বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া আছে, আমারই অপেক্ষায় যেন। পার্টির সময় যে-স্যুটটা পারিয়াছিল, এখনও ছাড়ে নাই।

আমি সামনে আসিতেই একটু অপ্রতিভ ভাবেই হাসিয়া বলিল, "বড় লেট্ হ'য়ে গেল বাবু আজকে আপনাদের।"

এ-বাড়িতে ইমান্নুল, ক্লীনার সকলেরই একটু-আধটু ইংরেজী বলিবার ঝোঁক আছে। ওরা যে ব্যারিস্টার-সাহেব-বাড়ির চাকর, অন্য কোথারও নয় ; এক-আধটা বুকনি দিয়া বোধ হয় সেইটে সূচিত করে, সবাই অন্তত সাত-আটটি করিয়া কথা জানে; অবশ্য রাজু বেয়ারা একটা স্কলার।

আমার দৃষ্টিটা হঠাৎ ইমান্নুলের শান্ত মুখের উপর যেন নিবদ্ধ হইয়া গেল। আমার যেন মনে হইল এত দিন একটা কৃত্রিম উচ্চতায় আরোহণ করিয়া ইমান্নুলকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, আজ নিজের স্থানটিতে ফিরিয়া অসিয়া ইহাকে বেশ বুঝা যাইতেছে, চেনা যাইতেছে। ইমান্নুল আমার স্তরের মানুষ, আর একটু বোধ হয় নীচে—তা এমন নীচেই বা কি? ওর ভাই আছে, ভাজ আছে, ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝি আছে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র গৃহস্থের সংসারের মধ্যে হইতে তাহারা বোধ হয় ওর দিকে চাহিয়া আছে। ইমান্নুল বাহিরে আসিয়াছে, পৃথিবীকে ভাল করিয়া দেখিতেছে, শিখিতেছে, উপার্জন করিতেছে ; কোন এক সময়ে ফিরিবেই বাড়ি, বাড়ি ছাড়িয়া কেহ কি চিরদিন থাকিতে পারে? বাড়ির জন্যই তো উপার্জন করা, নিজেকে বড় করিয়া তোলা মানুষের··· ।

সব দিক দিয়া আমার সঙ্গে ইমান্নুলের একটা নিবিড় সাম্য আছে।···মীরা যেন আরও দূরে চলিয়া গেল।

কেমন অদ্ভুত কাণ্ড, ভুলের মধ্যেও ইমানুলের সঙ্গে আমার একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে! আমি চাই মীরাকে, ইমানুল চায় মিশনারী সাহেবের যুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। ইমানুল শুনিয়াছি মাহিনা লয় না; মিস্টার রায়ের নিকট মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া তাহার মাহিনা জমা হইতেছে। চার বৎসর হইয়াছে। হিসাব না-জানার কল্যাণে ইমানুল মনে মনে সঞ্চিত টাকাটার যে আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছে সেটা আমাদের অঙ্কশাস্ত্র মত প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। অর্থাৎ ইমানুল আমার চেয়েও মজিয়াছে।

ইমানুলকে বাঁচাইতে হইবে। আমার মোহ ভাঙিয়াছে মীরা, ইমানুলের যে মোহিনী সে কি তাহার মোহ ভাঙিতে আসিবে? না, ও-কাজটা আমারই করিতে হইবে, আমরা পরস্পরকে না দেখিলে দেখিবে কে?—এই গৃহস্থরা, এই দরিদ্ররা?···

আমায় ঠায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ইমানুল লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল একটু, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমার মুখের পানে চাহিয়া, চক্ষুপল্লব কয়েকবার দ্রুত স্পন্দিত করিয়া বলিল, "তাহ'লে যাই এখন, দেরি হ'য়ে গেছে আপনার, এই বাট্‌ন্‌-হোলটা লেন।"

দুঃখের আঘাতে এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, ইমানুল মালীর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করিবারও প্রবৃত্তি চাপিতে পারিলাম না। বাট্‌ন্‌-হোল্‌টা নিজের নাকের কাছে ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আহা বেশ চমৎকার! থ্যাংক্‌ ইউ মিস্টার ইম্যানুয়েল বোরান।

ইমানুল হাসিয়া আবার মাথা নত করিল। আসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল দিকিন, চিঠি লিখতে হবে?"

ইমানুল মাথা নত করিয়াই বলিল, "কালই আসব তখন, মাস্টারবাবু, আজ রাত হয়ে গেল আপনার···মিছেই লেখা বোধ হয় বাবু, তবে টাকা অনেক জমিয়েছি, ফাদার চাইল্ড যদিই শোনে···"

কেমন এক ধরনের মূঢ় আশার হাসি হাসিল একটু।

আমি ইমানুলকে নিরস্ত করিব ঠিক করিয়াছিলাম, ওর মুগ্ধতা দেখিয়া প্রাণ সরিল না। কি হইবে মোহ ভাঙিয়া? থাক না; মোহই তো জীবন। ফাদার চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী তো জন্মে আসিবে না উহার কাছে, ও নির্ভয়ে করুক না পূজা।··· মীরা যে আমার জীবন হইতে চলিয়া যাইতেছে, সুখী কি আমি সেজন্যে? ওর ভ্রান্তি যদি কখনও আমার মত আপনা-আপনিই ঘোচে, ঘুচিবে। ততদিন তাই থেকে জীবনের রস নিংড়াইয়া নিক না।

বলিলাম, "বলা যায় না ইমানুল, তুমি যেমন চাইছ, সেও তো তোমায় সেই রকম চাইতে পারে, তাহ'লে মাঝে থাকবে শুধু ফাদার চাইল্ডের মতটুকুর অপেক্ষা। তার জন্যে তো ন্যাথেনিয়েল রয়েছেই, চেষ্টা করবেই।···নাঃ, তুমি কাল নিশ্চয় এস।"

ইমানুল কৃতকৃতার্থ হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় রাজু বেয়ারা আসিয়া

উপস্থিত হইল। ইমানুলের পানে চাহিয়া বলিল, "জুটেছে সেই পোস্টকার্ড নিয়ে মহাভারত লিখ্‌তে তো? ওঃ, আজ আবার রাজবেশ।"

ইমানুল লজ্জিতভাবে সরিয়া গেল।

রাজু ঘরে ঢুকিয়া লাইটটা জ্বালিয়া বলিল, "আপনাদের রাত হ'য়ে গেল আজ, দিদিমণি ক-বার জিগ্যেস করলেন।"

আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, রাগ করেছেন নাকি?

আজ বিকেলের আগে পর্যন্ত এমন কথা বলিতাম না। এই সন্ধ্যার পর থেকে হঠাৎ আবার মনিবের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে মীরার সঙ্গে। যাহা বলিয়া ফেলিলাম আজকালকার মনোবিশ্লেষণের ভাষায় তাহাকে বলা যায়—অবচেতনার খেলা।

রাজু কোটটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "নাঃ তেনার শরীরে রাগ নেই, সে রকম স্বভাবই নয়। আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মাস্টার-মশা।"

এই আশ্বাসে আমার গা'টা যেন ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল, কত নামিয়াছি আজ! রাজু আশ্বাস দেয়! ওকে জানাইয়া ফেলিয়াছি আমি শঙ্কিত।

রাজু হঠাৎ টেবিল ঝাড়া বন্ধ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একটা কথা শুনেছেন মাস্টার-মশা?—হাইকোর্টে অরিজিন্যাল সাইডে এবার রেকর্ড নম্বর কেস!"

আজ পার্টিতে ব্যারিস্টার মহলে শোনা কথা।⋯ তরু, চোখ বড় করিয়া বলে "মাস্টারমশাই, কি নেশা রাজুর! তেমন তেমন বড় কথাগুলো আবার তক্ষুনি গিয়ে বাংলায় লিখে নেয়—তারপর মুখস্থ করে ফেলে।"

আজকের পার্টিতে ইংরেজী ফসল সংগ্রহ হইয়াছে বেশ মোটা রকম; অকারণে আসবাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে ওর মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় পরিচয় দেবার জন্য রাজুর পেট ফুলিতেছে। আবার একটা ওজন-দুরস্ত বোঝা নামাইতে যাইবে, উপর হইতে বিলাস ঝিয়ের গলা শোনা গেল, "রাজু, মীরা দিদিমণি শীগ্‌গির তোমায় ডাকছেন, যেমন আছ চলে এস।"

বিলাস সিঁড়ির অর্ধেকটা নামিয়া আসিয়া খবর দিয়া আবার উঠিয়া গেল। বিলাস ঝি হোক্‌, কিন্তু একটা রাজবাড়ির প্রতিনিধি—একটু পর্দানশীন্। বনেদী ঝি, আজকালকার আয়া নয় তো!

রাজু বেচারার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, "ঐ যাঃ, ভুলেই গেছলাম"—তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়া একটা মুখআঁটা খাম আমার হাতে দিয়া হন্তদন্তভাবে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আবার উপর হইতে তাগাদা হইল—এবার খুব ত্রস্ত—"রাজু শোন, একটু শীগ্‌গির এস।"

এবার সিঁড়ির মাথা থেকে। ডাকিতেছে স্বয়ং মীরা। কণ্ঠস্বর খুব বেশি রকম উদ্বিগ্ন।

আমি শঙ্কিত কৌতূহলে বাহির হইয়া আসিলাম; কিন্তু মীরা তখন আবার নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে; দেখিতে পাইলাম না।

ডাকের চিঠি নয়, মাত্র শুধু নামটা লেখা, তাও বাংলায়। চিঠি কে দেয়?··· চিন্তার মধ্যে খামটা খুলিয়া ফেলিলাম।

ঠিক চিঠি জাতীয় কিছু নয়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত দু'টি কথা—

"মাস্টারমশাই, সরমা আমার প্রবাসী দাদার বাগ্‌দত্তা।"

মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে বিজলী বাতি, ঘরের আসবাবপত্র সমেত যেন একটা আকস্মিক অন্ধকারের বন্যায় ডুবিয়া গেল। সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া এক সূচীভেদের তীক্ষ্ণ জ্বালা, তাহার পর যেন নিজের অস্তিত্ব অনুভবই করিতে পারিলাম না।

কখন বসিয়া পড়িয়াছি, কতক্ষণ বসিয়া আছি জানি না। নিজেকে আবার অনুভব করিলাম রাজুর কথায়। রাজু হাঁপাইতেছে, মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, যেন কতদূর থেকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিয়াছে। বলিল, "মাস্টার-মশা, সেই চিঠিটা—এক্ষুনি যে দিয়ে গেলাম?···চাইছেন দিদিমণি···"

সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বর এলাইয়া পড়িল; ছিন্ন খামের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ টানের সঙ্গে হতাশভাবে বলিল, "যাঃ, ছিঁড়ে ফেলেছেন?"

আস্তে আস্তে ফিরিয়া গেল, শুনিতেছি—সিঁড়ির ধাপে ওর মন্থর পদধ্বনি ধীরে ধীরে উঠিতেছে।

একটা অসহ্য রাত্রি গেল, সৃষ্টির আদিম অন্ধকারের মত দীর্ঘ। সেদিনের—সেই অপরাহ্ণের উপযোগী একটা রজনী।

আমি মনে প্রাণে এই বাড়ি ছাড়িয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম থাকাই।—স্বার্থ। দরিদ্র যদি প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে আরও একটা জিনিস চিরদিনের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিতে হয়, সে জিনিসটা দারিদ্র্য।···তাই ফিরিয়াছিলাম। অদৃষ্ট আবার চরণকে বহির্মুখী করিল।··· উপায় নাই; এই চিঠি অল্প কথায় হইলেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত, এই কুৎসিত সন্দেহের পরও থাকিলে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সবই ছাড়িয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিতে হয়। স্বার্থের জন্য একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিব কি না, সেই বিনিদ্র রজনীতে শুধু সেই কথাই ভাবিলাম।

১৮

পরের দিন প্রভাতে রৌদ্র ছিল মলিন, সমস্ত বাড়িটা থমথম্ করিতেছে। হয়তো আসলে এরকম নয়, আর সব প্রভাতের মতই এটাও, শুধু আমার মনের ছায়া পড়িয়া এমনটা বোধ হইতেছে।

মীরা এদিকে রোজ সকালে বাগানে আসে। আমাদের অভিবাদনের বিনিময় হয়। আজ নামে নাই।

বেলা প্রায় নয়টা। তরু লক্ষ্মীপাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসে নাই। মিস্টার রায় সকাল সকাল বাহির হইয়া গেলেন। আমি শ্রান্ত চরণে গিয়া মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইলাম। কাল তাহার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আহত মর্যাদার একটা তেজ অনুভব করিতেছি, সেই আমায় ঠেলিয়া আনিয়াছে, সেই আমায় মুক্তি দিবে।... কিন্তু কি অসীম ক্লান্তি! মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না!

তাহার পর চেতনা হইল—এমনভাবে মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া থাকাটা কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে। ঠিক শোভন নয়।

নিজে বেশ বুঝিতেছি—একটা বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন?"

উত্তর হইল, "কে ··আসুন।"

আমি পর্দা উঠাইয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মীরার ঘরটি একেবারে বিলাতী কায়দায় সজ্জিত। দেয়ালটা হালকা সবুজ রঙে রঙীন। মেঝেয় সেই রঙের মোটা কার্পেট, তাহার উপর কৌচ, সেটী, চেয়ার, কারুমণ্ডিত ছোট ছোট টেবিল, সবগুলিই ঈষৎ গাঢ় থেকে হালকা সবুজ রঙে সুসমঞ্জসিত। একদিকে একটা দেরাজসুদ্ধ মাঝারি সাইজের টেবিল। তাহার পাশে দুইটি সুদৃশ্য আলমারি ঝকঝকে বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। দেয়ালের ছবিগুলি প্রায় সব বিদেশী—র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো থেকে আরম্ভ করিয়া রেনল্ডস্, টার্নার, মিলে প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের চিত্রকরদের আঁকা; দেশীর মধ্যে কলিকাতার আর্ট একজিবিশনের পুরস্কার-প্রাপ্ত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা তিন-চারখানি ছবি।

ঘরটি সাজানোর মধ্যে রুচির পরিচয় আছে, তবে একটু যেন বাহুল্য-ঘেঁষা; দু চারখানা আসবাবপত্র ও খানকতক ছবি কম থাকিলে যেন আরও ভাল হইত।... মীরার রুচি আছে, তবে সেই সঙ্গে আধিক্যপ্রিয়তার একটা ছেলেমানুষিও আছে। মেয়েছেলের মন একটু ছেলেমানুষি-ঘেঁষাই লাগে ভাল, অন্তত আমার তো ভাল লাগে।

মীরার ঘরে দেবদেবীর ছবি নাই; এই দিক দিয়া মায়ের সঙ্গে আড়াআড়িটা খুব স্পষ্ট।

অন্য কেহ ভাবিয়া মীরা স্বর শুনিয়াই "আসুন বলিয়া দিয়াছে, আমি আসিব মোটেই এটা ভাবে নাই। এই প্রথম আসাও আমার। টেবিলের উপর একটা কৌচে হেলান দিয়া পড়িতেছিল মীরা, অন্তত আমি যখন প্রবেশ করিলাম তাহার পাশেই একটা ছোট টেবিলে একটা খোলা বই ওল্টান পড়িয়াছিল, এবং তাহার উপর মীরার হাতটা ছিল।

কিন্তু একি চেহারা মীরার! আমি আসিবার সময় বারান্দার হ্যাটস্ট্যাণ্ডের গোল আর্শিটাতে আমার নিজের চেহারার প্রতিচ্ছায়া হঠাৎ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম; মাত্র একটি রজনীর জাগরণ আমার; মীরা যেন ক-রাত্রি ঘুমায় নাই! মুখটা শুকাইয়া

যেন লম্বাটে হইয়া গিয়াছে, চোখে রাজ্যের শ্রান্তি।

আমি ভিতরে আসিতেই মীরা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত মাত্র আমার পানে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "ও! আপনি?"

আমি বলিলাম, "একটু দরকার পড়ে গেল, আসতে হ'ল, ইন্‌ট্রুড্ করলাম কি?"

আর সময় দিলাম না; বিনয়টুকু প্রকাশ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "কাল রাত্রে রাজু আমায় একটা চিঠি দিয়ে আসে..."

মীরা ভদ্রতার খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, যেন ভুলিয়া গেল! আমার পানে চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, তাহার দৃষ্টি নত হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর জিজ্ঞাসা করবার অত দরকার দেখি না, তবে আত্মতৃপ্তি বা স্পষ্টভাবে অতৃপ্তির জন্যে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, মীরা দেবী—চিঠিতে যে কথাটার সংকেত আছে সে কি সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন?"

মীরা নিজের উপর সংযম হারাইতেছে, স্ত্রীলোক তো? তাহার উপর সেই স্ত্রীলোক যে ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা দুর্বল করে; পুরুষকেও করে, স্ত্রীলোককেও করে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যতটা করে পুরুষকে তার শতাংশের এক অংশও করে না বোধ হয়। এই দুর্বলতায় স্ত্রী পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালিনী। মীরা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, আমার মুখের উপর শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সংকেত—সংকেত কি? আমি তো শুধু..." শেষ করিতে পারিল না। একদিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, আর অন্য দিকে উত্তর নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নির্বিকার দৃষ্টিতে আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে একটু চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, "সরমা দেবী যে আপনার দাদার বাগদত্তা সেটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি, মীরা দেবী। আর জানার পর থেকে ওঁকে যতটুকু দেখতে বা বুঝতে পেরেছি, তা দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে আমার খুব একটা বিস্ময়ের আর শ্রদ্ধার ভাব আছে। আমি এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না, কেন-না, খুব গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধি সম্বন্ধে বলা আমার স্বাভাববিরুদ্ধ। কথা জিনিসটা নিজেই হাল্‌কা বলে, মনে হয় উপলব্ধিটাকেও হাল্‌কা ক'রে ফেলবে। আমার এত কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু এসে পড়ল। আসলে এ প্রসঙ্গটা তোলবারই ইচ্ছে ছিল না আমার; আমি বলতে এসেছিলাম অন্য কথা।"

মীরা দৃষ্টি নামাইয়া লইয়াছিল, আবার তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বলিলাম, "আমি বলতে এসেছিলাম—আপনি যে আপনার সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন এটা আমি বেশ অনুভব করছি—এই তরুর টিউটর বাছাই সম্বন্ধে।"

মীরা সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে কি!"

আমি ওর কথার উত্তর না দিয়া বলিলাম, "এটা যে হবেই, আমার বরাবরই এ-রকম একটা আশঙ্কা ছিল—যে রকম বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রেই, পরিচয় না

নিয়েই আপনি আমায় কাজে নিয়োগ ক'রে নিলেন। আমি অনেকবার দেখেছি আপনার চেহারায় অনুতাপের ভাব ফুটেছে, যেন আপনি ঠকেছেন, যেন অন্যরকম টিউটর রাখা উদ্দেশ্য ছিল আপনার।"

মীরা বেশ ভাল করিয়া সোজা হইয়া বসিল; বেশ বুঝিলাম সরমার ব্যাপার থেকে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ায় সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বেশ সপ্রতিভ হইয়া জোরের সহিত বলিল, "না, ও-কথা বলে আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন শৈলেনবাবু, আপনাকে রাখার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আমি। আপনি যে খুব ভাল একজন শিক্ষক মা, বাবা থেকে নিয়ে বাড়ির সবাই একথা স্বীকার করি আমরা। আমার মুখে এ ব্যাপার নিয়ে···"

আজ আমি চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং সংকোচের আর প্রয়োজন কি অত? অবশ্য স্পষ্টভাবে মীরাকে আমি পাই নাই, তাই স্পষ্টভাবে কিছু বলার কথা উঠিতেই পারে না, তবু মন তো দু-জনের দু-জনেই আভাসে জানি? আভাসেই একটু বলা যাক না, কাল থেকে দু জনের তো দুই পথ।

মীরাকে শেষ করিতে না দিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আমার কাজ তরুর মাস্টারি, তাতে আমি যথাসাধ্য করিই—এ আত্মপ্রত্যয়টুকু আমার আছে। আর, একটা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশংসা এই যে, সে যথাসাধ্য করছে। কিন্তু মাস্টারির অতিরিক্ত আর একটা কথা আছে।"

মীরা আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

আমার একটু দ্বিধা আসিল, সেটা কাটাইয়া লইয়া বলিলাম, "সে কথাটা এই যে একটা মানুষ আমাদের আশেপাশে থাকলে তার সঙ্গে আমাদের কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরও অনেক সম্বন্ধ এসে পড়ে..."

মীরা দৃষ্টি নত করিয়া বাম অনামিকার আংটিটা ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতেছিল, এইখানে হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে হইল তাহার মুখটাও যেন রাঙা হইয়া উঠিল। আমি মুহূর্ত মাত্র একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলিলাম, "কিছু না হোক একজন সঙ্গীও তো সে? কথাটা ঠিক সঙ্গী নয়, ইংরেজীতে যাকে বলে 'নেবার' (neighbour) অর্থাৎ যার সঙ্গে আত্মীয়তা না থাকলেও খুব কাছে থাকার হেতু একটা নিবিড় পরিচয় আছে। আমার মনে হয়, এই 'নেবার' হিসাবে আমি আপনাকে নিরাশ করেছি।"

মীরা আমার পানে তাহার সেই নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, ক্ষণমাত্র কি একটা ভাবিল, তাহার পর বলিল, "যখনই আপনার সাহায্য চেয়েছি একটুও বিরক্ত না হয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন; আপনি না থাকলে এই পার্টিটা যে কি হ'ত! এর পরেও আমি মনে করব আপনাকে নিয়োগ করা আমার ভুল হয়েছে? আমায় এত ছোট মনে করলেন কেন আপনি?"

এর পরে কথাটা বলিতে কষ্ট হইল, কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়াই বলিলাম, "আমি ঠিক ও-কথা বলতে চাইছি না। সামান্য কি একটু করেছি না-করেছি সে নিয়ে আপনি লজ্জা দেবেন না আমায়। আমি কথাটা অন্যভাবে বলছিলাম—ধরুন, আপনার এই 'নেবার' তো এমনও হ'তে পারে যে, আপনার দাদার বাগদত্তার সম্বন্ধেই একটা অনুচিত মনোভাব পোষণ করতে পারে···।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই সরমার কথা। চিঠির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ায় মীরা যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিল, এবারে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সোফায় এলাইয়া পড়িল। হাত দুইটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখের উপর জড় করিয়া একটু মৌন রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখের রেখাগুলা কঠিন হইয়া উঠিল, নাসিকা-প্রান্তের সেই কুঞ্চন জাগিয়া উঠিল। ধীরে অথচ একটু রূঢ় কণ্ঠে বলিল, "পারে বই কি শৈলেনবাবু।"

আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কেমন করিয়া স্পষ্টভাবে কথাটা বলিতে পারিল মীরা! আমি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেছি, ও যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসই করিবে তো রাজুকে দিয়া চিঠিটা ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল কেন? ওর এটা বিশ্বাস নয়, পরন্তু সরমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক, যাহা অযথাই ওর মনে একটা ঈর্ষা আনিয়া দিয়াছে। এই ঈর্ষাটা এই জন্য নয় যে, আমি সরমাকে ভালবাসিয়া থাকিতে পারি, পরন্তু এই জন্য যে, মীরা আমায় ভালবাসে।··· মীরা কি-রকম মেয়ে আমি ভাল করিয়াই জানি, —যদি ওর বিশ্বাস হইত যে, আমি সরমার অনুরাগী, ও ওর প্রবাসী ভাইয়ের এ অপমান কোনমতেই সহ্য করিত না। চিঠি ফেরত লওয়া তো দূরের কথা; চিঠি লিখিতই না, অন্যভাবে এবং অবিলম্বে এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সংস্রব ছেদন করিত।

সে-ছেদনে যদি তাহার নিজের মর্মই রক্তাক্ত হইত তো মীরা গ্রাহ্য করিত না।

অবশ্য এখন যে উত্তরটা দিল সেটা আমার তর্কে কোণঠাসা হইয়া মরিয়া হইয়া; তবুও আমার মনটা এমন বিষাইয়া গিয়াছে যে, আমি মার্জনা করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "এত বড় অন্যায় অপবাদ আমি আজ পর্যন্ত জীবনে পাইনি, মীরা দেবী; আর, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি বোধহয় মন থেকে বিশ্বাস না ক'রেও এ-অপবাদটা আমায় দিলেন; কেন-না পার্টিতে যে ব্যাপারটুকু হয়েছিল—অর্থাৎ সরমা দেবীকে যে বারদুয়েক প্রশংসা করেছিলাম বা কমপ্লিমেণ্ট দিয়েছিলাম— যা উপলক্ষ ক'রে এতটা ব্যাপার, তার আসল হেতুটা আপনার মত বুদ্ধিমতী একজন যে বুঝতে পারেননি, এটা আমি কখনই বিশ্বাস করব না। কিন্তু যাক্, সেটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা, ভুল হ'তেও পারে। তাই আমায় ধরে নিতে হবে আপনি বুঝতে পারেননি কারণটা, সুতরাং নিজেকে ক্লীয়ার করবার জন্য আমার বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। সরমা দেবী সম্বন্ধে কাল আমি দু-বার দুটো কথা বলেছিলাম—একবার আপনার মায়ের সাক্ষাতে। আপনার

মিসরমাদেবীকে আমার কাছে পরিচিত করার প্রসঙ্গে বললেন, এমন চমৎকার মেয়ে হয় না শৈলেন,...' সরমা দেবী প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন,—'এমন চমৎকার কাকীমা হয় না শৈলেনবাবু, শুধু শুধু এত প্রশংসা করতে পারেন!'...আমার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, একজন নবপরিচিতা মেয়ে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে কথাটা, সে হিসাবেও অপর্ণা দেবীর প্রশংসাটা সমর্থন করা উচিত ছিল আমার। তাই আমি বলি, যোগ্যের প্রশংসায় মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে সরমা দেবী।' তারপর প্রসঙ্গ ধরে আরও একটুখানি প্রশংসা করতে হয়—আমার এই হ'ল প্রথম অপরাধ।"

মীরা তেমনই কঠিন হইয়া বসিয়া আছে; চুপ করিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিল।

আমি বলিতে লাগিলাম, "দ্বিতীয় অপরাধ,—চায়ের টেবিলে আমরা সবাই যখন বসে, তখন কথাপ্রসঙ্গে আমি জানাই যে, সরমা দেবী আসায় আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।"

এইবার আঘাতটা একটু ব্যাপকভাবে দেওয়ার জন্য আমার মনটা যেন মাতিয়া উঠিল,—এমন একটা আঘাত দিব যাহা ব্যারিস্টারের কন্যা আর তাহার স্তাবকদের একসঙ্গে গিয়া লাগিবে। আমি তো যাইতেছি,—কিসের দ্বিধা বা সঙ্কোচ?

বলিলাম, "মীরা দেবী, আমি গরীব, পার্টিতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ আমার স্বভাবতই এর আগে পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস জানি—তা এই যে, আমাদের পার্টি জিনিসটা—শুধু পার্টি কেন, স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সারা ব্যাপারটা ইংরেজদের নকল। তা যদি হয় তো নকলটা ঠিকমতই হওয়া উচিত, আধাখ্যাচড়া হ'লে বড় বিসদৃশ হয়ে ওঠে। আমি মেয়েছেলের কথা বলছি না, কিন্তু আমাদের টেবিলে কাল যে-কটি পুরুষ বসেছিলেন, তাঁদের দেখে মনে হ'ল যে তাঁরা টাই বাঁধা, কাঁটা-চামচে ধরা, কি কাপে নিখুঁতভাবে চুমুক দেওয়ার কায়দা রপ্ত করতেই এত বেশি সময় দিয়েছেন যে ইংরেজরা যেটাকে নিতান্ত মামুলি ভদ্রতা বলে জ্ঞান করে, সেটার দিকে পর্যন্ত নজর দেওয়ার অবসর পাননি।—দু-জন মহিলা একসঙ্গে বসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে—বিশেষ ক'রে সেই একজনকে যিনি হোস্টেস্ (নিমন্ত্রণকর্ত্রী)—প্রশংসায় কম্প্লিমেন্টে বিপর্যস্ত ক'রে অপর জনের সম্বন্ধে নীরব থাকা কোন ইংরেজ কস্মিন্ কালেও ভাবতে পারে না। অথচ ঠিক এই জিনিসটা হয়েছিল কাল, নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওদের প্রশংসার স্রোতটা একবার একটুখানিও সরমা দেবীর অভিমুখী করতে, আশা করেছিলাম কারুর না কারুর নজর এই ত্রুটিটুকুর দিকে পড়বেই, শেষে একেবারেই নিরাশ, নিরুপায় হয়ে আমাকেই সেটুকু সংশোধন ক'রে নিতে হ'ল। তাও আমি কখন করলাম, না, নীরেশবাবু যখন হোস্টেসের প্রশংসায় এতটা মেতে উঠেছেন যে,-

সরমা দেবী একটা কথা বলছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে নিজের কথা এনে ফেললেন।"

মীরা শেষের দিকে স্থির নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল—একটু বিস্মিত—আমার মত স্বল্পবাক্ লোক যে এতকথা বলিবে, আর এত স্পষ্টভাবে, ও যেন ভাবিতে পারে নাই, বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

আমি ওর মনের কথা ধরিয়াই বলিলাম, "আমার এত কথা বা এসব কথা বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কেন-না, আপনার বিশ্বাস আপনাদের বাড়ির টিউটর আপনার দাদার বাগদত্তা সম্বন্ধে একটা অনুচিত মনোভাব রাখতে পারে এবং সে কাল সরমা দেবী সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তার মূলে রয়েছে ঐ অনুচিত মনোভাব।"

মীরার মুখের সেই কঠিন ভাবটা নরম হইয়া আসিয়াছে। ধীরে, একটু যেন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল,—"'রাখতে পারে'—বলেছি শৈলেনবাবু, মাত্র একটা সম্ভাবনার কথা 'রেখেছে'—একথা তো বলিনি। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। আমারও ভুল দেখুন—আপনাকে বসতেই বলা হয়নি।··বসুন আপনি, দাঁড়িয়ে কেন?"

একটু হাসিয়া বলিলাম, "না, বসার বিপদ এই যে, বসলেই দাঁড়াতে একটু দেরি লাগে, আমার সময় খুব অল্প। থাক্, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলতে এসেছি—এই সম্ভাবনার কথা—অর্থাৎ সরমা দেবীকে অন্য নজরে দেখা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়তে পারে একদিন। সেই সম্ভাবনার মূলই আমি নষ্ট ক'রে দিতে চাই। আপনারা আমার প্রতি অশেষ দয়া দেখিয়েছেন। এখন আমি যাতে আপনাদের অনুগ্রহের এবং আতিথেয়তার অপমান না ক'রে বসি, সেই জন্যে বিদায় নিতে এসেছি। তরুর একটু ক্ষতি হবে, লোক ঠিক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু আমি আর কোনমতেই দেরী করতে পারছি না। এক কথায় রাখতেও আপনার দয়া প্রকাশ পেয়েছিল, যাবার সময় ঠিক সেই দয়াটুকু আবার দেখাতে হবে। আমায় আজই ছেড়ে দিন···।"

১৯

শেষের দিকে আমার কথা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের চাপা ভয়ে, বিস্ময়ে, আবেগে মীরার মুখের চেহারা প্রতিমুহূর্তেই কি এক যেন অদ্ভুত রকম হইয়া উঠিতেছিল। অন্তরে অন্তরে সে অতিরিক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, আমায় শেষ করিতে না দিয়াই সে প্রশ্ন করিল, "আপনি যাবেন?—সে কি?—যাবেন কেন?—যাবার কথা কি হয়েছে এমন···"

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মীরা সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমার সংযম

হারাইবার কোন বালাই নাই, আমি আজ দ্রষ্টা মাত্র, দেখিতেছি। বুঝিতেছি মীরা একটা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছে—সে বুঝিতেছে নিজেকে সংযত করা দরকার, সাধারণ অনুরোধের চেয়ে একটা কথাও বেশি বলা তাহার শোভা পায় না, মুখচোখে তাহার একটা অবহেলা বা নির্লিপ্ততার ভাব থাকা দরকার—একজন মাস্টার যাইতে চাহিতেছে, একবার মুখে বলা থাকিবার কথা—একটা মামুলী, মৌখিক ভদ্রতা, তাহার পরও যাইতে চাহে, যাক। আবার শত শত মাস্টারের দরখাস্ত পড়িবে।

কিন্তু এই নিতান্ত দরকারী ভাবটা—কথায় এবং চেহারায় মীরা কোনমতে আনিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ ওর চেয়েও একটা ঢের বড় প্রয়োজন আছে, মীরার সমস্ত সত্তার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ,—অর্থাৎ আমার এখানে থাকাটা।…মীরা যে এতদূর আগাইয়া গিয়াছে আমার এই বিদায় ভিক্ষার পূর্বে সে জানিত না, আবিষ্কার করিয়া যেন অসহায়ভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আমিও এতটা জানিতাম না। কিন্তু আমি অবিচ্ছেদের জন্য শঙ্কিত নই, মুক্তি আমায় ডাক দিয়াছে, আমি সাড়া দিয়াছি।

ভালবাসা দুর্বল আমার?—তাহাতে খাদ আছে?—তা সে কথা তো গোড়াতেই স্বীকার করিয়াছি যে পুরুষের ভালবাসা মেয়েদের ভালবাসার শতাংশের একাংশও নয়।

আমি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠেই বলিলাম, "আমায় যেতেই হবে মীরা দেবী।"

মীরা স্থির নেত্রে আমার মুখের পানে চাহিল, প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও একটু দুর্বলতা আছে কিনা আমার মুখের রেখায় তাহার অনুসন্ধান করিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "না, যাওয়া আপনার হ'তেই পারে না শৈলেনবাবু।"

প্রশ্ন করিলাম "কেন?"

মীরা একটু চিন্তা করিল, তাহার পর কৌচে হেলিয়া পড়িল; আঁচলের একটা কোণ ধীরে ধীরে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "কেন? ‥কেন?…আপনি যাবেনই বা কেন তাও তো বুঝছি না।"

বলিলাম, "বললাম তো সব কথা।"

"কি কথা?…ও, হ্যাঁ, কিন্তু সে সম্বন্ধে তো বললাম আপনাকে।"

"কি বললেন?"

মীরা বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে।

একটু চুপ করিয়া রহিল, কপালের চুল চারিটি আঙুল দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে লাগিল, তাহার পরে খোঁজ করিতে করিতে কথাটা হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিল, "বাঃ, বললাম না যে ওটা খালি সম্ভাবনার কথা বলছিলাম? আপনি এত শীগ্‌গির ভোলেন!"—শেষের কথাটুকু বলিল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া।

আমি বলিলাম, "তার উত্তরও তো আমি দিয়েছি,—অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে বলেই—একটা অমার্জনীয় অপরাধ ক'রে ফেলা সম্ভব বলেই আমার যাওয়ার দরকার

এ-জায়গা থেকে।…মীরা দেবী বিশ্বাস করুন সরমা দেবী সম্বন্ধে একটু কথা বলতেও, ওঁকে নিয়ে এ-ধরনের আলোচনা করতেও আমি অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি……আমায় ছেড়ে দিন।"

মীরা নিরাশ ভাবে এলাইয়া পড়িল; তাহার পর ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বরে নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যাবেনই? তা বেশ।"

পরক্ষণেই তাহার যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বনের কথা মনে পড়িয়া গেল, আবার হাসিবার প্রয়াস করিয়া বলিল, "বেশ, আমার আপত্তি নেই শৈলেনবাবু, আপনি যেতে চাইছেন, কেনই বা থাকবে আপত্তি? তরু কিন্তু আপনাকে কখনই ছাড়বে না। পারেন তো যান আপনি, আমার কোনই আপত্তি নেই। একেবারেই না।"

বুঝিলাম তরু যে আমায় রুখিবেই তাহার প্রেরণাটা কোথা থেকে পাইবে সে। আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ, সেই কথাই থাক্।"

মীরা আবার একটু দ্বিধায় পড়িল, উহারই মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আপনি রাজি করে নেবেন তরুকে?"

হাসিয়া বলিলাম, "সেটুকু ভরসা আছে বৈ কি!"

"কি ক'রে?"

"আপনার মত বুদ্ধিমতীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে যে কসরতটা হল সেটা কি বৃথা যাবে মীরা দেবী? শক্তি বৃদ্ধি হ'ল তো? তাই দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে আর ভোলাতে পারব না?"—একটু হাসিলাম।

মীরা বলিল, "আপনি ভুল করছেন শৈলেনবাবু, তার শক্তি ভালবাসায়, স্নেহে, সেখানে আপনার হারতেই হবে।"

হাসিয়া বলিলাম, "ওই ভালবাসাই তো জোর আমার মীরা দেবী। ওর দোহাই দিয়েই তো জিতব আমি।"

"কি রকম?"

"বলব—তোমার মাস্টারমশাইকে এত ভালবাস তরু, তবু তাকে আটকে রাখতে চাইছ?—বাঁধার ভয়ে সে নিজে কাতর হচ্ছে জেনেও?"

নিজেকে হাজার সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াও আমি কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। তরুর নাম করিয়া মীরাকে আমার মর্মের কথাটা যাইবার পূর্বে একবার শুনাইয়া দিবার লোভটা কোনমতেই সম্বরণ করা গেল না, বলার মিষ্টতাটুকু থেকে রসনাকে বঞ্চিত করিতে পারিলাম না।…সত্যিই তো; ওরই বাঁধনের তো ভয়—এত গ্লানি মাথায় করিয়াও যে বাঁধন কাটা দুষ্কর হইয়া পড়ে।…কিন্তু আজও অনুতাপ হয়, নিজের সাধ মিটাইতে গিয়া সেই প্রথম আমি মীরার চক্ষে জল টানিয়া আনি।

অনুতাপের পাশে পাশে এও ভাবি—ঐটুকুই আমার সম্বল—এ অশ্রুবিন্দুর স্মৃতি-

টুকু, না হইলে কি লইয়া বাঁচিতাম ?

মীরার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। টলটলে দুই বিন্দু জল, ঘরের চারদিকে সবুজের আভা পড়িয়া দুইটি মরকতের মত দেখাইতেছে। মনটা আমার বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল—কেন বলিতে গেলাম কথাটা ? দরকার কি বাঁধন ছিঁড়িবার ? এই বাঁধনেই বাঁধা থাকি না চিরদিন ··

"মীরা দেবী···"—বলিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম, এখন ঠিক গুছাইয়া মনে পড়িতেছে না। মীরা চোখের জলে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাড়াতাড়ি এ-পর্বটা শেষ করিবার জন্যই যেন বলিল, "আপনি যাবেনই। সত্যিই তো, যেতে চাইলে তরুর সাধ্য কি বাঁধে ”

কথাটা আটকাইয়া গেল।

মীরার কৌচের পিছনে খোলা জানালা দিয়া এক ঝলক হাওয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর থেকে গোটা দুই-তিন পাতলা কাগজের টুকরা উড়াইয়া দিল। মীরা বাঁচিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিবার জন্য আমার দিকে পিছন ফিরিয়া গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুর লজ্জা গোপন করিতেছে মীরা। জানালা বন্ধ কবিবার কোনই প্রয়োজন নাই, ঘরের গুমট ভাঙিতে ঐ রকম কয়েক ঝলক হাওয়াই দরকার বরং। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া জানালার পাল্লা দুইটা টানিতে টানিতে বলিল, "আমি শুধু এই জন্যে বলছিলাম যে আমার মনে একটা চির জন্মের মত খেদ থেকে যাবে।"

কিসের খেদ ? যাইবার সময়, চোখাচোখি না হইয়া থাকিবার এই সুযোগে মীরা কি মন উজাড় করিয়া আমাকে তাহার অন্তরতম কথাটি বলিবে ? এমন হয়। যখন সব সম্বন্ধ ফুরাইয়া আসে তখন পরম সম্বন্ধের কথাটা বলা যায়। একটু উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, "খেদ কিসের ?"

জানালা বন্ধ করিতে অত বিলম্ব হয় না, আসল কথা, মীরা নিজেকে, নিজের অবুঝ অশ্রুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না , এখন ধারায় নামিয়াছে কিনা তাহাই বা কে জানে ? একটা পাল্লা আবার একটু বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "আপনি রূঢ় ব্যবহার পেলেন আমার কাছ থেকে, তাই···কাল তারপর চিঠি ··"

আবার থামিয়া গেল, আর যেন ও নিজেকে সামলাইতে পারিতেছে না।

আমিও এবার বোধ হয় সংযম হারাইতাম ; কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে তরুর মোটর আসিয়া থামিল এবং তরু কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া, দু-একটা সিঁড়ি বাদ দিতে দিতেই হুড়হুড় করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

লুকোচুরি সামলাইতে গিয়া আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়া ধরা

পড়িয়া গেলাম, মীরা জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়াছিল, চেষ্টাও করিতেছিল, কিন্তু তরুর পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি পাল্লা দুইটা বাইরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কৌচে আসিয়া বসিল। ভাবিবার চিন্তাইবার পূর্বেই তাহাকে আরও একটা কাজ করিতে হইল, অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু দুইটি মুছিয়া লইতে হইল—নিতান্ত আমার সামনা-সামনিই। আমিও বিষণ্ণতা চাপা দিয়া মুখে হাসির ভাব টানিয়া আনিলাম।

তরু পর্দাটা এক সাপটে সরাইয়া ঘরে আসিয়া পড়িল। আমাকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল, কখনও দেখে নাই আমায় এ-ঘরে; মীরার মুখের পানে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইল, চোখে জল না থাকিলেও পাপড়ি তাহার ভিজা তখনও। আমরা দু-জনই একসঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, "কি তরু?"

মীরা আরও একটু বাড়াইয়া বলিল, "বড় ফুর্তী তোমার দেখছি!"

তরু বর্তমান ভুলিয়া তাহার স্ফূর্তীর কারণের ব্যাপারে গিয়া পড়িল, বলিল, "আমাদের মেজ গুরুমার বিয়ে তাই ··"

আমরা দু-জনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; মীরা বলিল, "তাই এত ফুর্তী? আমরা ভাবলাম তোমার নিজের বিয়ে বুঝি!"

"যাঃ"—বলিয়া তরু ছুটিয়া গিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইল।

মীরা বলিল, "তুমি কি দেবে গুরুমাকে?—এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে এস, ইমানুলকে বলে দেব আমি।"

তরু মুখটা তুলিয়া আবদারের স্বরে বলিল, "আর একটা পদ্য দিতে হবে, হুঁ ··"

মীরা আবার হাসিয়া বলিল, "ও প্রীতি-উপহার! তা তো চাই-ই, না হ'লে বিয়ে পাকাই হবে না তোমার গুরুমার। কিন্তু সে তো মুশ্‌কিল, তোমার মাষ্টারমশাইকে এবার আমাদের ছেড়ে দিতে হবে; কে লিখে দেবে তোমায়?"

তরু বিস্ময়ের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বিদ্রূপের মধ্যে এই গভীর কথাটা বিশ্বাস করিবে কি না বুঝিতে পারিতেছে না। একবার দিদির সিক্ত চোখের পানে চাহিল। মীরা বিব্রত হইয়া মুখ ঘুরাইতে যাইতেছিল, আমি হাসিয়া বলিলাম, "যাতে ছেড়ে না দেন সেই জন্যেই আমি ওঁর দরবার করতে এসেছি তরু: তুমিও বল না আমার হয়ে, তাহ'লে খুব ভাল ক'রে তোমার মেজ গুরুমার বিয়ের প্রীতি-উপহার লিখে দোব'খন—প্রীতি-উপহার তো নয়, শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

কঠিন এক রহস্যের মধ্যে পড়িয়া তরু আবার তাহার দিদির মুখের পানে চাহিল।

মীরা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নত নয়নে আমার কথাগুলা শুনিতেছিল, একবার চকিতে আমার পানে চাহিয়া লইল, তাহার পর তরুর পিঠে দুই-তিনবার হাত বুলাইয়া নিয়া বলিল, "আচ্ছা, হবে না ছাড়া। পদ্যর বন্দোবস্ত হ'ল তো? এবার আগে জামা-জুতো ছাড়গে তরু, যাও।"

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি কখন একটা কুশন চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছি মনে নাই। তরু চলিয়া গেলে আমরা দু-জনেই খানিকক্ষণ নীরবে রহিলাম। একবার চাহিয়া দেখিলাম মীরার মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছে, তরু সেখানে কৌতুকের ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার পর মনে হইতেছে যেন বর্ষার পর স্বচ্ছ আর্দ্র আকাশে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। দু-জনেই বোধ হয় অপেক্ষা করিতেছি কথাটা অপর দিক হইতে উঠুক। মীরাই মুখ খুলিল, প্রশ্ন করিল, "তরুকে কি বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। সত্যিই কি মত বদলালেন ?"

উত্তর করিলাম, "মীরা দেবী, আপনার মনে একটা স্থায়ী খেদ রেখে যাব আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই। তা ভিন্ন যদি এমনই হয় যে, সত্যিই আপনি সন্দেহের ওপর চিঠিটা লিখেছেন, বা ঐ সম্ভাবনাব কথাটা বললেন, তা থেকেই বরং প্রমাণ করি আমি আর যা-ই হই, অত হীনচেতা নই। যেদিক থেকে ভেবে দেখছি, ক্রমে মনে হচ্ছে আমার থাকাটাই যেন সমীচীন—মোর অনারেবল।"

মীরা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "শুধু একটু দুঃখ রইল শৈলেনবাবু যে আপনি থেকে গেলেন বটে, কিন্তু আপনার মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। ওটুকু তুলে ফেলবার উপায় নেই ?"

একটু চুপ করিয়া নিজেই বলিল, "বেশ, এটুকুর জন্যেও আমি কৃতজ্ঞ রইলাম। তার কারণ আপনি গেলে আমার মনে যে আপসোসটা থাকত সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল না, সবচেয়ে বড় চিন্তা এই ছিল যে বাবা আর মার কাছে আমার কোন জবাবদিহি ছিল না। আপনি সেদিক থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন। জানেন তো যাঁদের কাছে অতিরিক্ত আদর পাওয়া যায় তাঁদের কাছে খুব বেশি সাবধানে থাকতে হয়। আমি যে কি বলতাম তাঁদের, ভেবেই সারা হচ্ছিলাম।"

আমি মীরার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম, আবার সেই চতুরা মীরা! প্রথম সুযোগেই ওর অশ্রুজলের ভিতরের কথাটা চাপা দিবে ও,—যেন বাপ-মা কি বলিবেন সেই চিন্তাই ওর আসল চিন্তা। এতক্ষণ যে অশ্রু লুকাইবার জন্য ওকে অত ঘটা করিয়া জানালা বন্ধ করার অভিনয় করিতে হইল, রুদ্ধকণ্ঠে মিনতি করিতে হইল থাকিবার জন্য—তাহার গোড়ায় শুধু ছিল বাবা-মা কি বলিবেন—আর কিছুই না।

একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করিলাম না। মীরার কাছে যখন সব কথা বলিবার অধিকার পাইব সেই সময় একদিন এই কথাটা তুলিয়া ওর প্রবঞ্চনায় ওর চতুরতায় ওকে লজ্জা দিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসা যাইবে। কথাটা স্মৃতির

মণিকৌটায় তুলিয়া রাখিলাম। আপাতত এইটুকুই লাভ যে মীরা চতুরা বলিয়া ওকে আরও ভাল লাগিতেছে।

মীরা বলিল, "আরও একটা উপকার হ'ল শৈলেনবাবু, চিঠির মধ্যে, কিংবা কথাটার মধ্যে যে আমার তরফ থেকে অবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই, আপনি থেকে যাওয়ায় সেটা প্রমাণ করবার যথেষ্ট অবসর পাব।"

অর্থাৎ আমি যে-ভাবে কথাটা বলিলাম, মীরাও সেইভাবে একটা কথা বলিবার লোভটা সামলাইতে পারিল না,—ও-ও প্রমাণ দিবে!

আমার আবার হাসি পাইল। হাজার চতুরা হইলেও মীরা এখানে নিজের কাছেই প্রবঞ্চিত হইতেছে। নিজের মনের নিজেই নাগাল পাইতেছে না। আমায় শত নিরপরাধ বলিয়া জানিলেও যে ওর এ ঈর্ষা থাকিবেই এ-কথা ওকে কি করিয়া বুঝাই?

চেতনা হইল, অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। আমি ওর কথার উপর আর কোন মন্তব্য করিলাম না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "তাহ'লে এখন আমি আসি।"

মীরা কোন কথা বলিল না, ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও কোন মন্তব্য করিলাম না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আসি তাহ'লে।"

বাহির হইয়া আসিলাম।

দেখি রাজু বেয়ারা একতাড়া ডাকের চিঠি লইয়া ভারিক্কে চালেউঠিয়াআসিতেছে। চিঠি সব আগে মীরার কাছে যায়, সেখান থেকে আবার রাজুর মারফত যথাস্থানে বিলি হয়। এখানকার এই সাধারণ নিয়ম। রাজু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেয় না,…এইখানে অন্য চাকরের তুলনায় রাজুর অসাধারণত্ব।—ব্যারিস্টার হইতেছে নিয়মের রক্ষক, সেই ব্যারিস্টারের চাকর হইয়া রাজু নিয়ম ভাঙিবে!

অবশ্য নেহাত সামনে পড়িয়া গেলে আমি কখনও কখনও নিজের চিঠি বাহির করিয়া লই। বলিলাম, "দেখি, আমার কিছু আছে কি না।"

রাজু যেন একটু নিরুপায় হইয়া তাড়াটা দিল।

অনিলের একখানা চিঠি আসিয়াছে।

সৌদামিনী

১

কেন যে এমনটা হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে খামের উপর অনিলের হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার সমস্ত মনে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। হইতে পারে আমার মনটা বর্তমান অবস্থা থেকে কোন দিকে মুক্তির জন্য উন্মুখ, উদগ্র হইয়াছিল বলিয়াই এমনটা হইল।—হঠাৎ অতীতের মধ্যে থেকে একটা স্মৃতির জোয়ার আসিয়া বর্তমান-টাকে যেন ঠেলিয়া কোথায় লইয়া গেল। সেটা এতই অভিভূতকার, যে চিঠিটাও খুলিয়া পড়িতে এক রকম বোধ হয় ভুলিয়াই গেলাম। সিঁড়িটা যেখানে উপরে আসিয়া শেষ হইয়াছে তাহার সামনেই ছোট্ট একটি বারান্দা, বাহিরের দিকটা খোলা, নীচে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢালাই করা লোহার রেলিং।

আমি মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম, সরিয়া গিয়া রেলিঙে ভর দিয়া সেইখানে, বাহিরে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া দাঁড়াইলাম।

নীচে, বাঁ-দিকে বাগনটা দেখা যাইতেছে। কাল বিকাল থেকে এ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে, মনে হইতেছে কত দিন বাগানটাকে দেখি নাই, যেন কত যুগ! নূতন হইয়া আজ হঠাৎ আমার সামনে আসিয়াছে।··বাগান ছাড়াইয়া রাস্তা ছাড়াইয়া রাস্তার ওপারে বাড়ি ছাড়াইয়া দৃষ্টি উর্ধ্বে উঠিল; মনটাকে লইয়া উঠিতেছে—বাড়ির পিছনে কতকগুলো গাছের জটলা, তাহারই মাঝখান থেকে গোটাতিনেক নারিকেল গাছ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ পত্রদল সঞ্চাবিত করিয়া আকাশের স্বচ্ছ নীলের গায়ে যেন সবুজের তুলি টানিয়া চলিয়াছে।

আরও দূরে—কালের ও-প্রান্তে জাগিয়া ওঠে সাঁতরা, আমাদের কৈশোরের জীবন লইয়া—বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—বেনে বৌয়েদের দোতলা বাড়ির সামনে তামাটে রঙের পানফলের লতা-বিছান পুকুর—নারিকেলের কাটা গুঁড়িদিয়া তৈয়ারি পিচ্ছিল ঘাট। আমি, অনিল ভালমানুষের মত বসিয়া আছি—একটু দূরে একটা মোটা সজিনা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে, খাটো কাপড় পরা, মাথায় বেড়াবেণী, মুখের ভাবটা আমাদের চেয়েও নির্বিকার।···সদ্গোপদের ছোট বৌ ঘাটে বাসন মাজিতেছে—ওর উঠিয়া যাওয়ার অপেক্ষা—তাহা হইলেই আমরা পানফল-অভিযানে অগ্রসর হই।···পচা পাঁকের একটা গন্ধ উঠিয়া আসিতেছে, কেমন যেন দেশ-দেশ মাখানো গন্ধটা।···ঝক্‌ঝকে বাসনের গোছাটা বাঁ-হাতে করিয়া ঘোমটার রাঙা পাড়টা নাকের ওপর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া, বঙ্কিম ভঙ্গিতে সদ্গোপদের বউ উঠিয়া আসিল। কচি বউ, হদ্দ বছর তের। কি চোদ্দ বয়স।···"বামুন-ঠাকুরেরা এখানে বসে যে?···" অনিলই উত্তর দিল, "এমনই বসে আছি, পুকুরের ধারটা একটু ঠাণ্ডা কিনা।"···বেলা দুপুরের রোদে

মাথার চাঁদি ফাটিতেছে ওদিকে ! সদ্‌গোপদের বউ ঠোঁট চাটিয়া হাসিতেছে।—"ঠাণ্ডা, না পানফল ?—আমি বলে দিতে চলনু জেলেগিন্নিকে।" দুই পা আগাইয়া গিয়া আবার ঘুরিয়া বলিল, "যাই ?—আচ্ছা, যাব না যদি এক কাজ কর।"—আমরা উৎসুকভাবে চাহিয়া আছি ···"কাজ কর মানে যদি আমার জন্যেও খানকতক ঐখানটায় ঐ পাঁকের মধ্যে পুঁতে রাখ—আমার জন্যে মানে ঠাকুরঝির জন্যে—আমি আবার বাসন মাজতে এসবো এক্ষুনি !"

অনিল বলিতেছে, "তুমি আর দুপুরের তাতে আসবে কেন ? সদী লুকিয়ে দিয়ে আসবেখ'ন।" সদ্‌গোপদের বৌয়ের সমস্ত মুখটা কৌতুকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, চোখ ঘুরাইয়া বলিতেছে, "ও, সদুঠাকরুণ বুঝি এর মধ্যে আছেন ? কোথায় তিনি ? তাই তো বলি দুপুরের এমন কড়া তাত, এত ঠাণ্ডা লাগে কিসে !—"

হাসিটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—"না, না ; এইখানেই পুঁতে রেখো ; আমি বলবুনি জেলেগিন্নিকে···"

রাজু বেয়ারা আবার উপরে উঠিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল। পায়ের গতি খুব নিয়ন্ত্রিত—যেন একটা ফৌজী সেপাই। মনটা লিণ্ড্‌সে ক্রেসেন্টে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আবার স্মৃতির বন্যা ! ···অনেক দিন পরের এক দৃশ্য। আকাশ ঘিরিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সন্ধ্যায় অনিলদের বাড়ি আটক হইয়া গেলাম। অনিলের বাবা ছাতার নীচে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উঠিলেন। ছাতা মুড়িতে মুড়িতে বলিতেছেন, "আরম্ভ হ'ল—শনিতে সাত মঙ্গলে তিন,—এখন সাত দিন নিশ্চিন্দি থাক।"···মজা নদীতে বাঁশের পুল এখনও বাঁধা হয় নাই, বোধ হয় কাল থেকেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইবে, অনিলের বাবার "নিশ্চিন্দি" কথাটা আগামী ছয়-সাতটা দিনের একটা স্পষ্ট ছবি যেন ফুটাইয়া তুলিল—ওপারে স্কুল, এপারে আমাদের স্কুল-মুক্ত নিরুদ্বেগ দিনগুলো —মাঝে বর্ষার জলে টইটম্বুর মজা নদী, আর, সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম বর্ষা—চারিদিকে কুল্ কুল্, ঝরঝর—একটা সিক্ত মর্মরধ্বনি—সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার মত একাকার, তারপরেই একেবারে অন্ধকার রাত্রি···

অনিলের বাবা বলিলেন, "শৈল আটকে গেল বুঝি ?"

একটু একটু শীত করিতেছে, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়াছি। অনিল বলিল, "ও বলছে বাড়ি যাবে।" অনিলের মা একটু যেন শিহরিয়া বলিলেন, "রক্ষে কর ! কেন ? খোলা মাঠে পড়ে আছে নাকি ?"

বেশ মনে পড়িতেছে অনিলের মাকে—আধবয়সী মানুষটি, প্রদীপটা বাঁ-হাতে ধরিয়া কথাটা বলিতেছেন—মুখে নথের সোনায় আর পান্না দুইটিতে, শাড়ির চওড়া রাঙা পাড়ে প্রদীপের কম্পমান আলো পড়িয়া ঝলমল করিতেছে···

মজা নদীর ধারে বৈরাগী বাবাজীর আখড়ায় আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—

সঙ্গে তানপুরার একঘেয়ে স্বরের মত বর্ষার আওয়াজটা···ব্যাঙেদের ঐকতানে গায়কদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার অল্প পরেই রাত্রি নিশুতি হইয়া উঠিল।

একই ভাবে আছি দাঁড়াইয়া। এক-একবার নিজেকে অনুভব করিতেছি, আবার স্মৃতির আলোড়নে যাইতেছি তলাইয়া; কত ছোট-বড় ঘটনার টুকরা-টাকরা স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে।—

সাঁতরার বসত একরকম তুলিয়া আমরা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছি। আবার আসিয়াছি অনিলের বিবাহের বছর-দেড়েক পরে, ওর বৌ যখন ঘর করিতে আসিয়াছে! বিবাহের সময়টা আমার পরীক্ষা ছিল, তখন আসিতে পারি নাই, অর্থাৎ সাঁতরাকে দেখিতেছি আবার ঠিক সাত বছর পরে। দেশটাকে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে, কতকটা প্রবাসের বিরহের জন্যও, আর কতকটা কি বলিব?—যৌবনের নবীভূত দৃষ্টিভঙ্গি?—বাস্তা, ঘাট, পুকুর, মাঠের সঙ্গে পুরানো স্মৃতির ছোপছাপ লাগিয়া আছে।

সতের বছরও পূর্ণ হইবার আগেই অনিলের বিবাহ হয়। দুই বৎসর হইল এণ্টান্স পাস করিয়া জেলা কোর্টে চাকরি করিতেছে। দশ টাকা জলপানি পাইয়াছিল, বাপ পক্ষাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ায় জলপানিটা কাজে আসিল না। পত্র লিখিয়াছিল, "শৈলেন, বিধাতা একটু রসিকতাপ্রিয় বলে আমাদের শাস্ত্রে তাঁকে পিতামহ বলে কল্পনা করা হয়েছে—আমাব পড়া বন্ধ করার বন্দোবস্ত ক'রে দশ টাকা জলপানি পাইয়ে দিলেন।"

ষোল-সতের বছরে বিবাহ আমরা—পশ্চিমের দিকেব বাঙালীরা—কল্পনায়ও আনিতে পারিনা, আমার বন্ধু সেই অনিলকে বিবাহিত দেখিয়া আশ্চর্য বোধ হইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি বয়সের অনুপাতে ও ঢের বেশি উপযোগী। বৈবাহিক রহস্য লইয়া এমন অনেক কথা বলিল যাহা শুনিতে প্রথমটা আমায় রাঙিয়া উঠিতে হইল! অনিল হাসিয়া বলিল, "তুই জেণ্টল্ম্যান্ হ'য়ে গেছিস শৈল, বিপদে ফেললি দেখছি, তোকে আবার মানুষ ক'রে নিতে সময় নেবে। পশ্চিমের শুকনো হাওয়ায় তোরা সব বোদা হ'য়ে যাস···"

সেই প্রথম দিনের কথা। সকালে গল্পচ্ছলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীর কথা তুলিলাম। ওদের বাড়ির বাহিরে রকে বসিয়া আমাদের কথা হইতেছে। অনিল কেমন একটা মলিন হাসি হাসিল, বলিল, "ভাই সদুর কথা না তুলে পারলিনি? আমাদের বিয়ের কথা তো বলেইছি তোকে কয়েকবার যে, আমাদের মত তাকিয়ায় হেলান-দেওয়া জাতের পক্ষে বৌ জিনিসটা, গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাকের মত, সেজে দেয় অভি ভাবকেরা! নিজের পছন্দয় রোমান্স ক'রে সংগ্রহ করা নয়···"

সামনের রাস্তায় দুইটা মোটরে আর একটু হইলেই ধাক্কা লাগিত; খানিকটা বচসা, খানিকটা কথা-কাটাকাটি হইতে স্মৃতিসূত্র আবার ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু

আজ কি হইয়াছে, কলিকাতা আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

একটু চুপ করিয়া আছি আমরা দু-জনে, তারপর অনিল আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিল—চোখে একটা আতুর দৃষ্টি, বলিল, "শৈল, সৌদামিনী পড়ে রইল, তুই তুলে নে তাকে, তুই তো, ভালোবাসতিস, একটু লাজুক ছিলি এই যা…"

রাত্রের ছবিটা খুব স্পষ্ট এখনও।—নিশুতি রাত, অনিল নীচের দুয়ার খুলিয়া আমায় ওপরে তাহার ঘরে লইয়া আসিয়াছে, দিনের বেলায় বৌ দেখাইয়া আশ মেটে নাই ওর। বৌয়ের সামনেই প্রশ্ন করিল, "মুখদেখানি কি দিলি—হৃদয় নাকি?"

ওর বৌ বেচারি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিলাম, "রাসকেল, আড় নেই মুখেতোর! দিলুম একটা জিনিস, একটা নতুন নাম।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কি?—রাস্‌কেলের গিন্নী রাস্‌কেলী? হিংসে হয়, গালা-গালটা ওর ভাগ্যে দিব্যি কাব্য হয়ে গেল।"

বলিলাম, "না, অম্বুরী।"

দু-জনে হাসিয়া উঠিলাম। হাসির ছোঁয়াচ লগিয়া ওর বৌও হাসিয়া আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ দূর ভবিষ্যৎ হইতে দৃষ্টি আসিয়া পড়িল সন্নিহিত বর্তমানে।—

সংসার পরিবর্তিত ওদের। অনিল এখন বাড়ির কর্তা। তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন যুবার যদি সংসারের কর্তা হইতে হয় তো তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও একটা মস্ত বড় পরিবর্তন আসে, কতকটা মেঘভারাক্রান্ত দ্বিপ্রহরের মত। এই কর্তামি আর ডেলিপ্যাসেঞ্জারি মিলাইয়া অনিল যেন অনেকটা বুড়ো হইয়া গিয়াছে। তবুও অনিল, অনিলই। বিশেষ করিয়া আমি গেলে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।—সেই কথায়, ভাবে উচ্ছ্বসিত অনিলকে যেন সামনে দেখিতেছি। আমি গেলে আমাদের যা বাঁধা প্রোগ্রাম,—সমস্ত গ্রাম আর গ্রামের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, —বেনে বৌয়েদের বাড়ির সামনে পুকুরধারটায়, মজা নদীর ধারে ধারে অনন্তপুরের রাস্তা, স্কুলের ধার। একদিনেও ভালবাসি নাই স্কুলটাকে, কিন্তু এখন যে কী চমৎকার লাগিতেছে। ঠিক যেমন পুরানো মাস্টার মশাইদের কাহাকেও দেখিলে প্রীতি আর ভক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠে আজকাল, আগে যাদের যমের মত দেখিতাম।…গা-ঢাকা হইয়া আসিল—আমরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অন্ধকারের মধ্যে, অতীতের অন্ধকারে ডুব দিয়া কি সব জিনিস খুঁজিয় বেড়াইতেছি। সব প্রগল্‌ভতা মৌন হইয়া গিয়াছে, দু-জনেই বুঝিতেছি দু-জনো কোথায় আছে, সেখান থেকে ডাক দিয়া—একে অন্যকে ফিরাইয়া আনিতে মন সরিতেছে না। অবশ্য ভিতরে সঞ্চয় তখন খুব বেশি হইয়া উঠিতেছে, এক একবার

কথাবার্তাও আবেগময় হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবিয়া একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ছেলেবেলাকার বইগুলো এদিকে আর পড়েছিস শৈল ?"

খুব আশ্চর্য হইয়া ওর দিকে চাহিয়া আছি। অনিল বলিতেছে, "প'ড়ে দেখিস। দেয়াল-আলমারির পুরনো বইগুলো গুছোতে গিয়ে সেদিন আমার হাতে একটা 'মনোহর পাঠ' বলে বই পড়ল। অদ্ভুত রে! এমন মিষ্টি লাগছিল! কোথায় লাগে একটা ভাল কাব্য তার কাছে! লেখাগুলোর চারদিকে সমস্ত ছেলেবেলাটা এসে ঘিরে দাঁড়ায় কিনা। বইটাও অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল—কোণগুলোতে আঙুলের দাগ—যেখানে-সেখানে কাঁচা হাতের নাম লেখা। হ্যাঁ, একটা পদ্য—'পুষি আর আমি'।—একটা মেয়ে একটা বিড়ালকে বুকে চেপে রয়েছে, বেশ ছবিটা—বেশ মোটাসোটা গোলগাল মেয়েটা। নীচে পেন্সিলে কি লেখা আন্দাজ কর দিকিন।"

আমি একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিলাম, "সৌদামিনী।"

অনিল বলিল, "অনেকটা আন্দাজ করেছিস, তবে অনিল চৌধুরী চিরকালই সেয়ানা কিনা, অত ধরা-ছোঁয়া দেওয়ার পাত্র নয়। লাল পেন্সিলে লেখা আছে 'সু-দা-ম'। কেউ ধরতে বা ধরিয়ে দিতে পারবে না, নামটা আইনের প্যাঁচ বাঁচিয়ে লিখেছি, এমন কি জাত পর্যন্ত বদলে দিয়েছি—আমাদের সখী সৌদামিনী নয়, একেবারে কৃষ্ণসখা সুদামা!"

মজা নদীর ইউনিয়নবোর্ডের তৈয়ারী-করা পুলের উপর বসিয়া আমাদের অনেক-খানি রাত হইয়া গেল, কিন্তু ঐটুকু কথার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নাই।··· আবার অনিলের উচ্ছ্বাস আসিয়াছে, কি রকম একটা স্বপ্নালু দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া বলিতেছে, "তোর অম্বুরীকে আমাদের এই অংশের জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে শৈল। এক-একবার মনে হয় সায়েব হতাম তো বেশ হ'ত—তুই, আমি, অম্বুরী—একসঙ্গে পাশাপাশি ছেলেবেলাকার জীবনের টুকরো-টাকরা জড় ক'রে বেড়াচ্ছি!···এক-এক সময় মনে হয় ক্রীশ্চান হ'য়ে যাই; কিন্তু তাহ'লে গ্রামছাড়াই করবে সবাই মিলে, আর এ-গ্রাম দিলেও প্রাণ ধরে আমি ছাড়তে পারব না এই তোকে বলে দিলাম শৈল। একে ছেড়ে যে মরতে হবে একদিন এইটুকু মনে হ'য়ে এক-এক সময়ে মনটা উদাস ক'রে দেয়···অম্বুরীটা বেশ শৈল, কিন্তু বড় আদিম। আমাকে, অর্থাৎ ওর পুরুষটিকে কি ক'রে ঠাণ্ডা রাখবে অষ্টপ্রহর ওর এই চিন্তা; সকালে উনুন ধরান থেকে রাত্রে মশারি ফেলার মধ্যে যা কিছু ওর কাজ সবগুলোরই মুখ আমার দিকে। কষ্ট হয়, কি অসহ্য আদাম-ইভের জীবন বল দিকিনি!—ও বসে বসে আমার স্থূল ভোগের জোগাড় ক'রে যাচ্ছে—রান্না থেকে আরম্ভ ক'রে—আর আমি অপৌরুষে ভোগ ক'রে যাচ্ছি!···"

সাঁতরা আবার মিলাইয়া গেল। মীরা গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে, তাহারই

রণন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মীরার স্বর কানে এই প্রথম গেল। মীরার গলা খুব মিষ্ট, তবে স্বরের জ্ঞান নিখুঁত নয়; কিন্তু আশ্চর্য, ভুল স্বরে এমন একটা ছেলেমানুষি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—লাগিতেছে ভারি মিষ্ট।

রকে মাদুরের উপর অনিল, আমি বসিয়া, আমার কোলে অনিলের ছেলেটা, তাহার ঝাঁকড়া মাথার উপর আমার চিবুকটা চাপিয়া বসিয়া আছি। অম্বুরী আমাদের কাপড় কোঁচাইতেছে, আলনায় তুলিয়া রাখিবে। অনিল বলিতেছে, "ওগো, তুমি একেবারেই 'আমি', নয় যে 'আমি-ধ্যান' 'আমি-জ্ঞান' হ'য়ে রয়েছ, একটু নিজের জীবনটাও আলাদা ক'রে দেখ দিকিন। নারী পুরুষের একখানা পাঁজর খসিয়ে তোয়ের করা জানি; কিন্তু তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখে আমার সব পাঁজরগুলোই খসে পড়তে চাইছে ··আহা, বেচারি!···দেখ, তোমার স্বামী-দেবতার বাইরেও জগৎ আছে, গাড়ু মাজা আর কাপড় কোঁচানোর অতিরিক্তও কাজ আছে পৃথিবীতে···"

অম্বুরী হাঁটুতে চাপিয়া কোঁচান কাপড়টা পাকাইতেছে। হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আমার জন্ম জন্ম এইটকুই বজায় থাক।"

অনিল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "মাফ কর, তাহ'লে এর পরের জন্মেই তুমি দয়া ক'রে অন্য পুরুষ দেখো বাপু, আমায় রেহাই দিও; আমায় আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে যে তুমি শুধু···জন্মের পর জন্ম ··না বাপু, আমি এর মধ্যে নেই, ক্ষ্যামা দাও—"

আমরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিয়াছি, ছোট ছেলেটাও আমার মুখের দিকে ঘুরিয়া চাহিয়া যোগ দিয়াছে, অম্বুরী হাসিয়া উপর গাম্ভীর্য চাপাইয়া আমায় সাক্ষী মানিয়া অনুযোগ করিতেছে, "শুনলে ঠাখুরপো? হিঁদুর ঘরে এ রকম আদাড়ে কথা শুনেছ কখন! কি মানুষ বাপু!—আমি তো বুঝি না···"

২

সেই ছোট বারান্দাটিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি। চক্ষুর সামনে এক-একবার অতিমাত্র স্পষ্ট হইয়া দৃশ্যগুলা জীবনের চাঞ্চল্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এক-একবার মিলাইয়া যাইতেছে—মনটা লিণ্ডসে ক্রেসেণ্টে ফিরিয়া আসিতেছে—সম্মুখে রাস্তা, রাস্তার ওধারে বাড়ির শ্রেণী, তাহার পিছনে গাছের জটলা জমিয়া উঠিতেছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিতেছে; আমি ঠিক এখানকার মানুষ নয়, কলিকাতার নয়, লিণ্ডসে ক্রেসেণ্টের তো একেবারেই নয়।··· কি অসহ্য কাটাছাঁটা, মাপাজোখা ব্যাপার! কি অসহ্য রকম মানানসই করিয়া তৈয়ারী সব! এক ইঞ্চি অপব্যয় নাই, এক ইঞ্চি অতিরিক্ততা নাই—রাস্তাই বল, বাড়িই বল, বাগানই বল, কড়া হিসাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই অসহ্য শুভঙ্করের রাজ্যে মানুষগুলা পর্যন্ত যেন এক-একটা অঙ্ক,

তাহাদের বাঁধা প্রসেস্ বা পদ্ধতির মধ্য দিয়া এক-একটা অমোঘ পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক চুল এদিক-ওদিক হইলে অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে। রাজু বেয়ারা পর্যন্ত যেন একটা এ্যালজেব্রার ফরমুলা। সামনে দিয়া দোল-উৎসব গেল, আশা করিয়াছিলাম অন্তত বেহারী চাকরটা আউট্‌হাউসে ভুলিয়াও একটা ছাপরেয়ে তান্ ধরিয়া বসিবে। কিছু করিল না;—সমীচীনতার তাসের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে যে!

মিস্টার রায় চমৎকার, অপর্ণা দেবী আরও চমৎকার—কিন্তু এখন অনুভব করিতেছি আমার সঙ্গে মিল নাই; শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেন মনে হইতেছে অনেক দূর থেকে।···সব চেয়ে আত্মীয়া মীরা—তাহার প্রাণের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে বসিয়াছি, কিন্তু কোথায় তাহার প্রাণ?—আছে কি? পাওয়া যাইবে কি কখনও? এই কি ভাল-বাসিতেছি? না, খুব বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকে লেখা একটা উপন্যাস পড়িয়া যাইতেছি মাত্র? অশ্রুবিন্দুটি পর্যন্ত যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই—যেখানে দুইটি মানায় সেখানে তিনটি বিন্দু গড়াইয়া পড়িবে না।

এর চেয়ে সেই চিত্র—সদ্য পানফল চাহিয়াছে, ঠিক-দুপুরের সূর্যের অভিশাপকে আশীর্বাদ করিয়া লইয়া আমি আর অনিল দু-জনে বসিয়া আছি, যদি ধরা পড়ি কপালে আছে তারিণী জেলের লগুড়। কি রকম স্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ একটা ব্যাপার, একদিকে কত বড় উল্লাস আর অপর দিকে কি ভীষণ পরিণাম! রাজকন্যার জন্য সোনার গাছে মুক্তার ফল আহরণ করিবার অভিযান থেকে কিসে কম?

না, হে ভগবান, আমায় ঐ রকম করিয়া ভালবাসিতে দাও, তাহাতে আসুক মুক্তি, আসুক প্রসার। অম্বুরীর মত, আমাকেও যে ভালবাসিবে তাহার প্রাণে একটা খুব বড় রকম মিথ্যার বাহুল্য থাকুক,—সে আমায় বলুক জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সে আমার সামান্য খুঁটিনাটির দিকে পর্যন্ত চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর আমি মুগ্ধ বিশ্বাসে সেই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুকে ধরিয়া রাখি।

অনেকক্ষণ পরে চিন্তায় একটা অবসাদ আসিল। কলিকাতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থির চিন্তার দ্বারা মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন্ ঊর্ধ্বলোকে যেন উঠিয়া গিয়াছি, ধীরে ধীরে আবার নামিয়া কঠিন মাটির স্পর্শ অনুভব করিলাম। অনিলের হাতের লেখাটা পুরানো স্মৃতিকে ঘাঁটাইয়া মনটাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।···না, এটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা নয়। মন আমার শান্ত হউক; যেন রূঢ়-সত্য এই জীবনের দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পারিবার শক্তি না হারাই। আমার এখান থেকে যাইলে চলিবে না এখন। কলিকাতাও সত্য, মীরাদের দেওয়া টাকাটা আরও সত্য। ভাগ্যে মীরাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা কাটাইয়া দিয়া আসি নাই। আমি আজ একজন উদীয়মান ছাত্র, আমার

আলোচনা ছাত্র-মহলের একটা বড় প্রসঙ্গ, প্রফেসাররা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মীরার দেওয়া এই টুইশনই ত সবার মূলে।

আশ্চর্য, অনিলের চিঠিটা এখনও পড়াই হয় নাই ; এত ছবি, এত কথা মনে ভিড় করিয়া আসিলই বা কোথা হইতে ?

খাম খুলিয়া চিঠিটা পড়িলাম।

অনিলের লেখা ঠিকানায় একটু ভুল ছিল। লিণ্ড্‌সে ষ্ট্রীট লেখা ছিল, তিনদিন ঘুরিয়াছে চিঠিটা। এখানে ঐ ব্যাপার লইয়া বেশ একটু গোলমাল হয় মাঝে মাঝে। লিণ্ডসে ষ্ট্রিট আছে, লিণ্ড্‌সে ক্রেসেণ্ট্‌ আছে, আবার লিণ্ড্‌সে হাউস বলিয়া বড় একটা কারখানা আছে, সেখানে একবাব ঢুকিলে তাহাদের নানা ডিপার্টমেণ্ট ঘুরিতেই কখন কখন চিঠির দুইটা দিন কাটিয়া যায়। ব্যাপারটা আগে আমি জানিতাম না। সবে কাল রাত্রে আহারের সময় মিস্টার রায়ের একটা চিঠি গোলমালের প্রসঙ্গে আমার সামনে 'কথাটার প্রথম আলোচনা হইল। আমি এখানে আসিয়া অবধি তিনখানা পত্র দেওয়ার পর অনিলের পত্র পাইয়াছি। রহস্যটা পরিষ্কার হইল।

অনিল অত্যন্ত চটিয়াছে। আমার প্রথম পত্রের উত্তরও দিয়াছিল, দুইখানি। দ্বিতীয় চিঠি ও পায় নাই, আদৌ বিশ্বাস করে না যে আমি লিখিয়াছি—একটা ভাঁওতা আমার। তৃতীয় পত্র পাইয়াছে, কিন্তু এই দুইখানি পত্রের কোনখানিতেই ঠিকানা দেওয়া নাই। প্রথম দুইখানি চিঠি ও আমার আগেকার বাসাব ঠিকানায় দিয়াছিল, আশা করিয়াছিল সেখান থেকে রিডাইরেক্টেড হইয়া আমার হাতে পৌঁছিবে। আমার পত্র পাইয়া বুঝিল পৌঁছায় নাই। আমার পুরোনো বাসায় লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পত্র দিল। কর্তাকে পত্র দিয়াছিল, তিনি ছেলেদের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া পাঠাইয়াছেন, লিখিয়াছেন ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।

নূতন জায়গায় গিয়া ঠিকানা না দিয়া পত্র দেয় এমন লোকের মস্তিক নিজের ঠিকানায় আছে কি না অনিল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। একটি মাত্র ছাত্রী পড়ানয় আরাম আছে স্বীকার করে অনিল, কিন্তু একটা কথা—যখন প্রতিদিন গড়পড়তা দশটি বারোটি করিয়া ছেলেমেয়ে পড়াইয়াছি তখন আমার চিঠি পড়িয়া কখনও মারাত্মক রকম ভ্রান্তি বা জটিলতার সন্ধান পায় নাই। চিন্তিত আছে,—একটু সন্দিগ্ধভাবে।

অনিলের নিজের অত হিসাব থাকে না, অম্বুরী খুকির জন্মতারিখ হইতে গুনিয়া বলিতেছে, ঠিক ছ-মাস সতের দিন আমি সাঁতরামুখো হই নাই। এই ছ-মাস সতের দিনে আমার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে—আমাকে আর ওদের কাছে যাইতে বলা চলে কি না অনিল ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না, তাই শুধু অবস্থাটা জানাইয়া দিল মাত্র।

ওর ছেলের কথা লিখিয়াছে ; বয়সের অতিরিক্ত পাকা হইয়া উঠিতেছে। এদিকে

জিভের আড়টা এখনও ভাঙে নাই, ট-বর্গের উপর পক্ষপাতিত্ব বেশি। সবচেয়ে দুর্বোধ্য ওর ব্যাকরণটা,—'ক' উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু 'কাকা' বলিতে পারে না। আমার প্রসঙ্গ উঠিলে বলে 'শৈল টাকা'। এ শব্দতত্ত্বের রহস্য ভেদ করিবার জন্য আর একজন পাণিনির জন্মান দরকার।

অনিলের মা এমনই ভাল আছেন, তবে কানটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

চিঠিটা মুঠোর মধ্যে লইয়া আবার বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলাম। মনের কোথায় বিদ্রোহ উঠিয়াছে, আমি প্রাণপণে লিণ্ডসে ক্রেসেন্টের যশোগান করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। মন বসাইবার জন্য সাড়ম্বরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। ঠিক হইয়া গেল ছাড়িব না।

তাহার পর কি করিয়া কি হইল বলিতে পারি না , শুধু বুকের মধ্যে একটা প্রবল ব্যাকুলতা ··একটু মুক্তি দাও আমায়, কলিকাতায় এই ইটের পাঁজার মধ্যে থেকে মুক্তি চাই সাঁতরাব শ্যামল কোলে , অন্তত একটু দেখিবার মুক্তি ·কয়েদী যেমন জানালার গরাদেটা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের খণ্ডিত দৃশ্যের পানে চাহিয়া থাকে।

ফিরিয়া আবাব মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। মুঠার মধ্যে কপালটা চাপিয়া সামান্য একটু চিন্তা করিলাম, তাহার পর প্রবেশের অনুমতি চাহিব, কণ্ঠস্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল। পরিষ্কার করিতে গিয়া একটু শব্দ হইতেই মীরা ডাকিল,"কে? এস।"

মীরা জানালার গরাদে হাত দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া আমায় দেখিয়া অপ্রতিভ আর বিস্মিত হইয়া যেন হঠাৎ কেমনধারা হইয়া গেল। ওর ডাকিবার ভাষাতেই বুঝিয়াছিলাম, এবারেও আমি আসিতেছি ভাবিতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কাজটা সারিয়া লইবার জন্য বলিলাম, "আমি ক'টা দিনের ছুটি চাইতে এলাম। একবার ঘুরে আসব, মাস পাঁচেক যাইনি।"

মীরা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না একটা প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে। স্থির কতকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "এই বললেন যে থেকে যাবেন, এর মধ্যেই কি হ'ল আবার?"

বেশ মজার ব্যাপার। মীরা আমায় অপ্রকৃতিস্থ ভাবিতেছে বোধ হয়, অথচ তাহার নিজের কথাই প্রকৃতিস্থ নয়। বলিলাম, "আমি তো ছেড়ে যাবার কথা বলছি না মীরা দেবী—"

"তবে?"

"ক'দিনের ছুটি চাইছি মাত্র।"

"ও! বাড়ি যাবেন?"

"না, বাড়ি আমাদের পশ্চিমে, অল্পেই যাওয়া-আসা চলে না, আমার এক বন্ধুর বাড়ি যাব, কাছেই।"

অনিলের মায়ের কানের কথা লইয়া একটা মিথ্যা রচনা করিয়া ফেলিলাম। "লিখেছে তার মায়ের অবস্থা বড্ড খারাপ, তাই,…"

"ও! তা বেশ, যাবেন। ক'দিনের জন্যে?"—দুর্বলতায় মীরার স্বরটা মনিবের মত হইয়া গেছে, অর্থাৎ ও অধিকারের জোর খাটাইতে চায়।

বলিলাম, "হপ্তাখানেকের জন্যে; ক্ষতি হবে?"

মীরা ধীরে ধীরে বলিল, "বে—শ।…না, ক্ষতি কিসের?"

নামিয়া আসিতেছি, সিঁড়ির মোড় ঘুরিব, মীরা উপর হইতে ডাকিল। দেখি রেলিঙের উপর ভর দিয়া নিম্নমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, "শৈলেনবাবু, একটা কথা…"

আমি দুই ধাপ উঠিয়া আসিয়া বলিলাম, "কি বলুন!"

মীরা একটু মুখটা ঘুরাইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বেশ শান্ত স্থির কণ্ঠে বলিল, "মাপ করবেন, তরুর ক্ষতি হবে বলে কথাটা বাধ্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করতে হ'ল, অনুচিত জেনেও,—মানে আমায় আর টিউটরের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তো? কথা হচ্ছে, অনিশ্চিতের মধ্যে না পড়ে থাকতে হয়—তাই…"

আমার মনটা অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল—এই নিরুপায় নারীকে কি করিয়া বিশ্বাস করাই ওর আশঙ্কা মিথ্যা?

শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, অযথা একটা প্রবঞ্চনা ক'রে যাব আমায় এমন ভাবলেন কেন? আমি যে নিজের তাগিদেই থেকে গেলাম এটা কি আপনি টের পাননি? বলুন?"

"নিজের তাগিদ" যে কোথায় মীরা আশা করি বুঝিল, বুঝিবে বলিয়াই বলা, তবু এর মধ্যে অর্থ-উপার্জনের কথাও যে আসিতে পারে এই সম্ভাবনার সূক্ষ্ম একটা অন্তরাল রহিল।

হয়তো আমার দেখিবার ভুল, কিন্তু মনে হইল মীরার সন্দেহক্লিষ্ট মুখটায় এক মুহূর্তের জন্য আশ্বাসের সঙ্গে লজ্জার একটা ক্ষীণ আভাস খেলিয়া গেল।

৩

মীরার কাছে ছুটি লইয়া নিজের ঘরে আসিয়া আমার একটা মজার কথা মনে পড়িল—আমি মীরার কাছে ছুটি চাহিতে গিয়াছিলাম কেন? মীরা ছুটি দেওয়ার কে? মীরার মা অবশ্য এসব কথার মধ্যে বিশেষ থাকেন না, কিন্তু মিস্টার রায় তো রহিয়াছেন এখন এখানে। না, আমার নিজেরই দোষ, আমি নিজেই মীরাকে মাথায় তুলিয়াছি। ও হুকুম দিবে তবে আমি যাইব! চমৎকার অবস্থা দাঁড় করাইয়াছি তো!

তরু আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী-পাঠশালার শাড়ি ছাড়িয়া লরেটোর জন্য তৈয়ার হইয়াছে—খাটো ইজের, ধবধবে সাদা ফ্রক, বাঁ ঘাড়ের কাছে একটা আসমানি রঙের সিল্কের ফুল ; এতক্ষণ ঘাড়ের উপর অর্ধ-চন্দ্রাকারে বেড়া-বেণী ছিল, খুলিয়া দিয়াছে, এখন পিঠের দুই প্রান্তে দুইটি সুরচিত বেণী দুলিতেছে ; প্রান্তভাগে চওড়া রাঙা-ফিতার তৈয়ারি ফুল। পায়ে মোজা আর স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো।

গতিটাও বদলাইয়া গেছে। জুতা ঘষিতে ঘষিতে কতকটা লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল, "দিদি দিলে ছুটি মাস্টারমশাই, কিন্তু আমার পদ্য না লিখে দিলে বলব বন্ধ ক'রে দিতে।"

টাটকা এই চিন্তাই করিতেছিলাম বলিয়া কথাটা অত্যন্ত তিক্ত লাগিল। "তোমার দিদি কি আমার···?"—বলিয়া থামিয়া গেলাম। বলিতে যাইতেছিলাম, "তোমার দিদি কি আমার দণ্ড-মুণ্ডের মালিক নাকি যে তিনি ছুটি দিলে তবে আমি যাব?,'

ঠিক সময়েই হুঁশ হইল যে, ছেলেমানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করা বড় বেমানান হইবে। হাসিয়া কথাটাকে হাল্কা করিয়া দিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি কি তোমার মাস্টারমশায়ের মাস্টারমশাই নাকি যে ছুটি দেবেন আমায়?"

তরু প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মুখের পরিবর্তিত ভাবে আবার আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বাঃ, তবে যে দিদি বললেন—তরু, তোমার মাস্টার-মশাই ছুটি নিয়ে গেছেন, কিন্তু পদ্যটা না লেখা পর্যন্ত ছেড় না যেন?"

আমার মুখটা আবার বোধ হয় একটু গম্ভীর হইয়া গিয়া থাকিবে, আবার সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আসল জায়গায় ছুটি নেওয়া তো বাকিই আছে, তোমার বাবাকে, তোমার মাকে বলতে হবে না।"

তরু যেন একটু ফাঁপরে পড়িয়াছে, একটা বেণী সামনে ঘুরাইয়া আনিয়া তার ফুলটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সাহস দেওয়ার ভঙ্গিতে আমায় বলিল, "সে আর আপনাকে ভয় করতে হবে না মাস্টারমশাই, দিদি যা বলবেন তা বাবাও কাটবেন না, মা তো নয়ই। দিদির কাছে যখন ছুটি পেয়েছেন, তখন আর আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

আমার কথার এ রকম উল্টা পরিণতি দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত হাসি পাইল। হাজার চেষ্টা করিয়াও মীরাকে তাহার কর্ত্রীত্বের আসন থেকে নামাইতে পারিতেছি না, যেন বনেদী হইয়া গিয়াছে। আমি চক্ষু দুইটা বড় করিয়া বলিলাম, "ও বাব্বা! তোমার দিদি এত বড় মহাপুরুষ ;—জানতাম না তো আমি। তা বেশ, চল তোমার মার কাছে, বরং বলা যাবে'খন—হাইকোর্টের ছাড়পত্র পেয়েছি, তুমি বরং বেশ সাক্ষীও দিতে পারবে, চল।"

তরু হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে আমার আগমন-বার্তা জানাইতে লঘুগতিতে

আগাইয়া গেল।

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখি তিনি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। উপস্থিত হইতেই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও অগ্রদূত পাঠিয়ে দেখা করতে আসবে শৈলেন? চল, ভেতরে চল।"

নিজে প্রবেশ করিয়া পর্দাটা বাঁ-হাতে তুলিয়া বলিলেন, "এস।"

আমিও পর্দাটা ধরিয়া লজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলাম। এই ছোটখাট সৌজন্যে এত অপ্রস্তুত করিয়া দেন উনি। প্রবেশের সময় পর্দা তুলিয়া ধরিবেন, আহারের সময় জলের গেলাসটা বোধ হয় সামান্য একটু দূরে পড়িয়াছে, উঠিয়া আগাইয়া দিয়া আসিবেন, মোটর থেকে যদি আগে নামেন, দোরটা টানিয়া ধরিয়া প্রতীক্ষাও করিয়াছেন। অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু ব্যতিক্রম হইবার যো নাই! বলেন, "এগুলো ভদ্রতা বা কার্টসি নয় শৈলেন, এগুলো ছোটখাট সেবা, শিভ্যাল্‌রির নাম নিয়ে আমরা আজকাল তোমাদের কাছ থেকে এগুলো আদায় করছি, কিন্তু আসলে এগুলো আমাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য।"

আপত্তিস্বরূপ কিছু বলিবার পূর্বে উত্তর পাইয়াছি, "না হ'লে মা বোনের জাত বলে আমাদের গুমোর বাড়াও কেন? আমরা যদি পাই এতে তৃপ্তি…"

হাসিয়া বলিয়াছি, "আমাদের লজ্জা দিয়ে তৃপ্তি পাবেন?"

জবাব পাইয়াছি, "আমরা তৃপ্তি পেলে লজ্জাটা না হয় সয়ে নিলে একটু।"

আর ওঁকে কিছু বলি না।

আমি প্রবেশ করিলে পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বস এইটাতে।"

নিজে টেবিলের সামনে একটা হেলান-চেয়ারে বসিলেন।

প্রসঙ্গের জের ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "মায়ের কাছে যে নোটিস দিয়ে আসতে হয় না আপনার বুড়ো ছেলে এ-কথাটা জানে, এই সায়েবী কায়দার জন্যে একজন লরেটোর ছাত্রী দায়ী"—বলিয়া সহাস্যদৃষ্টিতে তরুর দিকে চাহিলাম।

তরু অপর্ণা দেবীর গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণা দেবী যে আগ্রহ সহকারে দুই পা বাহিরে গিয়া আমায় লইয়া আসিয়াছেন এটা বোধ হয় ওর খুব মনে ধরিয়াছিল, ওর মাস্টারমশাইয়ের বেশ খাতির হয় এটা ও মনেপ্রাণে চায়। বলিল, "বা রে! না আগে থাকতে বললে মা উঠে এগিয়ে যেতে পারতেন?"

আমি বলিলাম, "তাই তো, বসে বসে কি মা হওয়া চলে? দেখুন তো!"

দু-জনেই হাসিয়া উঠিতে তরু লজ্জিতভাবে মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া বলিল—"যান্।"

ঘরের মধ্যে আর একটা মানুষ ছিল, সেই ভুটানী। পার্টির দিন সে খানিকক্ষণ

গাড়ি-বারান্দায় আসিয়া তামাশা দেখিতেছিল ; সেই দিনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার চেহারা আর পোশাক—বিশেষ, পোশাকে পরিবর্তন হইয়াছে। ঘরের একটা কোণের দিকে একটা আরাম-চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিল।' হাতে একটা স্ফটিকের মালা, সামনে একটা নীচু টেবিলে পিতলের বেশ একটি মাঝারি সাইজের বুদ্ধমূর্তি। বৃদ্ধা বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের হাসির শব্দে নড়িয়া চড়িয়া উঠিতে যাইতেছিল, অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া বুকের কাছে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "বৈঠো! ক্যা হায়, বুড্হী মাই ?"

বুড়ী বিহ্বলভাবে তাহার ছানিপড়া চক্ষু তুলিয়া অপর্ণা দেবীর মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল। কি যেন একটা গোলমাল হইয়া গেছে। তাহার পর মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া কপালের উপরে গোটাকতক টোকা মারিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না···বেটা, বেটা···"

অপর্ণা দেবী তাহার কপালে বাঁ-হাতটা বুলাইয়া বলিলেন, "বেটা আবেগা। বুদ্ধ্য বুদ্ধ্য বোলো।"

ভুটানী স্ফটিকের মালাসুদ্ধ হাতটা ধীরে ধীরে আগাইয়া বুদ্ধমূর্তি স্পর্শ করিয়া আবার হাতটা কোলের মধ্যে ঠানিয়া লইয়া মালা জপিতে লাগিল। একটু পরে ধীরে ধীরে দুইটি ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁপা ঠোঁটে খুব অস্পষ্টভাবে কি গোটা কতক দ্রুত উচ্চারণ করিয়া যেন আবেগটা আবার সামলাইয়া লইল।

অপর্ণা দেবী আসিয়া আবার উপবেশন করিলে প্রশ্ন করিলাম, "কেমন আছে আজকাল ?"

বলিলেন, "ঠিক বোঝা যাচ্ছেন না। ঐ বুদ্ধমূর্তিটা আনিয়ে দিয়েছি, চেষ্টা করছি মনটা ধর্মের দিকে আকর্ষণ করবার ! কতটা কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এইটে লক্ষ্য করেছি, বাইরে বাইরে ততটা উতলা ভাব নেই, চুপ করে জপ নিয়েই থাকে যেন। তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লে পরে কখন কখন ঐ রকম ক'রে ওঠে, বিশেষ ক'রে কারুর পায়ের শব্দে বা অন্য রকম ভাবে যদি টের পায় কেউ ভেতরে এসেছে। এদিক দিয়ে ওর অনুভূতিটা আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ, প্রায় অসম্ভব রকম। সেটাকে ওর সিক্স্থ্ সেন্স বা তৃতীয় নয়ন বলা চলে। এই এত মোটা কার্পেট দিয়েছি ঘরে তো ? ও ঠিক টের পাবে কেউ এলে। জেগে থাকলে হঠাৎ একটু সতর্ক হ'য়ে ওঠে, তখনি বুঝতে পেরে আবার কতকটা নিরাশ হ'য়ে মালা জপতে সুরু ক'রে দেয়। কিন্তু যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে তাহ'লেই গোলমাল ঐ যে কপালে হাত দিয়ে 'বেটা-বেটা' করলে, ওর মানে স্বপ্ন দেখছিল ব্যাটা এসেছে। ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না ;— বাস্তবের দিকের ঐ পায়ের শব্দটুকু নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন মগজের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। বড্ড ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে,

স্বপ্নের মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে কিনা…।”

প্রশ্নটা করিলাম, “মনটা ক্রমে ক্রমে পুরোপুরি ধর্মের দিকে এসে পড়েছে বলে আশা করেন কি?”

প্রশ্নটা আমার করা উচিত হয় নাই। ঠিক এই রকমেরই একটা পরীক্ষা যে তাঁহার নিজের জীবনে চলিতেছে সেটা আমার টের পওয়া উচিত ছিল। অপর্ণা দেবী জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খানিকটা যেন আত্মস্থ হইয়া রহিলেন, পরে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, “কি বলছিলে? ও! ঠিক বলতে পারি না, তুমি সাইকলজির ছাত্র, জানই তো মনের গতি বড় অদ্ভুত—যাকে বলা যায় ইনস্ক্রুটেব্‌ল। যখন ভাবা যাচ্ছে বর্হিমুখী হ'য়ে সে কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় করেছে, আসলে তখন হয়তো নিজের চিন্তা নিয়ে নিজের অতলে ডুবে যাচ্ছে। ভুটানীর ব্যাপারে যদি তাই হয়তো বড় সাংঘাতিক, তাহ'লে ওর আর বেশি দিন নয়, ও ভেতরে ভেতরে ধ্বসে যাচ্ছে।”

চুপ করিয়া অপর্ণা দেবী চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িলেন, যেন বড বেশি ক্লান্ত এবং বিষন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। শয়ান অবস্থাতেই ধীরে ধীরে, যেন আপন মনেই বলিলেন, “থাক্‌, বেঁচে থেকেই বা কি করবে?”

আমার সমস্ত মনটা অনুশোচনায় খাক হইয়া গেল,—কি অন্যায়ই করিয়াছি অবুঝের মত প্রশ্ন করিয়া! খানিকক্ষণ নিজেকে বিশ্বাস করিয়া মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না।…ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী এক-একবার মালা ঠিক করিয়া লইতে স্ফটিকে স্ফটিকে লাগিয়া এক-একটা কিটু কিটু করিয়া আওয়াজ হইতেছে। তরু ছেলেমানুষ হইলেও কথাটা যে কোথা থেকে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়াছে যেন। অপর্ণা দেবীর কথায় বলিতে গেলে তাঁহার এ দুর্বলতা সম্বন্ধে বাড়ির সবারই একটা তৃতীয় নয়ন আছে; কাহারও বয়স্থ ছেলে লইয়া কোন কথা উঠিলে অপর্ণা দেবীর সম্বন্ধে সবাই সশঙ্কিত হইয়া ওঠে।

অপর্ণা দেবীই আবার প্রথমে কথা কহিলেন, “মুশ্‌কিল হয়েছে ওর ছেলে এখানে নেই শৈলেন। আমি ওঁকে বলে পুলিস সাহেবের সাহায্য নিয়ে ঢের খোঁজ করেছি, যেখানে যেখানে ভুটিয়াদের আড্ডা, ওকে নিয়ে গেছি—ওর ছেলে কলকাতায় আসেনি। আর গরম পড়ে গেছে—নতুন ভুটিয়া আসছেও না এ বছর। ওদিকে পুলিশ কমিশনারের আপিস থেকে ভুটান গভর্নমেণ্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, টের পাওয়া গেছে ওর ছেলে বাড়িতেও ফিরে যায়নি।…চারিদিকে চেষ্টা করেছি, কিন্তু…”

হঠাৎ একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া বলিলেন, “একটা মহাপাতকও করেছি ওর জন্যে শৈলেন, আর কি করব?”

ইচ্ছা ছিল না, তবুও ভাব পরিবর্তনে একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, “কি?”

“একদিন একটা ভুটিয়া ছেলেকে দেখেছিলে তো এখানে? না, সেদিন তুমি ছিলে

না, আমি তোমার একবার খোঁজ নিয়েছিলাম—তুমি আগে যেখানে টুইশন করতে তাদের মেয়ের না ছেলের। বয়েতে সমস্ত দিন সেখানে ছিলে।···সেই ছেলেটাকে বুড়ীর ছেলে বলে বুড়ীকে স্তোক দিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। বুড়ীর ছেলের নাম, ওদের গাঁয়ের নাম আরও মোটামুটি কিছু খবর যোগাড় ক'রে ছেলেটাকে তালিম দিয়ে দিলাম। ভাল দেখতে পায় না চোখে, সমস্ত দিন বুড়ীর ছেলে পেয়ে সে যে কী আহ্লাদ!—যদি দেখতে! ··সন্ধ্যের সময় প্রবঞ্চনাটা ধরা পড়ল। পরে টের পেলাম ওর ছেলে সমস্ত দিন খেলা শিকার—এই সব নিয়ে হুড়োহুড়ি ক'রে বেড়ালেও সন্ধ্যে থেকে একেবারে মাকে ঘিরে থাকত। রাত্তিরে দু-একটা বুড়ীকে মরতে দেখে তার কেমন একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যে-কোন রাত্তিরেই ওর মা ওকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। দামাল ছেলে ভয়ে যেন একেবারে অসহায় হ'য়ে থাকত। ছেলের এই শিশুভাবটা ছিল বুড়ীর সম্পত্তি,—সব মায়েরই এইটে সবচেয়ে বড় সম্পত্তি, শৈলেন। ভুটিয়া ছেলেটার মধ্যে বুড়ী এইটে না পেয়ে খাঁটি-মেকির তফাতটা ধরে ফেললে।···শৈলেন, এসব পাড়ায় যে হিন্দুস্থানী গয়লারা গরু নিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে যায় দেখেছ?—বাছুর মরে গেলে তার চামড়ার মধ্যে খড় ভরে কাঁধে ক'রে নিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মার সামনে সেই কুশ-বাছুর দাঁড় করিয়ে দুধ আদায় ক'রে···"

হাতটা ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখটা যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ওঃ! কি অন্যায় করেছিলাম!—পারলাম কি ক'রে বল তো···মা হ'য়ে?"

কী মুশকিলে যে পড়িয়াছি! কি করিয়া বদলাই আলোচনা? বলিলাম, "আপনি মিথ্যে নিজেকে দোষী মনে করেছেন। ভুটানীর সঙ্গে ব্যবহারটা বাইরে দেখতে প্রবঞ্চনা হ'লেও সত্যিই কি প্রবঞ্চনা ছিল?·· ধরুন, এই তরুকে ছেলেবেলা থেকে কি বরাবরই সত্যি কথা বলে মানুষ ক'রে এসেছেন?—সত্যি কথা ধরে বসে থাকলে কি হ'ত মানুষ? আমার তো বিশ্বাস, মায়ের শুদ্ধ মনের জন্যে ভগবানের বিশেষ মার্জনার ব্যবস্থা আছে। শুধু মার্জনার কথা বললে মায়ের প্রবঞ্চনাকে খাটো করা হয়, বরং বলব সেই প্রবঞ্চনার জন্যে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।"

অপর্ণা দেবী শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন, মুখে একটা প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল—ঠিক মায়ে যে প্রশ্রয়ের হাসিতে অবোধ শিশুর মুখে ভারিক্কে কথা শুনিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখে।···সত্যই তো, এই প্রতিভাময়ী নারীকে একটা তুলনা দিয়া ভুলাইতে গিয়াছিলাম! লজ্জায় আমার দৃষ্টি যেন আপনি নত হইয়া পড়িল।

যা হউক একটা ভাল হইল। অপর্ণা দেবী বুঝিয়াছেন আমিও ওঁর সঙ্গে অন্তরে অন্তরে বেদনাতুর হইয়া পড়িয়াছি; প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। বলিলেন, "কোন কাজ আছে শৈলেন তোমার? এই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমি একটু কুনো বলে তরু কখন কখন আমি ডাকছি বলে, মীরাকে, এমন

কি ওঁকে পর্যন্ত ডেকে এনেছে। তোমাকেও তেমনই ক'রে ডেকেআনেনি তো ?"

তরুকে বুকের কাছে চাপিয়া হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মা কি না, তাই মিথ্যে কথা বলে আমার ভাল করবার চেষ্টা করে। ভয় নেই, এ মিথ্যে তোমার শিক্ষা নয়, তুমি আসবার আগে থেকেই ওর এ-বুদ্ধি হয়েছে।"

ঘরের গুমোটটা গিয়া একটা লঘু হাস্যের স্রোত বহিল। আমি বলিলাম, "নয়ই তো আমার শিক্ষা, ওটা নিতান্ত মায়ের জাতের শিক্ষা, আমার কাছে কি ক'রে পাবে ? —আপনি ভিন্ন আর কারুর কাছে পেতেই পারে না ও! মিথ্যের রাংকে সোনায় পরিণত করতে পারে যে পরশমণি, ভগবান মা ভিন্ন আর কারুর হাতে দেননি তো সেটা।"

অপর্ণা দেবী প্রশংসাটা তরুর ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছাত্রীও একদিন মা হবে, তাকে বড় করতে চাইছ, সুতরাং আর আপাতত প্রতিবাদ করলাম না।··· কি দরকার তোমার শৈলেন ?"

বলিলাম, "আমি ক'দিনের জন্যে ছুটি নিতে এসেছি।"

অপর্ণা দেবীর মুখের হাসিটা যেন নিভিয়া গেল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ ছুটি নিচ্ছ যে, বাড়ি যাবে ?"

বলিলাম, "না, বাড়ি যাওয়া এখন হ'য়ে উঠবে না, দিন পাঁচ-ছ'য়ের ছুটি নিয়ে একটু কাছাকাছি থেকে ঘুরে আসব।"

হাসিয়া বলিলাম, "জানেনই তো বাংলা আমার প্রবাসভূমি, সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হ'য়ে নিজের দেশে যেতে হ'লে অত অল্প ছুটিতে হবার নয়, তাতে গায়ের ব্যথাই মরবার সময় পাওয়া যায় না।"

অপর্ণা দেবী কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না। যেন কি একটা বলিতে চান, বাধা রহিয়াছে। বাধা বোধ হয় তরু, তাই আমি বলিলাম, "তরু, তোমার বোধ হয় এবার লরেটোয় যাবার সময় হ'ল।"

ঘড়িটার পানে চাহিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আর দেরী নেই বেশি ; খাওয়া হয়েছে তোমার ?"

এ-সব বাড়ির মেয়েরা এ ধরনের ইসারাগুলো বেশ টপ্ করিয়া বুঝিয়া লয়। শুধু বুঝিয়া লওয়া নয়, তরু খানিকটা মানাইয়া লইবারও চেষ্টা করিল। বলিল, "এখনও একটু দেরী আছে, তেমনি আবার বই-টই গুছিয়েও নিতে হবে তো ?"

যাইতে যাইতে দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া বলিল, "আমার পড়া শেষ না ক'রে গেলে কিন্তু চলবে না মাস্টারমশাই, তা বলে দিচ্ছি।"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "যাতে বিয়েই অচল হ'য়ে যাবে এমন ভুল আমি করতে পারি কখনও ? তোমার গুরুমার সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা বল ?"

অপর্ণা দেবী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিয়ের প্রীতি-উপহার বুঝি? বলছিল বটে ওর মেজ গুরুমার বিয়ে।"

৪

অপর্ণা দেবী কি করিয়া প্রসঙ্গটা আবার তুলিবেন যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তরু চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বলছিলাম তোমার বেড়াতে যাওয়ার মতলবটা যেন হঠাৎ হ'ল। কোন আত্মীয়-স্বজন কাছে-পিঠে আছেন নাকি?"

বলিলাম, "আত্মীয় নয় শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু থাকে, একবার তার ওখান থেকে একটু ঘুরে আসব, অনেক ক'রে লিখেছে। কাছে, অথচ প্রায় পাঁচমাস যাইনি। ওদিকে পরীক্ষার জন্যে তোয়ের হ'তে নিঃশ্বাস ফেলবার যো ছিল না, তার পরেই আপনাদের এখানে এসেছি, বুঝে-সুঝে নিতে এই তিনটে মাস কেটে গেল।"

অপর্ণা দেবী সুযোগটা হাতছাড়া হইতে দিলেন না, কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, 'তা কেমন বুঝছ?

বলিলাম, "ভালই। তরুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রী পাওয়া তো···"

"সে না হয় হ'ল, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হ'য়েই বা কি করবে?—দোটানায় ফেলে ওকে কোথায় যে দাঁড় করাবে এরা, আন্দাজ করতেই পারছি না...আমি পড়াশোনা নিয়ে বোঝাবুঝির কথা বলছিলাম না; তুমি এই বাড়িতে রয়েছও তো? সেই দিক দিয়ে কেমন বুঝছ?"

বলিলাম, "সেদিক দিয়ে আমায় তো আপনারা রাজার হালে রেখেছেন।"

অপর্ণা দেবী এই দ্বিতীয় সুযোগে সোজাসুজি আসল কথাটায় আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বেশ, মেনে নেওয়া গেল রাজার হালেই রয়েছ তুমি; কিন্তু যাকে রাজার হালে রাখা যায় তার মান-অভিমান সম্বন্ধেও সেই রকম সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয়।··· কাল এতে একটু ত্রুটি হয়েছে শৈলেন, আমার মনে হচ্ছে তোমার এই হঠাৎ বেড়িয়ে আসার সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।"

কথাটা এত আচম্বিতে আনিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমি কি যে জবাব দিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অপর্ণা দেবীই বলিলেন "আমি তোমায় যতটা জেনেছি তাতে অবিশ্বাসের কারণ নেই—তুমি যখন ছুটি নিচ্ছ তখন নিশ্চয় ছুটিই নিচ্ছ; কিন্তু বলতে বাধা নেই, আমার একবার যেন একটু মনে হয়েছিল তুমি একটা অশোভন গোলমাল না ক'রে ছুটির নাম নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছ।"

আমি আবার মুখ তুলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এমন কি মহামারী

কাণ্ড হয়েছে যে…?”

অপর্ণা দেবী সাধারণত খুবই সংযত প্রকৃতির স্ত্রীলোক, কিন্তু স্পষ্ট বুঝা গেল ভিতরে বেশ একটু অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন, বলিলেন, “শৈলেন, আমি সব কথা শুনেছি। কাল সন্ধ্যেয় তরুর খোঁজ নিতে গিয়ে টের পেলাম তুমি তরুকে বেড়াতে নিয়ে গেছ। সেই থেকেই আমার মনে অশান্তি লেগে ছিল—বাড়িতে একটা পার্টি, আর তুমি তাকে নিয়ে বেড়াতে চলে যাবে এমন বেখাপ্পা কাজ তুমি কখনই করতে পার না; মীরাকে জানি, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়, যাতে তোমায় মারাত্মক রকম কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে উঠতে হয়েছে। পার্টি ভেঙে গেলে টের পেলাম। টের পাবার ইতিহাসটাও বড় চমৎকার। তোমাদের সঙ্গে পার্টিতে যারা সব ছিল তাদেরই মধ্যে একজন এসে বড় গলা ক'রে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার কাছে বর্ণনা করলে, যেন মীরা একটা মস্ত বড় বাহাদুরি করেছে।—আমি আর তার নাম করলাম না, কিন্তু তুমি তাকে চিনেছ নিশ্চয়।…কি করব এদের সঙ্গেই তো মীরাকে মেলামেশা করতে হবে?”

বুঝিলাম, নিশীথের কাজ; মীরার সব চেয়ে বড আর সব চেয়ে অযোগ্য স্তাবক, ওদের মধ্যে আমার প্রবেশটা ওরই সব চেয়ে পীডাদায়ক হইয়াছিল, আমার অপমানে তাই ও-ই হইয়াছিল সব চেয়ে পুলকিত; প্রথম সুযোগ পাইয়াই অপর্ণা দেবীকে সুসংবাদটা না জানাইয়া পারে নাই।…মূর্খ! এত দিন দেখিয়া-শুনিয়াও অপর্ণা দেবীকে চেনে নাই।

আমি নীরবই রহিলাম।

অপর্ণা দেবী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, “তোমায় একদিন হেরিডিটি সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বলেছিলাম, মনে আছে শৈলেন?”

কথাটা পূর্বে উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—একদিন কথা প্রসঙ্গে অপর্ণা দেবী হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতার কথা তুলিয়াছিলেন। এই রকম একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে ওঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমার জীবনের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি ভুলিতে পারি? তবুও কথাটা হাল্কা করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, “হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বংশের ধারাটা কখনও কখনও একটা বা দুটো ধাপ বাদ দিয়ে আবার চাগিয়ে ওঠে। আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের দেহে যে রাজবংশের রক্ত আছে, এটা আপনার মনে না থাকলেও মীরা দেবীর মধ্যে এ-ধারণাটা আবার ফুটে উঠেছে।”

অপর্ণা দেবী আরও বেশি বলিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, “আশ্চর্য এই যে, মীরার রক্তের মধ্যে সেই রাজবংশের ধারাটা আরও পাৎলা হ'য়ে আসা সত্ত্বেও ওরই মধ্যে

মর্যাদাজ্ঞানটা—আভিজাত্যের গুমরটা আরও উৎকট হ'য়ে দেখা দিয়েছে।"

অবশ্য এ-কথাটা আর অপর্ণা দেবীকে আমি বলিলাম না এখন।

অপর্ণা দেবী একটু শঙ্কিত-ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "ঐ হয়েছে সর্বনাশের গোড়া, শৈলেন। যখন জানই সব, তখন বরাবরের জন্যে তোমায় একটা কথা বলে রাখি,—মীরা এ-বিষয়ে নিরুপায়। ও মেয়ে ভাল, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কি ক'রে যাবে? ওর মধ্যে এই নতুন গণতন্ত্রের যুগ আর মৃতপ্রায় রাজতন্ত্রের যুগ পাশাপাশি কাজ করছে। ও তোমাদের চায়, তোমাদের মধ্যে যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে মহত্ত্ব সেখানে ওর নজর গিয়ে পড়ে; কিন্তু ওর মায়ের বংশের কোন যুগের রাজা-মহারাজারা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে। ও এইখানে একেবারে নির্দোষ। তাই বলছিলাম শৈলেন—মীরার ব্যবহারে যদি তুমি কখনও চলে যেতে বাধ্য হও তো নিশ্চয় যেও—হীনতা কেউ মাথা পেতে নেয় এটা আমি চাই না—কিন্তু ওকে ক্ষমা ক'রো। হ'তে পারে রাজরক্তের খামখেয়ালীপনায় ও তোমার মনুষ্যত্বের কাছে কোন সময় বোধ হয় আরও বেশি অপরাধ করবে; আমাদের বাড়ির আতিথ্যধর্মে সেটা একটা মস্ত বড় অন্যায় হবে বলে আগে থাকতেই আমার মেয়ের হ'য়ে তোমায় এই অনুরোধ ক'রে রাখলাম।"

অত্যন্ত লজ্জিত এবং অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বলিলাম, "আপনি ব্যাপারটাকে বড় বাড়িয়ে দেখে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন; আসলে অতটা কিছু নয়। বোধ হয় একেবারেই কিছু নয়। হেরিডিটি নিয়ে মীরা দেবীর সম্বন্ধে আপনার একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে বলেই আপনি অতটা ভেবে নিয়েছেন। নিশীথবাবুও বোধ হয় নিজের মনের রঙ ফলিয়েই কথাটা আপনাকে বলেছেন...।"

অপর্ণা দেবী চক্ষু তুলিয়া চাহিতে হুঁশ হইল—নিশীথের নামটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, অথচ তিনি ওটা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু অপর্ণা দেবী সে-বিষয়ে কিছু না বলিয়া, দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমার ধারণাটা ভুল নয় শৈলেন, নিজেরই মেয়ে তো, এতটা ভুল হবে না। ওর এই রাজরক্তের গুমর নিয়ে আমার মস্ত বড় একটা আশঙ্কাও রয়েছে, ভগবান না করুন, সেটা যদি কখনও ফলে ওর জীবনে...।"

একটু ভীতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি আশঙ্কা?"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আশঙ্কা ঐ নিশীথকে নিয়ে, জান তো ও একজন খুব বড় জমিদারের ছেলে। নিজে যে ও একেবারেই অপদার্থ, যদি মীরা অসার বংশমর্যাদার মোহে এ-কথাটা কখনও ভুলে বসে?"

প্রকৃতিস্থ হইতে একটু বিলম্ব হইল।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী তন্দ্রালু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের স্ফটিক

মালাটা কোলে পড়িয়া গিয়া 'ছলাৎ' করিয়া একটা মৃদু শব্দ হইল।

অপর্ণা দেবী প্রশ্ন করিলেন, "কবে যাবে?"

উত্তর করিলাম,"কালই যাই তাহ'লে। ক'টা দিন কাটিয়েতাড়াতাড়ি ফিরে আসি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বেশ যাও, একটু জায়গা বদলান দরকার।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি, দেখি সরমা উঠিয়া আসিতেছে। আমি সিঁড়ির বাঁকে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "একটু অসময়ে যেন?"

ল্যাণ্ডিঙের দুইটা ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া হাসিয়া উত্তর দিল, "মীরার ঝোঁক চাপলে তো সময়-অসময় বাছবার যো নেই। ফোন মারফত হুকুম হয়েছে—যেমন আছি চলে আসতে হবে, নৈলে আমার সঙ্গে চিরদিনের আড়ি।"

কিছু একটা বলার দরকার বলিয়াই বলিলাম, "একেবারে জার্মান কাইজারের আলটিমেটাম?"

"ঠিক তাই, কিন্তু কারণটা কি?"

"জানি না তো!"

সরমা আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল। সিঁড়ির মাথায় গিয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "অবশ্য জানবার কথাও নয় আপনার।—শুনেছি কাইজার নিজের নিকটতম পার্শ্বচরদেরও সব সময় নিজের গুপ্ত মন্ত্রণা জানাতেন না।"

ওদিক ঘুরিতেই নিশ্চয় মীরাকে দেখিতে পাইল। অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তোমার এমন 'ভয়ানক মন খারাপ' কিসের জন্যে যে ··"

যেন ওদিক থেকে বারণের ইঙ্গিত পাইয়া থামিয়া গেল।

রাত্রের আহারের সময় মিস্টার রায়কেও বলিলাম। একটু বেশি অন্যমনস্ক ছিলেন; বলিলেন, "যদি বেড়াতেই হয় শ্রীরামপুর না গিয়ে একবার পদ্মার ওদিকটা হ'য়ে এস বরং, চাঁদপুর, পার তো কুমিল্লা পর্যন্ত...ও রকম চমৎকার···"

আজ বিলাস-ঝি ডাইনিং-রুমে ছিল, এক-একদিন থাকে, পরিবেশনে সাহায্য করে। বলিল, "শুনছেন মাস্টারমশায়ের বন্ধু থাকেন শ্রীরামপুরে, উনি গঙ্গার-ধারে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি করবেন? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে রায়মশাই··· কি রকম মক্কেলের পাল্লায় আজ পড়েছিলেন বলুন তো?"

মিস্টার রায় কাঁটা-চামচ প্লেটের উপর রাখিয়া দিয়া সিধা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "ভীষণ বিলাস, ভীষণ! আর বুড়ো বয়সে একলা এঁটে উঠতে পারি না। ভাবছি কাল তোমায় জুনিয়ার করে নিয়ে যাব—যেমন চমৎকার ওকালতিটা করলে মাস্টার-মশাইয়ের পক্ষে!···"

পরদিন সকালে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকখানা বই, কাপড়-চোপড় অজিনের

ছেলেমেয়ের জন্য গোটাকতক খেলনা, আর কয়েকটা টুকিটাকি গুছাইয়া লইতেছি, তরু নামিয়া আসিল। খুব উল্লসিত। বলিল, "উঃ কী চমৎকার যে আপনার পদ্যটি হয়েছে মাস্টারমশাই!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি?"

তরু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু দিদি নিজে বলেছে!"

আমি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলাম, "তবেই তো! আর, বিশ্বাস যে করতেই হবে এ হুকুমও হয়েছে নাকি তোমার দিদির?"

আমার কপট গাম্ভীর্য দেখিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল, সেও কৌতুকের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁ, হয়েছে হুকুম। আরও একটা হুকুম হয়েছে।"

আমি আবার একচোট ভয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আবার কি?"

তরুও ভয় পাইবার ভঙ্গিতে বলিল, "আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

তরু হাসিতে হাসিতেই সামনে ঘাড়টা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল, "কেন আবার? আরও যদি কোন হুকুম করতে হয় দিদির, কি ক'রে করবেন?—বাঃ!"

তাহার পর আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "না মাস্টারমশাই, দিদি প্রীতি-উপহারটা খুব ভাল কাগজে ছাপাবেন, আপনাকেও একখানা পাঠাবেন, তাই ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে বললেন।"

আমি ছুটিতে যাইব, যাঁরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না আমায়, কোন একটা যোগসূত্র ধরিয়া থাকিতে চায়।

আপনি যাইবেন, তাই লইয়া একজন অহেতুকভাবে শঙ্কিত—কথাটা ভাবিতেও সুখ নয় কি?

৫

বেশি নয়, সব মিলাইয়া হদ্দ ঘণ্টা-তিনেক লাগিল, যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া গিয়াছি,—অন্য এক দেশ, অন্য এক যুগও যেন।

অনিলদের বাড়িটা একটা পাড়ার ভিতর দিয়া গিয়া একেবারে শেষের দিকে পড়ে। কাঁচা সরু গলি ছাড়িয়াই বাঁ-দিকে অনিলদের বাড়ির বাইরের উঠান দেওয়াল দিয়া ঘেরা, ইঁট মাঝে-মাঝে নোনা ধরিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের মাঝখানটায় একটা চৌকাট আছে, কিন্তু দরজা নাই।

ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। চাপা, সবুজ দুর্বা ঘাসে উঠানটা ভরা, তাহার একটু বাঁয়ে ঘেঁষিয়া পায়ে পায়ে তৈয়ারী সরু পথটা ভিতর-বাড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডান দিকটায় একটু আগাছার জঙ্গল,—কচু, আশ্-স্যাওড়া, ভাট। তাহাদের উপর ছায়া ফেলিয়া একটা নোনার গাছ ফলে নুইয়া গিয়াছে। একপাশে একটা ছোট চাঁপার গাছ, গা বাহিয়া কতকগুলা তরুলতা উঠিয়াছে, সরু সরু টকটকে রাঙা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে।....হঠাৎ কি করিয়া জানি না, মীরাদের অতি-পরিচ্ছন্ন, সুসংযত বাগানের ছবিটা মাথায় যেন একবার উঁকি মরিয়া গেল।

একেবারে ভিতরে গেলাম না। কিসের যেন একটা ঘোর লাগিয়াছে মনে হইতেছে সব রসটুকু নিংড়াইয়া পান করিতে করিতে অগ্রসর হই। রাস্তা দিয়াও আসিয়াছি যেন স্বপ্নে চলিয়া। পাশের বাড়িতে খানকতক বাসন ঝন্ঝনিয়া পড়িয়া যাওয়ার শব্দ হইল! সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্ত কণ্ঠের তিরস্কার, "ওলো, বিয়ে হ'লে দু-ছেলের মা হ'তিস্—এই কাজের ছিরি?"

একটু কানে বাজে; বিশেষ করিয়া তাহার, দীর্ঘ ছ'টা মাস যে কলিকাতার বাহিরে পা দেয় নাই, আর শেষের তিনটা মাস কাটাইয়াছে বালিগঞ্জের এক সুসভ্য ব্যারিস্টার-ভবনে। কিন্তু একটা ছবি খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে, নিতান্তই বাংলার ছবি।—বড়, অনূঢ়া ঝিউড়ী মেয়ে—খিড়কির পুকুর থেকে বাসনের গোছা মাজিয়া বাঁ-হাতে সাজাইয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—অসাবধানতা—মায়ের শাসন—সব তিরস্কারেই আজকাল একটু বিয়ের কথা মিশান—বিয়ের কথায় লজ্জা—না হওয়ার জন্য বোধ হয় মনের অন্তস্তলে কোথাও একটি তপ্তশ্বাস...রৌদ্রক্লান্ত মুখটি আরও একটু রাঙিয়া উঠিয়াছে...

দ্বিপ্রহরের শুব্ধ পল্লী আবার নিঝুম হইয়া পড়িল।

অগ্রসর হইয়া বাড়ির ভিতর-দুয়ারের কাছে আবার একবার দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। যদিও একটু ভয় হইতেছে বাহির হইতে বা ভিতর হইতে কেহ আসিয়া পড়িলে ব্যাপারটা দেখিতে বেশ মানানসই হইবে না; কিন্তু জানাশোনা লোক—এ ভরসাটাও আছে সঙ্গে সঙ্গে। আসল কথা, বাংলার রূপটি সব মিলিয়া এত নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, এমন কিছুই করিতে মন সরিতেছে না যাহাতে সে-রূপটি চকিত, ত্রস্ত হইয়া মিলাইয়া যায়। ..কে 'অন্নদা-মঙ্গল' পড়িতেছে, খুবই সম্ভব অম্বুরী—ছন্দের একঘেয়ে বিলম্বিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় হয় কি জানি কে দিবে ফেরফার ॥
ঈশ্বরীকে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ॥

কি রকম একটা আবেগে আমার চোখ যেন ভিজিয়া আসিতে চাহিল। বহু বৎসর পরে অনেক দূরের কোন এক প্রবাস হইতে যেন ফিরিয়া আসিয়াছি। ধমনীর সমস্ত রক্ত যেন সাড়া দিয়া উঠিল ; ঠিক এই আমার নিজের ভুঁই। যুগ যুগ ধরিয়া এখানে দেবতায়-মানুষে লীলার খেলা হইয়া আসিয়াছে, তাই বহু যুগের সহজ-অভিজ্ঞতার দাবীতে এখানে মানুষ বিশ্বাস করে, দেবতা ছলনা করিয়া পাটনীকে ডাকিয়া খেয়া পার হইল, আলতা-রাঙা পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনা করিয়া দিয়া পারণী-মূল্য দিয়া গেল। · বুঝিতেছি, কলিকাতা এ দেশের গায়ে একটা পরগাছা—তার আকাশ-বাতাস, রাস্তা-ঘাট, মানুষ সব সমেত একটা পরগাছা কলিকাতা। আজ সকাল পর্যন্ত এই চারিটা বৎসর আমি এইখানে ব্যয় করিয়াছি! · কী সব শ্রীহীন বাড়ি—শাসনক্লিষ্ট বাগান—মিস্টার রায়—মীরা···কি সব অনাত্মীয়—কোন্ দেশের—কত দূরের···

মাঝে মাঝে একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছি, মাঝে মাঝে আবার অম্বুরীর সুর জাগিয়া উঠিতেছে—টানাটানা—অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে লয়ে মেশান—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ॥
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে।
পায়ে ধরি' কি জানি কুম্ভীরে যাবে ল'য়ে ॥
ভবানী বলিছে তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল্ ॥
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙাচরণ ॥

হুঁশ হইল, বেশি দেরী হইয়া যাইতেছে। "অনিল আছিস্?"—বলিয়া আমি ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

উঠানের ডান দিকে টানা রক, তাহার পরেই ঢাকা বারান্দা, দুয়ার খোলা। বারান্দার মেঝের মাদুর পাতিয়া অম্বুরী উবুড় হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছে, পাশে অনিলের মা একটা বালিসে মাথা দিয়া এদিক ফিরিয়া শুইয়া আছেন। মাঝখানে

কোলের মেয়েটি নিদ্রিত। অনিলের ছেলে দুই হাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া মা'র মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে।

প্রথম ডাকে ধ্যান ভঙ্গ হইল না কাহারও। তখন চলিতেছে—

সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।

এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়॥

"খোকা!" বলিয়া আবার ডাকিলাম আর একটু জোরে।

অম্বুরী হুড়মুড়িয়া উঠিয়া একবার আমার পানে চাহিয়াই এক গলা ঘোমটা টানিয়া বাঁ-হাতে ভর দিয়ে বসিয়া রহিল। অনিলের মায়ের গলাটা বার্ধক্যের হেতু কাঁপিয়া গিয়াছে, কালা মানুষ, দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; একটু টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "থামলে কেন বৌমা, কি হ'ল ?

খোকা প্রথমটা ভয়ে, পরে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার পানে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, শৈল টাকা! কি ঠব্বনাশ!"

"পারলে চিনতে?"—বলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে গিয়া রকে উঠিলাম। বলিলাম, "তোমার মা অত শিগ্‌গীর চিনবে অবশ্য আশা করি না।"

অম্বুরী ঘোমটা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—"ঠাকুরপো! ...ওমা, ঠাকুরপো এসেছেন।"

আমি গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, "জেঠাইমা, আমি শৈলেন।"

বৃদ্ধা উঠিয়া বসিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "ওমা দেখ! আজ সকাল থেকেই বাঁ চোখটা নাচছে, তোমায় বললাম না বৌমা— কিছু একটা সুখবর আছে—হয় কেউ আসবে, নয়..."

অম্বুরী বলিল, "আমারও তো কাল রাত্তিরে হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গেল বললাম—'রেতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ি যা'...উঃ, কতদিন আসনি যে ঠাকুরপো!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আসবার আঁচ পেয়েই কাল রাত্তির থেকে তুমি যে রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছ, অম্বুরী, তাতে..."

এখানে একটা কথা না বলিয়া রাখিলে ঠিক হইবে না। অনিল আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, একটু বেশিই হইবে; তাই অম্বুরী যখন নূতন আসিল 'বৌদি' বলিয়া সুরু করিয়াছিলাম। অনিল সে-বন্দোবস্তটা স্থায়ী হইতে দিল না। বলিল, "চিরটা কাল বয়সের একটু খাতির না ক'রে দিব্যি ইয়ারকি মেরে এলি, আজ ওর ওপর ভক্তিতে আমায় দাদা ক'রে তুলবি সেটি হবে না। ও রইল আমাদের দু-জনের মাঝ-খানে, যেমন ছিল সহু। যা নাম দিয়ে মুখ দেখেছিলি তাই বলে ডাকতে হবে; শপথ দেওয়া রইল।"

অম্বুরী আমার বিদ্রুপে লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শোন কথা! তুমি আসছ কি আমি জানি?"

অনিলের মা বলিলেন, "তারপর, আছিস কেমন শৈল? প্রায়ই জিগ্যেস করি অনাকে, বলে..."

অম্বুরী শাশুড়ীর কথাটা লইয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "বলে, আর চিঠি দেয় না বেশি, বড়লোকদের বাড়িতে পড়ায়—বড়লোকের মেয়েকে (অম্বুরী একটা কটাক্ষপাত করিল)—আমাদের সবাইকে ভুলে গেছে... বলবেই তো, কেন বলবে না বল?...কি আর এমন অন্যায় বলে?"

অনিলের মা আমার পক্ষ লইয়া বলিলেন, "তাই কি পারে গা ভুলতে?—কাজের ভিড়..."

আমি অম্বুরীর দিকে আড়ে চাহিয়া বলিলাম, "তা নয় হ'ল, কিন্তু যে বলে এ-সব কথা সে কখন আসবে বল তো? তার উকিলের সঙ্গে মেলা বকাবকি ক'রে কি হবে?"

অম্বুরী ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল; অনিলের মা-ই উত্তর দিলেন, "অনার সেই বাঁধা সময়, ছ'টা কুড়ির গাড়ি, বাড়ি আসতেই সন্ধ্যে।"

কেমন যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দাঁড়াইয়া আছি, এক হাতে সুটকেস, এক হাতে খোকার জন্য কেনা সন্দেশের ছোট তিজেলটা; ভুলিয়া গিয়াছি...দেওয়া হয় নাই তখনও, না-দেওয়ার জন্য খোকা উৎসাহের মুখে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একবার তাহার লোলুপ দৃষ্টির প্রতি নজর পড়িতেই মনে পড়িল বলিলাম, "দেখো! ...খোকা আয়, খাবার নে, ভুলেই গেছি! কত বড় হয়েছিস রে তুই!...ওর জিবের আড়টা এখনও যায়নি দেখছি যে..."

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "না, কবে যে যাবে তাও জানিনে, চার পেরিয়ে পাঁচে পড়বেন এবার। এখন কথার মাত্রা হয়েছে—'ঠব্বনাশ'.. শুনলে তো? তুমি আসতেই... কাকা বাড়ি এলে 'সর্ব্বনাশ বলতে আছে বোকা ছেলে? প্রণাম করতে হয় না কাকাকে? সন্দেশের হাঁড়ি তো দু-হাতে বাগিয়ে ধরেছ যাত্রার দলের হনুমানের মতন...

শাশুড়ী হঠাৎ স্নেহের তিরস্কারে বলিলেন, "ওমা, কাণ্ডটা দেখ! শিশুকে বলছ, নিজের ভুলের হিসেব আছে?

বধূ ভীত-বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন, "বসতে বলেছ শৈলকে? মুয়ে আগুন, আমিই বা কাকে বলছি? বুড়ো হ'য়ে ভীমরতি হয়েছে, এবার যেতে পারলেই হয়..."

"ওমা, সত্যিই তো"—বলিয়া অম্বুরী অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা মাদুর লইয়া আসিল, সামনে চৌকির উপর বিছাইয়া দিতে দিতে বলিল,

'আর তাও বলি—ঠাকুরপোকে নাকি কুটুমের মত 'আসুন—বসুন' বলে খাতির করতে হবে ? বয়ে গেছে আমার।"

চিবুকটা হঠাৎ একটু সামনে বাড়াইয়া দিয়া একটু বেপরোয়া ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমার বাপু বড্ড আহ্লাদ হয়েছে, ভুলে গেছলাম, পারিনি খাতির করতে ! ঠাকুরপো রাগ করে, ভাজের হাতের ভাত চারটি বেশি ক'রে খাবে।"

বসিয়া জুতা খুলিতেখুলিতে হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যে সত্যিই চাঁড়ালের বাড়িতে ব্যবস্থা করনি, এই ঢের খাতির, কি বলুন জেঠাইমা ?"

অম্বুরীও তাঁহাকেই সালিশী মানিল, একটু অভিমানের সুরে বলিল, "সেই থেকে ঐ এক কথা ধরে বসে আছেন, রাত্তিরে হাত থেকে ঘটি পড়লে ঐ কথা বলতে হয় না মা ? রেতের কুটুম যে চোর।"

জেঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, আহা, তুই আসবি তা কি জানত বেচারী ? এমন দিন যায় না যেদিন শৈল-ঠাকুরপোর কথা একবার না বলে—আর আসে না, ভুলে গেছে—খোকাকে এত ভালবাসত "

অম্বুরী ক্রটি সারিতে লাগিয়া গিয়াছে। আমার জামা, চাদর, জুতা, সুটকেস ভিতরে রাখিয়া দিয়া অনিলের চটিটা পায়ের কাছে বসাইয়া চলিয়া গেল।

অনিলের মা তাঁহার সেই ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "কত কথা যে একসঙ্গে ভিড় ক'রে আসছে, কোন্‌টা যে আগে জিগ্যেস করব বিয়ের কিছু ঠিকঠাক হ'ল শৈল ?"

খোকা কখন অদৃশ্য হইয়াছে কেহ টের পায় নাই, হঠাৎ হাঁড়ি কোলে পাশের ঘর থেকে বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "মা কটা ঠাব ?"

অম্বুরী ওদের শোবার ঘর থেকে পাখা আনিতে গিযাছিল, পাখা-হাতে বাহির হইয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "ওম্মা ! আদ্দেক হাঁড়ি খালি ক'রে এখন জিগ্যেস ক'রতে এসেছে—ক'টা খাব ? দে হাঁড়ি, বড্ড শক্ত পেট কিনা "

আমি উঠিয়া খোকাকে টানিয়া কাছে লইলাম। হাঁড়ি থেকে দুইটা সন্দেশ বাহির করিয়া বলিলাম, "তুমি দু-হাতে দুটো নাও খোকা। নাও অম্বুরী, খোকার হাঁড়ি তুলি রেখে দাও। খোকার হাঁড়ি থেকে যদি একটাও চুরি যায় তো তোমার ··কি করব বল তো খোকাবাবু।"

খোকা একবার চকিতে মায়ের দিকে চাহিয়া আমার কোলে আর একটু ঘেঁষিয়া বলিল, "ভাভার নাক কেটে ··"

অম্বুরী ধমক দিতে থামিয়া গেল। আমি হাসিয়া উঠিলাম, অনিলের মাও মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অম্বুরী ঘরের তাকে হাঁড়ি তুলিয়া রাখিতে

রাখিতে বলিল, "শুনলে তো? ঐ-সব শেখায় বসে বসে। নিজেরা খেদা বোঁচা, আমার দাদার বাঁশিপানা নাকের হিংসেতেই গেল সব—"

গোড়ায় প্রথম বিস্ময় আর আনন্দের ঝোঁকে যেটুকু ত্রুটি হইয়াছিল; অম্বুরী চরকির মত ঘুরিতে লাগিয়া গেছে। এবার আওয়াজ আসিল উঠানের ও-কোণ থেকে, তাহার পর রান্নাঘর থেকে···জেঠাইমা বলিতেছেন, "আমার কথার তো উত্তর দিলি না শৈল, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন? একটা বিয়ে-থা কর এবার, বৌমার পাশে তোর বৌকে দেখে যেতে পারলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না; তোকে তো কখনও আলাদা ক'রে দেখিনি, আমিও না, তোর জেঠামশাইও না···"

বেশ লাগিতেছে। চারিদিকের সঙ্গে বৃদ্ধার অলস অবাস্তর কথাগুলা এমন মিলিয়া যাইতেছে! এখানকার ভাষাগুলোও সবার কি রকম হাল্কা স্বচ্ছ!—যেন মনের কন্দর হইতে সোজা বাহির হইয়া আসিতেছে। আমার মুখের ভাষাও যেন বদলাইয়া গেছে, মাপিয়া-জুখিয়া, সাজাইয়া বলিবার কোন দরকার নাই।

খোকা মুখে সন্দেশ বোঝাই করিয়া, আমার মুখের পানে উল্টাইয়া চাহিয়া বলিল, "আমারও বিয়ে হবে শৈল টাকা, ডেলে বুড়ির ঠংগে, না ঠাম্মা?—এট্ট বড় মাছ—"

সকলে হাসিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "সেইটেই আগে দরকার; তুমি তাড়াতাড়ি সন্দেশটা খেয়ে নাও তাহ'লে।···অম্বুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়েও তো আগে খুঁজে বের করতে হবে জেঠাইমা?—সেটা কি খুব সহজ কথা?"

বধূগর্বে শাশুড়ীর মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা বটে শৈল, এমন বৌ হাজারে একটা মেলে না। তা যা বলেছিস্···

অম্বুরী একটা বড় কাচের গেলাসে করিয়া এক গেলাস সরবত আনিল। জেঠাইমার কথার উত্তরস্বরূপ বলিলাম, "তা আর নয় জেঠাইমা? এই দেখনা, প্রশংসা করেছি কি না করেছি, এক গেলাস সরবত এসে হাজির হ'ল!"

অম্বুরী গেলাসটা বাড়াইয়া ছিল। "কার প্রশংসা?" বলিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, গেলাসটা তাড়াতাড়ি আমার হাতে দিয়া বলিল, "তোমাদের মায়েপোয়ে বুঝি ঐ-সব বাজে কথা হচ্ছে? বেশ, কর ঠেসে প্রশংসা, আমি উনুনে আঁচ দিয়ে এসেছি, যাই দেখিগে।"

লজ্জিতভাবে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "আমি সাত-তাড়াতাড়ি এলাম সবার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করতে···বেশ, এবার তাহ'লে নিন্দের পালা আরম্ভ হ'ল...."

অম্বুরী রান্নাঘর থেকেই উত্তর করিল, "হোক আরম্ভ। ওঃ, বছর ঘুরিয়ে কি সাত

তাড়াতাড়ি আসা রে! ঐ-কথা ব'ল না, দেখব, আর একজনের কাছে!"

বলিলাম, "জেঠাইমা, তুমি একটু গড়াও বাছা, ব্যাঘাত হ'ল। আমি একবার দেখে আসি চারিদিকটা, ফিরে এসে খুকীটাকে তুলতে হবে...অনার ঘুম পেয়েছে বেটী।"

অনিলের মা বলিলেন, "আবার পাগলামি এল ছেলের। এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে কি দেখবি?"

হাসিয়া বলিলাম, "দুপুরই দেখব জেঠাইমা, অনেক দিন দেখিনি, দুপুর কাকে বলে ভুলে গেছি।"

৬

সন্ধ্যার সময় অনিল আসিল।

আমি খুকী আর অনিলের ছেলে সানুকে লইয়া কাছাকাছি একটু ঘুরিয়া আসিয়াছি। অম্বুরী গলায় আঁচল জড়াইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেছিল, বলিল, "থামো ঠাকুরপো, আমি মাদুর পেতে দিই, রকে ঠাণ্ডায় একটু ব'স, তারপর···"

এমন সময় "মা-মণি কোথায় গো?"—বলিয়া শিশু-কন্যাকে আহ্বান করিতে করিতে অনিল প্রবেশ করিল। আমায় দেখিয়া বলিল, "মশাই? আমি বলি অম্বুরী আবার আধ আঁচরে কাকে বসায়?"

দার্শনিক শ্রেণীর মানুষ, কোন কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হওয়া ওর ধাত নয়; জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "এসে পড়াতে তোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল কোটের পকেটে হাত দিতে দিতে বলিল, "দাঁড়া দেখি···না, নেই। তোকে আজ একখানা চিঠি লিখে আবার টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম, খামসুদ্ধ। পকেটে নেই একটাও টুকরো, নইলে দেখাতাম। ভাবলাম তোকে আর কখনও চিঠি দোব না, তারপর ভাবলাম, মা, অম্বুরী সবাইকে সুদ্ধু একদিন নিয়ে গিয়ে তোর ব্যারিস্টার- মনিবের বাড়িতে এমন বেয়াড়া তোলপাড় লাগিয়ে দোব যে তোকে তাড়াতে পথ পাবে না। কি করলে যে তোর ওপর শোধ নেওয়া হয় ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছিলাম না, তবে লাগসই একটা মতলব খুঁজে বের করতামই, এমন সময় তুই বিপদ বুঝে এসে পড়লি।"

বলিলাম, "তুই বা কোন্ একবার গেলি? লিখেছিলাম একবার দেখা ক'রে আসতে, পারতিস্ না?"

অম্বুরী পাখা আনিয়া হাওয়া করিতে যাইতেছিল, অনিল তাহার হাত থেকে সেটা

লইয়া বলিল, "দাও, থাক্, আমি শৈলকে নিজেই বলছি—রোজ সতী-সাবিত্রীর মত তুমি তোমার আধমরা স্বামীকে এমনি ক'রে বাঁচিয়ে তুলছ।"

অম্বুরী লজ্জিত হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলে বলিল, "যাওয়ার কথা বলছিস্ শৈল, তোর তো আর যমের বাড়ি নয়, যে চোখ বুজলেই পৌঁছনো যাবে। তিনখানা চিঠি দিয়েছিস্ বলছিস্, পেয়েছি দুখানা তার মধ্যে—একখানাতেও ঠিকানার নামগন্ধ নেই। তাই তো অম্বুরীকে বললাম—'শৈল এখন ব্যারিস্টারী কায়দায় নেমন্তন্ন করতে শিখেছে গো, পথ বন্ধ ক'রে খেয়ে আসতে বলে'..."

অম্বুরী বাহির হইয়া আসিয়া কলহের ভঙ্গিতে বলিল, "আমি তোমার হ'য়ে বলছি ঠাকুরপো, সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন যে, নিজে গেলে সত্যিই কি বাড়ি খুঁজে বের করতে পারতেন না? নড়বেন না বাড়ি থেকে, তা··· ।"

অনিল বলিল, "নড়ি না? আপিসে তুমি যাও কাছাকোঁচা এঁটে?"

অম্বুরী অনিলের মুখের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া লইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁধা গৎ রোজ একবার ক'রে আপিসে যাওয়া—মস্ত বড় বাহাদুরি!"

অনিলও আমাকেই সাক্ষী মানিল, বলিল "তুই তো থাকবি দুটো দিন শৈল? মিলিয়ে দেখ্, আমার পক্ষে আপিসে যাওয়াটা মস্ত বড় একটা বাহাদুরি কি না, আর বাইরে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব কি না।"

এক বর্ণও ভুল নয়। যখন থেকে বাড়ি আসিল, অনিল যেন শত বাঁদীর মধ্যে বাদশাহ্। নিজেকে একটি কুটা নাড়িতে হইল না, যখন যেটি দরকার একেবারে হাতের কাছে জোগান। কোন জিনিসটির জন্য তাহাকে মুখ ফুটিয়া একটা ফরমাস পর্যন্ত করিতে হইল না। অম্বুরীকে একবার শুধু বাতাস করিতে বারণ করিয়াছিল। ঐ একটু ছন্দপতন, তা ভিন্ন ঠিক যেন দু-জনে মিলিয়া বেশ ভাল করিয়া রিহার্সাল-দেওয়া একটা পার্ট করিয়া যাইতেছে।

শাশুড়ীকে অম্বুরী জপে বসাইয়া আসিয়াছিল; একবার গিয়া তুলিয়া লইয়া আসিল। আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি রাত্রিকালীন জলযোগ সারিলেন; শেষ হইলে অম্বুরী তাঁহাকে আর সানুকে বিছানায় দিয়া আসিল। এইবার যত রাজ্যের রাজকুমার, কোটালপুত্র, কেশবতী কন্যে, রাক্ষস, হুমো জড় হইবে, তাহাদের ভিড়ের মধ্য দিয়া নাতি-ঠাকুমা স্বপ্ন-বুড়ীর রাজ্যে গিয়া হাজির হইবে।

অনিল বলিল, "চল্ এবার ছাদে যাই, শৈল। অম্বুরী, তুমি এস শীগ্গীর।"

আমার অবর্তমানে কি হয় জানি না, কিন্তু আমি থাকিলে অনিলও ওকে "অম্বুরী' বলিয়া ডাকে। ওর আসল নাম মুক্তকেশী।

অম্বুরী রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে ঘুরিয়া হাসিয়া বলিল, "কেউ তাহ'লে

শাড়ি প'ড়ে হেঁসেলে ঢুকুক। আমার একটু দেরি হবে আজ আসতে।"

উপরে উঠিয়া বেশ খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেলাম, এ-বাড়িতে অম্বুরী আছে জানিয়াও। ছোট ছাদটা বেশ ভাল করিয়া জল দিয়া ধোওয়া; প্রথম তাপটা কাটিয়া গিয়া এখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে একটা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি পাতা। দুইটা তাকিয়া, এক বাটা পান, দুইখানা পাখা আর সবচেয়ে যা চমৎকার—শীতলপাটির একপাশে একটা কাঁসার রেকাবি করিয়া এক রেকাবি টাট্‌কা বেলফুল।

প্রশ্ন করিলাম, "অম্বুরীর বশে কোন দৈত্য আছে নাকি অনিল? এ যে রীতিমত আরব্য-রজনীর ব্যাপার ক'রে তুললে। নীচ থেকে একবারও যে ওপরে এসেছে মনে পড়ে না তো।"

অনিল গিয়া একটা তাকিয়া আশ্রয় করিল, বলিল, "এর মধ্যে একটাও তোর জন্যে বিশেষ ক'রে আয়োজন নয় শৈল। এই ক'রে বাইরে আমার একটা বদনাম ধরিয়ে দিয়েছে—বৌয়ের আঁচল-ধরা। অবশ্য আমার গতিবিধি আছে সব জায়গায়, ওই বরং 'কুনো হ'য়ে গেলে', বলে ঠেলে পাঠায়, কিন্তু থাকতে পারি না। দোষ দিতে পারিস সে জন্যে?·· তোর খবর কি বল এবার।···নে, পান খা, তুই রাঁধুনি দেওয়া পান ভাল-বাসিস—প্রায়ই বলে। তোর জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে শৈল, লক্ষ্য করেছি। মনে করিস্ নে শুধুই চোখ বুজে এই রকম অম্বুরী-সেবন করে যাচ্ছি। করেছি লক্ষ্য। কি ব্যাপার বল্ দিকিন? সোঁদা ছেলে, ছাত্রীর টুইশ্যন নিতে গেলি কেন? আমরা গরীব ··"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ছাত্রীর আমার বয়স ন' বছর।"

অনিল থমকিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। ও যে একটা অন্যায়, অশোভন ধারণা করিয়া বসিয়াছিল সেইজন্য একটু রাগিয়া বলিল, "চিঠিতে আগে লিখিস নি তো?"

বলিলাম, "জানতাম দেখা হ'লেই শুনবি। বয়সের কথা ওঠে কোথা থেকে?"

অনিল একটু হাসিয়া ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তাও তো বটে, আদর্শ শিক্ষক!"

আমি হাসিলাম। অনিল প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে? কিছু একটা ব্যাপার তো হচ্ছেই।"

এড়াইবার যো আছে ও ছোঁড়াকে? একে ওর দৃষ্টি, তায় আমার অন্তস্তলের প্রত্যেক অলিগলি নখদর্পণে! কিন্তু মীরার কথা যেন মনে হয় মনের আরও গহনের জিনিস।

জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা হাওয়া উঠিয়াছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় বেঙ্গুন-লতার ফুলের গন্ধ কোথা থেকে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে—টাটকা চন্দনের মত গন্ধ; এক-একবার কাছের বেলফুলের মিঠেকড়া গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে···মীরার

কথা যেন ভীরু অবগুণ্ঠনে আমার চিত্তের নিভৃততম কোন এক জায়গায়।

আমি একবার জড়িত দৃষ্টিতে চাহিলাম অনিলের পানে। ওর "তাহ'লে ?"-র উত্তর দিতে পারিতেছি না।

অনিল যেন একটু নিরাশ হইল, ব্যথিত হইল, একটু অপ্রতিভ ও হইল যেন; বলিল, "থাক তবে, অন্য সময় ও-কথা হবে'খন। তোর এম-এ পড়ার কত দূর কি করছিস ?"

আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন মোচড দিয়া উঠিল।—এ কি করিলাম। অনিলকে জীবনে কখনও এত আলাদা করিয়া দেখিব, এ-ধরনের একটা বৈধম্যের আঘাত দিতে পরিব, কবে ভাবিতে পারিয়াছিলাম এ-কথা ? চিরকালই বিশ্বাস ছিল আমার অন্তরের যদি খুব কাছে কেউ আসে তো অনিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার চেয়েও কাছে আর জায়গা কই ?

সেই অনিলের কাছে মীরার কথা গোপন করিলাম।

নীচে অম্বুরীর গলা, "খোকন, যেন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়ো না বাবা, আমার হ'ল বলে।"

মনে পড়িয়া গেল ঠিক এই জিনিসটি অনিল নিজের জীবনে দাঁড় করাইয়াছে— অণুমাত্রও ব্যবধান রাখে নাই ওর, অম্বুরীর, আর আমার মাঝখানে ··ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ঠিক ধরিয়াছে আমি বদলাইয়া গিয়াছি, বরং বোধ হয় পূর্ণভাবে ধরিতে পারে নাই যে কত বদলাইয়া গিয়াছি।

আমি অনিলের শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া একটু কুণ্ঠার সহিত ওর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। ওর প্রশ্ন সেই "তাহ'লে ?"-র উত্তরেই বলিলাম, "ঠিক যে কি ক'রে আরম্ভ করব বুঝতে পাচ্ছি না অনিল। মীরা বলে একটি মেয়ের উল্লেখ ছিল কি আমার চিঠিতে ?"

অনিল সংশোধনের ভঙ্গিতে বলিল, "মীরা দেবী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, মীরা দেবী। সে আমার ছাত্রীর বোন।"

অনিল পূরণ করিয়া লইল,, "বড় বোন।"

"হ্যাঁ, বড় বোন।"

"অবিবাহিতা।"

"হ্যাঁ, অবিবাহিতা, কিন্তু তুই জানলি কি ক'রে ?

"আগে চিঠি পড়ে ভেবেছিলাম বিবাহিতা, কিংবা বোধ হয় কিছুই ভাবিনি, ছাত্রী ছেড়ে ওদিকে খেয়ালই যায়নি। এখন বুঝছি অবিবাহিতা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে বুঝলি ?"

অনিল বলিল, "খুবই সহজে। তুই প্রেমিক, তোর বুদ্ধির জড়তা এসেছে; আমার বন্ধুর জীবন-মরণ সমস্যা, কাজেই আমার বুদ্ধিটা আরও খুলে গেছে।···তারপর ?"

একবার বাঁধ ভাঙিলে আর কিছু আটকাইল না। একটি একটি করিয়া অনিলকে সব কথা বলিলাম—প্রথমদিনের সাক্ষাৎ হইতে শেষ দিনের অশ্রু পর্যন্ত। ওর ঘৃণার কথাও বলিলাম; বলিলাম, যখনই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, মীরা যেন ধাক্কা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে দূরে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে। এক আশ্চর্য কাণ্ড। অপর্ণা দেবীর কথা বলিলাম—হেরিডিটি সম্বন্ধে তাঁর থিয়োরি। মীরার স্তাবকদের কথা বলিলাম, বিশেষ করিয়া স্তাবক-চূড়ামণি নিশীথের কথা। সরমার কথা বলিলাম; সরমাকে লইয়া মীরার সেদিনকার সেই অসূয়ার কথা, প্রায় যাহার জন্য ঘটনা-পরম্পরায় এখানে আসা আমার। মীরার কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বলিবার মধ্যে যে এত মধু লুকানো ছিল জানিতাম না। শেষকালে সত্যই কতকটা আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম, "এখন আমি কি করি অনিল ও কখনও আমার স্তরে নামতে পারবে না; যখনই অজান্তে নেমে আসে, কতখানি নামতে হয়েছে দেখে শিউরে ওঠে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই ওর ঘৃণার রহস্য। বোধ হয় ও আমায় ঘৃণা করে না; যেটাকে ঘৃণা বলছি সেটা হয়তো ওর আতঙ্ক, কিন্তু, তবুও আরও একটা কথা, —আমার দিক থেকে দেখতে গেলেও আরও দরকারী কথা। আমি ওর স্তরে উঠি কি করে? আর সবচেয়ে যা দরকারী কথা তা এই যে—কেন উঠতে যাব? অনিল, যখন প্রথম বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলাম, একটা আশা মনে জেগেছিল বড়লোকের যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কত কী-ই না হ'তে পারে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যেতে পারি। এমন তো হচ্ছেও! কিন্তু এখন সেই সব প্রায় হাতের মধ্যে—আমি এম্-এ বেশ ভাল ক'রে পাশ করব নিশ্চয়,—মিস্টার রায়, অপর্ণা দেবী আমায় খুব ভালবাসেন—যেন, মনে হয় মাঝে মাঝে আমায় একটু বিচার ক'রে তৌল ক'রে দেখেন। আমার দিকে মীরার ঝোঁক ওঁদের খুব সম্ভব জানা—আমায় যে মিস্টার রায় বিলেত পাঠাতে চান এমন ইঙ্গিতও দু-একবার পেয়েছি আমি। সবই অনুকূল। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজ্যের স্বপ্ন গোড়ায় দেখেছিলাম, এখন যেন শুধু স্বয়ংবর-সভায় গিয়ে বসা একবার! কিন্তু ঠিক এই সময়টায় আমারও মন বিরূপ হ'য়ে উঠেছে; অবশ্য রাজকন্যায় নয়, রাজ্যে। মনে হচ্ছে আমিই বা কেন উঠতে যাব নিজের জায়গা ছেড়ে মীরার সামাজিক স্তরে?—মীরাকে পাওয়ার একটা উপায় হিসেবে কেন মিস্টার রায়ের সাহায্য নিতে যাব? মীরাকে আমি ভালবাসি, নিজের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন ক'রে ওকে পাব; আমার ভালবাসাকে আমি বেচাকেনার জিনিস করব কেন?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "যৌতুক নেয় না বিবাহে?"

আমি ভাবের ঘোরে বাধা পাইয়া ওর মুখের পানে চাহিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "যা বললি, তুই নিজে সে-কথায় বিশ্বাস করিস্?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "সে উত্তর পরে দোব, তোর নিজের মতটাই আগে শুনি না।"

আমি বলিলাম, "যৌতুক নেওয়া চলে বিবাহে; কিন্তু এটা ঠিক তো যৌতুক নয়। আমি অযোগ্য; অর্থ, প্রতিষ্ঠা আর ওদের দৃষ্টিতে কালচার হিসেবে আমি নীচে, তাই আমায় মীরার যোগ্য ক'রে নেওয়া···এটাকে যৌতুক বলব, না অপমান? শুধু তো অপমান নয়—আমি যেখানে মানুষ হয়েছি তাদের সকলকেই অপমান।··· অনিল, আমি কোন রকম হীনতার কালি মেখে ওকে স্পর্শ করতে পারব না। ওরা যেটাকে যোগ্যতা বলে—মীরা পর্যন্ত—বোধ হয় এক মীরার মা ছাড়া আর সকলেই—আমি জানি সেইটেই হবে আমার দারুণ অযোগ্যতা, আমি এ রঙচঙে কাগজের বরমাল্য গলায় দিয়ে বিয়ের আসনে বসতে পারব না।"

অনিল হাসিল, হাসিয়াই জানাইল ওর-ও মনের কথা এই।

আমি বলিতে লাগিলাম, "আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল অনিল, কী একটা অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে যে পড়েছিলাম! এমন সময় তোর চিঠি পেয়ে যেন স্বর্গ পেলাম হাতে। আমি হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম কাদের অভাবে, কিসের অভাবে আমার এমন অবস্থা হয়েছে। মীরা যদি আমায় ভালবাসেই তো আমার যা দেশ, যা পরিজন আমার মন জুড়ে যারা অষ্টপ্রহর রয়েছে তাদের সুদ্ধু আমায় নিতে হবে ওকে। ঠিক বোধ হয় গুছিয়ে বলতে পারলাম না, অনিল। মনের অবস্থা ভাল ছিল না; নেইও এখন; কিন্তু বোধ হয় কতকটা এই রকম। মোট কথা..."

অম্বুরী উঠিয়া আসিল। বলিল, "মোট কথা শোনবার আর একজন অংশীদার এল। ঠাকুরপো কি আগের মত একটু রাত ক'রে খাও, না ব্যারিস্টার-বাড়িতে ঘড়ির অভ্যেস হয়েছে?"

অর্থাৎ বেশ খানিকক্ষণ গল্প চলুক। বলিলাম, "ধর বদ অভ্যেসই যদি হ'য়ে থাকে একটা, তো ছাড়া উচিত নয় কি সৎসঙ্গে পড়ে?"

৭

পরদিন দুপুর বেলার কথা।

অনিল আপিসে গিয়েছে। বলিয়া গেল চার-পাঁচ দিন ছুটির চেষ্টা দেখিবে অর্থাৎ বাকী সমস্ত সপ্তাহটা। অনিলের মা ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন। অম্বুরী বেড়াইতে গিয়াছে খুকীকে লইয়া। কোণের ঠাণ্ডা ঘরটা ধুইয়া-মুছিয়া, দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া আমার জন্য আরও শীতল করিয়া রাখিয়াছিল, খোকাকে লইয়া আমি শুইয়াছি। খুব ভাব হইয়াছে খোকার সঙ্গে। সকালে তাহার পছন্দমত আরও একরাশ খেলনা আনিয়া তাহার চিত্তটা একেবারে জয় করিয়া লইয়াছি! বেশ চমৎকার ছেলে; নাদুস-নুদুস,

মাথায় একমাথা তারকেশ্বরের মানত করা চুল, তিনটা জটা হইয়া গেছে ; একটু চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়া অভ্যাস বলিয়া সর্বদা ডমরুর দোলকের মত দুলিতে থাকে। কখনও কাপড় ঠিক রাখিতে পারে না, প্রায়ই কসিয়া গেরো দিয়া দিতে হয়, আবার কখন কি করিয়া খুলিয়া যায়, কাঁকালে জড় করিয়া লইয়া বেড়ায়। একটি শিশু ভোলানাথ। কথার মধ্যে 'ট' কারের বাড়াবাড়ি থাকায় আরও যেন আলগা, আপন-ভোলা বলিয়া বোধ হয়

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোকে কে বেশি ভালবাসে রে সানু ?—মা, না বাবা ?"

সানু বলিল, "ঠাম্মা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমার পর ?"

পাশের ডল্‌ পুতুলটা আরও কাছে টানিয়া বলিল, "টুমি।"

আর কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সানু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "বাট্রিরে ঠাম্মার কাছে য'বো বলে কাঁডলে কি হয় জান শৈল টাকা ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয় ?"

"হুমো ঢোরে নেয়।"

এর পরে হুমোর নানা রকম কীর্তিকলাপের কথা বলিতে বলিতে খোকা একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

আমারও ঘুম আসিবার কথা, কাল অনেক রাত পর্যন্ত ছাদের উপর গল্প-গুজবে কাটিয়াছে, কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। পল্লীর মধ্যাহ্ন কাল যেমন ছিল সেই রকমই স্তব্ধ, বরং বেশি। পাশের আগাছার মধ্যে একটা ঝিল্লীর অবিরাম সংগীত ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমি এই রূপের লালসাতেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছি, কাল মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজ রূপ যখন আরও নিবিড় হইয়া ফুটিয়াছে, তখন আরও মুগ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু আজ ভাল লাগিতেছে না। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতেছি। এই ঝিঁঝির ডাকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মনের অতল শূন্যতায় কোথায় যেন একটা করুণ ক্রন্দন উঠিয়াছে। ক্রমে অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া লিও সেক্রেসেন্টের দু-একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর শূন্যে যেমন ধীর সঞ্চরণে ফোটে তারা—অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া। আশ্চর্য, আর কাহারও কথা মনে পড়িবার আগে আমার মনে পড়িল সরমার কথা। তরুর কথা নয়, এমন কি মীরার কথাও নয়।

সরমা কিসের প্রতীক্ষায় আছে ? মীরার দাদার কথা যতটা শুনি, তাহাকে নিজের সমাজে বা নিজের দেশে কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে তাহার আশা নাই। সে বাড়িতে কাহাকেও চিঠি দেয় না, কেন না, চিঠি দেওয়ার একটি মাত্র যে উদ্দেশ্য শেষ

পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল—টাকা চাওয়া—বাড়িতে, বাহিরেও—সেটা সব জায়গায় বন্ধ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত মাত্র অপর্ণা দেবীর কাছে চিঠি আসিত—কচিৎ কখনও; কিন্তু টাকা পাঠাইবার বিপদ বা ব্যর্থতা তিনি উপলব্ধি করিতেই চিঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বহু দিন হইতেই। এখন অবশ্য অনেকের বিশ্বাস সরমার কাছে কখনও কখনও আসে চিঠি। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিশ্বাসটুকু পরিণাম থেকে কারণে গিয়া ওঠা, অর্থাৎ সরমা যখন শবরীর ধৈর্য লইয়া এখনও প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তখন নিশ্চয় ওর সঙ্গে যোগসূত্র আছে;—নিশ্চয় ও চিঠি পায়ই।

কিন্তু যদি থাকেও যোগসূত্র তো একতরফা, অর্থাৎ চিঠি দিলেও যে মীরার দাদা ঠিকানা দেয় না এটা নিশ্চয়, তাহা হইলে অন্তত আর একজনের সঙ্গে যোগটা থাকিয়া যাইত—অপর্ণা দেবীর সঙ্গে। সেটা নাই।

তাহার প্রকৃত খবর মাঝে মাঝে এখন যেটুকু পাওয়া যায়, সে এখানকার বিলাত-প্রবাসী ছাত্রদের কাছ থেকে। তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, শুধু একটা কথা স্পষ্ট তাহাতে—সে দিন-দিনই নামিয়া যাইতেছে। মীরার দাদা অর্থের শৃঙ্খল রচনা করিয়া বিদেশী সমাজের গহ্বরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যতদিন অর্থ পাইয়াছে শৃঙ্খল জুড়িয়া জুড়িয়া ক্রমাগতই নামিয়া গিয়াছে। এখন সে অদৃশ্যপ্রায়।

ইহাই দীর্ঘ আট বৎসরের ক্রমিক ইতিহাস। অপর্ণা দেবীর কথা মনে পড়িতেছে, প্রথম যেদিন দেখা হয়, বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত।"

সরমা এরই কাছে বাগদত্তা, এরই প্রতীক্ষায় আছে। শান্ত অল্পভাষিণী, চারিদিকে অসংযত বিলাসের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসের জীবন লইয়া এই আত্মবিলুপ্তির জন্য তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে সরমা। এত বড় করুণ দৃশ্য চক্ষে পড়ে না, ঠিক যেমন ওর মত সুন্দরীও সহসা পড়ে না চক্ষে। সরমার জীবনের সঙ্গে খর দ্বিপ্রহরের পল্লীর এই একটানা কলতানের—এই দহন-সংগীতের কোথাও যেন একটা মিল আছে—কী এর পরিণতি? এ কি শুধুই ভুল, একটা অপচয়? তাই যদি হয় তো এই বিরাট ভ্রান্তির সার্থকতা কি?—যদি ভ্রান্তির সার্থকতা থাকা সম্ভবই হয় নিতান্ত।

আমার মনে হয় এই তিল তিল করিয়া জ্বলার মধ্যেই বোধ হয় লোকোত্তর কোন বিপুল সার্থকতা লুকানো আছে, যার রহস্য শুধু সরমারাই জানে। কবি ফিক্‌রির দুইটা লাইন মনে পড়িল—

> কঁহা ব্ লজ্জতে উলফৎ পতংগ তুঝে
> মিলি যো শামাকে-ঘুল্ ঘুল্ কর জান দেনে মে।

[হে পতংগ, (প্রদীপের কাছে মুহূর্তের আত্মসমর্পণে) তুমি ভালবাসায় সে আনন্দ

কোথায় পাবে, যা পেল মোমবাতি তিল তিল ক'রে নিজের জীবন আহুতি দেবার মধ্যে?]

বাহিরের দিকের জানালার ছিদ্রপথে নিরাভরণ মধ্যাহ্নের আলো প্রবেশ করিতেছে, ঘরের অন্ধকারের বৈষম্য আরও তীব্র হইয়া ; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হাওয়ার হলকা। মনটা ঝিমাইয়া যাইতেছে। এক-একবার হঠাৎ উগ্র স্পষ্টতায় সিগ্‌নেট ক্রেসেণ্ট পূর্ণ অবয়বে ফুটিয়া উঠিতেছে—রেডিওর রেগুলেটারটা বাড়তির দিকে ঘুরাইয়া দিলে যেমন ঐকতান যন্ত্রসংগীতের শব্দগুলা হঠাৎ ঝংকার করিয়া ওঠে : মীরা—তরু—ইমামুল—অপর্ণা দেবী—মিস্টার রায়—বাড়ি, বাগান, পার্টি—আভিজাত্যের সচ্ছলতা—পুত্র-শোকাতুরা ভুটানী জননী—সব মিলাইয়া একটা সংগীত, একটা অদ্ভুত সিম্‌ফনি যার মূল সুর—কেমন করিয়া জানি না—সরমা।

খোকার শীতল, মসৃণ, নগ্ন গায়ে ধীরে হাত বুলাই! শিশুজীবনের উত্তপ্ত অঙ্গে ভগবানের চন্দন প্রলেপ। বেশ বুঝিতে পারি তপ্ত আঙুল বাহিয়া যেন শান্তি উঠিয়া আসিতেছে—হাত বুলাইয়া যাই, বুলাইয়া বুলাইয়া যেন আশ মিটিতেছে না।

মন আবার ঘুরিয়া যাইতেছে ; ঠিক শান্তিতে তৃপ্তি পাইতেছে না। চাই বেদনা, চাই দহন ; তাই বিধির বিধান এই যে শিশুর আগে আসিবে সরমা, আসিবে মীরা

আমি সেদিন বিরহের দীর্ঘ অবকাশে প্রেমকে যেন ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "হে জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অনবদ্য, তাই সৃষ্টির যা চরম ভাল তাহাই তোমার চরণে পড়ে অর্ঘ্য হইয়া, তাই তো তুমি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদেরই পূজা গ্রহণ করিয়াছ—রাজ্য, মান, লজ্জা, রূপ, যৌবন—সমস্ত বিত্তকেই ধুলিমুষ্টির মত পথে ফেলিয়া যাহারা তোমার মন্দির-তোরণে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তোমাকে পাইয়াছে সরমা, নিজেকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিয়া নিঃশেষ ভাবে তোমার চরণে বিলাইয়া দিয়াছে। পদে পদে এই হিসাব, আত্মাভিমানের এই চুলচেরা বিচার, মনের এই বণিগ্‌বৃত্তি লইয়া আমি তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিবার স্পর্ধা কোথা হইতে পাই?"

*   *   *   *

দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিয়া দেখিলাম জানালার ছিদ্রপথে আলো নরম হইয়া আসিয়াছে। দরজা খুলিয়া দেখি অম্বুরী দাঁড়াইয়া ; বলিল, "বেলা পড়ে এসেছে যে ঠাকুরপো, খুড়ো-ভাইপোতে খুব ঘুমোচ্ছ। কাল অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল, না?"

বলিলাম, "হ'য়ে থাকবে, কিন্তু ক্ষতি হয়নি ; কাল রাত্তিরটাও যেমন ভাল লেগেছিল আজ দিনের ঘুমটাও তেমনি চমৎকার লাগল।"

মুখ-হাত ধুইলাম। অম্বুরী খোকাকে তুলিয়া আনিয়া বলিল, "এবার রক্ষে ওই

আমগাছের ছায়াটায় মাদুর পেতে দিই ঠাকুরপো। সরবত ক'রে দোব, না চা ?···বেশ চা-ই হবে। তারপর একটা ফরমাস আছে—অমন সরবতের নেশা ছাড়িয়ে যারা চা-য়ের নেশা ধরিয়েছে তাদের কথা বলতে হবে।"

তাহার পর আমার মুখের পানে কৌতূহল-দীপ্ত চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "আরও নেশা যদি কিছু ধরিয়ে থাকে, সেসব কথাও ; ছাড়বার পাত্রী নই আমি।"

৮

ছোট মেয়েটাকে বুকে করিয়া একটু ঘুরিলাম। ওর সব চেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে আমার চশমা। মুখ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখিল ; তাহাতে রহস্য পরিষ্কার না হওয়াতে হাত বাড়াইল। আমি হাতটা ধরিয়া লইতে মুখ আগাইয়া আনিয়া যেই একটা কামড় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, খোকা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠব্বনাশ ! ওকে খেটে ডিও না শৈল টাকা, পেটের অসুখ করবে। খুকু টশমা খেও না ! টেটো ! বিচ্ছিরি !"

মুখটা কাল্পনিক তিক্তস্বাদে যতটা সম্ভব বিকৃত করিয়া বোনকে বিরত করিবার চেষ্টা করিল। খোকা অভিভাবক হইয়া উঠিতেছে। যাহার নীচে ছোট বোন রহিয়াছে সে কি নিজে আর ছোট থাকিতে পারে কখনও ?

অম্বুরী চা আর হালুয়া তৈয়ার করিয়া আমার মাদুরের পাশে রাখিয়া নিজে আমার সামনে সিঁড়িটাতে বসিল। মাদুরে খোকা আর খুকীকে বসাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম, "জেঠাইমা কোথায় ?—ওঠেননি এখনও ?"

অম্বুরী বলিল, "উঠেছেন, হারাণীর মা ভেতরে পাট করছে, যতক্ষণ তার আওয়াজ পাবেন বকর বকর করবেন। এ সময়টা আমি নিশ্চিন্দি থাকি একটু। পাট সেরে হারাণীর মা-ও যাবে, ওঁকেও হাত-পা ধুইয়ে জপে বসিয়ে দোব। এই আমার রুটিন"—বলিয়া গর্বের অভিনয় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দেখ, আমিও ইংরিজী জানি ঠাকুরপো।"

সাম্বু মায়ের হাতটা টানিয়া ভীতভাবে বলিল, "খুকু শৈল টাকার টশমা খাবে মা, গলায় আট্‌টে যাবে না ?"

তাহার নিজের হাতে মুঠাভরা হালুয়া ; মা বলিল, "তুমিও তা বলে হালুয়া অতখানি খেয়ো না যেন, চশমার মত পেটে যেতে আটকায় না বলে ওতে পেটের অসুখ করবে না নাকি ?"

তাহার পর গল্প শুনিবার ভঙ্গিতে আবার একচোট ভাল করিয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া বলিল, "এবার যা বলছিলাম—কেমনবাড়ি, কেমন লোকসব, তোমার ছাত্রী···"

হাসিয়া ফেলিয়া দুষ্টামির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমি না বুঝিবার ভান করিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলাম, "বয়সের কথা জিজ্ঞেস করছ?—ন' বছর। বেশ চমৎকার মেয়ে, একটুও বেগ পেতে হয় না আমার পড়াতে।"

অম্বুরী হাসিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল। একবার আমার পানে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া বুকের উপর ধীরে ধীরে তর্জনীর ডগাটা ঘষিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েছেলেই তো? এসব বিষয়ে ওরা কবে হারিয়াছে কাহার কাছে? নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মুখটা আমার মতই গম্ভীর করিয়া ফেলিল! বলিল, "বেশ ভাল হয়েছে—হাল্কা কাজ; আর তোমার বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম বাড়িটাও ছিমছাম—কর্তা নিজে, গিন্নী, আর একটি মেয়ে—তোমার ছাত্রীর বোন।···কোথায় বিয়ে হয়েছে তার ঠাকুরপো?—খুব বড়লোকের বাড়ি? এদের তো শুনেছি জুটোমটরগাড়ি,তাদের?"

কিন্তু অত ঘুরাইয়া কথা বাহির করিবার দরকার ছিল না অম্বুরীর, কাল সন্ধ্যায় অনিলের কাছে যে সেইএকবার গোপন করিবারচেষ্টা করিয়াছিলাম,তাহার পর হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এদের দু-জনের কাছে সমস্ত কথাই একটি একটি করিয়া মেলিয়া ধরিব, অবশ্য স্ত্রীলোক হিসাবে অম্বুরীর সামনে খানিকটা আব্রু রক্ষা করিয়া। আমার এই তিনমাসব্যাপী সমস্ত অভিজ্ঞতা বলিয়া গেলাম অম্বুরীকে—মিস্টার রায়ের কথা, অপর্ণা দেবীর পুত্রগত অদ্ভুত বেদনাময়-জীবনের কথা, ভুটানীর সহিত দরদের সমতার জন্য তাঁহাদের অসম সখিত্বের কথা, রাজু বেয়ারার গুরুত্বপূর্ণ শব্দপ্রীতি, ইমামুলের অদ্ভুত আত্ম-প্রবঞ্চনা, বিলাস-ঝির কথা। গভীর অভিনবেশের সহিত অম্বুরী সব শুনিয়া যাইতে লাগিল। ওর স্বভাবটাই এমন—আর বিবাহের পর থেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর মুক্ত মেলা-মেশার মধ্য দিয়া অনিল এমন অভ্যাস করাইয়া দিয়াছে যে আমায় একটু সংকোচ করে না অম্বুরী, আজ যেন কোন দূরত্বই রাখিল না। গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিল, কখনও চক্ষে বস্ত্র দিল। যখন প্রয়োজন মনে হইল, নিঃশব্দে নিজের মন্তব্য দিল—"আহা, নিজে সুন্দর নয় বলে সুন্দরকে চাইতে পারবে না বেচারি? অবিশ্যি মেমসাহেব বলে একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে।·· হাসিও পায় বাপু, করছিস্ মালীগিরি, বিয়ে করতে হবে পাদ্রীসাহেবের ভাইঝিকে!"

অম্বুরী ডুকরাইয়া হাসিয়া ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝিয়ের ঘর-ঝাঁট দেওয়ার শব্দ থামিয়া যায়; বোধ হয় একটু বেখাপ্পা ঠেকে ওদের কানে।

তাহার পর বলি তরুর কথা এবং সব শেষে ও সবচেয়ে সবিস্তারে মীরার কথা। অবশ্য যেমন ভাবে অনিলকে বলিয়াছি অম্বুরীকে ঠিক সে-ভাবে সে-ভাষায় বলা চলে না। কর্মে নিয়োগের দিন থেকে এখানে আসার আগে পর্যন্ত মীরা-ঘটিত সব কথাই এক রকম খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিলাম। শুধু মন লইয়া ব্যাপার যেখানে,সেই সব কথাগুলা

বাদ দিয়া গেলাম।—যেমন অশ্রুর কথা বলিলাম না; যেমন, মীরাকে যে বলিয়াছিলাম—নিজের তাগিদেই থাকিয়া গেলাম সে- কথাও উল্লেখ করিলাম না!

অম্বুরী শুনিতেছে—একেবারে তদ্গত হইয়া; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়া আমার পানে চাহিতেছে, মুখের ভাব যে কত রকম বদলাইতেছে বলা যায় না। মাঝে মাঝে এক-একটা ছোট্ট প্রশ্ন করিয়া নিজের চিন্তার পথ প্রশস্তকরিয়ালইতেছে। গোড়াতেই খানিকটা শুনিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "নাম বললে—মীরা? কি, শ্রীমতী মীরাসুন্দরী দেবী?"

বলিলাম, "না, মিস্ মীরা রায়।"

অম্বুরী চক্ষু দুইটা একবার উপরে তুলিয়া কি একটু ভাবিয়া লইল যেন। আবার কাহিনী শুনিয়া চলিল। খানিকটা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয়নি বুঝলাম, কিন্তু কথাবার্তাও হচ্ছে না? যেমন বলছ—বেশ তো ডাগর মেয়ে··কত বয়স হবে ঠাকুরপো?"

নির্লিপ্তভাবে বলিলাম, "ওর বাপ-মা তো ওর ঠিকুজি গড়তে দেননি আমায়, কি ক'রে বলব? তবে আন্দাজে মনে হয়—এই আঠার-উনিশ-কুড়ি—।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "একুশ—বাইশ—তেইশ—সাতাশ—তিরিশ·· বেশ বুঝেছি · বল।"

একবার অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "ওদের মেয়েরা তো নিজেরাই বর খুঁজে নেয়, কিছু টের পাওনি তুমি?"

নির্লিপ্তভাবে হাসিয়া বলিলাম, "কি ক'রে পাব বল? বর শিকার করতে কি ও আমায় সঙ্গী ক'রে নেয়?"

একটা জিনিস লক্ষ্য করি—আমার এই ঔদাসীন্যে অম্বুরী যেন তৃপ্ত হয়। প্রশ্নটা করিয়াই তীব্র আগ্রহে আমার পানে চাহিয়া থাকে, তাহার পর উত্তরটা পাইয়াই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠে।

শুনিবার পাশে পাশে ওর চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। শেষ দিকে একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তুমি তো দু-জনকেই দেখেছ,—সরমা বেশি সুন্দর, না মীরা বেশি সুন্দর ঠাকুরপো?"

এবারও নির্লিপ্তভাবেই, কতকটা যেন এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এ বড় শক্ত প্রশ্ন করলে যে! আমি কি ক'রে বলি?—কারুর চোখে মীরা সুন্দরী, কারুর চোখে সরমা সুন্দরী।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "কি যে বলো ঠাকুরপো!—আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই লই; তোমার চোখে কে বেশি সুন্দরী?"

স্পষ্ট জবাব দিলাম না, বলিলাম, "মীরা কালো হোক, কিন্তু শ্রী আছে! অবশ্য সরমার কথা আলাদা।"

অম্বুরী আবার দৃষ্টি নত করিয়া কানে তর্জনীর ডগাটা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তার মানে ঠাকুরপোর চোখে মীরাই বেশি সুন্দরী।"—বলিয়াই একবার হাসিয়া আমার পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিল।

খোকা-খুকী খেলা করিতে করিতে রকের ওদিকটায় চলিয়া গিয়াছিল। খোকা ডাকিল, "ওমা ঠিগ্‌গির এস,—টোমার মেয়ের কাণ্ড!"

অম্বুরী গিয়া খুকীকে ধরিয়া আনিল। খুকীর কাণ্ড,—সে একটা টিকটিকির বাচ্চা ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। খোকা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ঠব্বনাশ, টিট্টিকিটা যদি সাপ্‌ হোট শৈল টাকা!"

বলিলাম, "তোর মামা যদি তোর মেসো হ'ত খোকা!"

এ ঠাট্টাটা দিনকতক পরে মুখ দিয়া বাহির হইবে না বোধ হয়, যেমন কড়া রকম ভদ্র হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু আপাতত এই আবেষ্টনীর মধ্যে ঠাট্টা করিয়া ফেলিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "ওর মামা-মাসীকে এর মধ্যে টানা কেন? তোমাদের ঘরে বোন দিয়েছে এই অপরাধে?"

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথা তুমি অভয় দাও তো বলি।"

বলিলাম, "আমার ভয়ের কথা না হয় তো অভয় দিই।"

অম্বুরী একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চক্ষু দুইটি একটু কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি মীরাকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো—যতটা শুনলাম তাতে মনে হয় ওর যেন তোমাকে পছন্দ হয়েছে।"

হাসিয়া বলিলাম, "যদি ক'রেই বসি কোন দিন তো আশ্চর্য হয়ো না অম্বুরী।"

অম্বুরীর মুখটা যেন এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। নামাইয়া লইয়া খোকার দিকে চাহিয়া একরকম বিনা কারণেই বলিল, "ও খোকা, কি হচ্ছে আবার?"

ওইটুকুর মধ্যে কিন্তু নিজেকে আবার সামলাইয়া লইল, অন্তত বাহিরে বাহিরে। খুকীকে বুকে চাপিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "খুকুমণি, তোমার কেমন রাঙা টুকটুকে কাকীমা আসবে!..."

খোকা ঐদিক থেকে প্রশ্ন করিল, "শৈল টাকীমা মা?"

অম্বুরী এতক্ষণে আমার পানে একটু চাহিল; হাসিয়া আমার পানে চাহিয়াই খোকার কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ, শৈল কাকীমা। বেশ হবে ঠাকুরপো তাহ'লে।

যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেক ভাবিয়া মিলাইয়া পরে রহস্যটা বুঝিয়াছি ; যাহা বুঝিয়াছি সেইটাই সত্য।

অম্বুরী সহ্য করিতে পারিল না। ঈর্ষা নয়। যে আমি একান্তভাবে ওদের মানুষ, মীরাকে লাভ করিয়া, মীরাকে অবলম্বন করিয়া কোন্ এক অপরিচিত উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইব, যেখানে অম্বুরীর প্রবেশ নাই—এই কল্পনাটাই অসহ্য অম্বুরীর পক্ষে। ঈর্ষা নয়, আসন্ন বিচ্ছেদের টন্‌টনানি, অম্বুরীর হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন টান পড়িল। অনিল আমায় অতটা চায়, কিংবা আমি অনিলকে এতটা চাই তাহার অনেক কারণ আছে—আমাদের দুইজনের বাইশ-তেইশ বৎসরের প্রতি দিনটি যেন জড়াইয়া-মিশাইয়া রহিয়াছে। অম্বুরী আমায় চায় অনিলের মধ্যে দিয়াও, তাহার উপর আরও একটা অন্য কারণে। শ্বশুরবাড়ির দিকে ওর কেহ আত্মীয় নাই, অনাত্মীয় হইয়াও আমি একা এই জায়গাটি পূরণ করিয়া আছি। আমি ওর দেবর, স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া দেবরের চেয়ে বেশি কিছু স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া অম্বুরী আমায় চারিদিক দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। অনাত্মীয় যখন আত্মীয় হয়, তার সঙ্গে যোগটা হয় আরও নিবিড়, কেননা সদাই একটা বিচ্ছেদের ভয় লাগিয়া থাকে—অল্প কারণেই অম্বুরী ঠিক এই রকম একটা আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াছে।

মীরা অন্য স্তরের জীব। রূপে, সম্পদে, শিক্ষায়, বিলাসে অম্বুরীর জগতের চেয়ে মীরার জগৎ অনেক উচ্চে, বোধ হয় স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গা; যতটা শুনিয়াছে অম্বুরী, তাহাতে ওর মনে হয় মর্ত্যের চেয়ে স্বর্গেরই বেশী কাছে। কিন্তু হাজার দুঃখ-বেদনা থাকাতেও মানুষ যেমন মর্ত্যকেই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, স্বর্গকে পরিহার করিয়াই চলে, মীরার জগৎ সম্বন্ধে অম্বুরীর মনের ভাবটাও সেই রকম—বেশ প্রশংসা করা চলে, আশ্চর্য হওয়া চলে, এমন কি আকাঙ্খা পর্যন্ত করা চলে, কিন্তু পাওয়া চলে না। তখন দেখা যায় শত দোষ থাকা সত্বেও এই মাটিমাখা জীবনই ভাল। যাহাদের আপন বলিয়া বুকে জড়াইয়াছে তাহাদের কেহই এই গণ্ডীর বাহিরে যায়, অম্বুরী এটা সহ্য করিবে কি করিয়া?

মীরার নামটা শুনিয়াও অম্বুরী খুশি হইতে পারে নাই—বেশ মনে আছে। নামেও যেন সম্পূর্ণ এক অন্য সুর। অম্বুরী নিজে যে জগতের মানুষ সেখানকার মেয়েরা কমলা, লক্ষ্মী, শিবকালী, কিরণ, খুব বেশি হইল তো নয়নতারা, নিভাননী—অম্বুরীর নিজের নাম মুক্তকেশী।

ওদের যে-কেহ অম্বুরীর দেবরকে অধিকার করুক, অম্বুরী তাহাকে বরণ করিয়া বুকে করিয়া লইবে। এদের মধ্যে কেহ আসিলে অম্বুরীর আর একজন বাড়িবে,

-মীরার আবির্ভাবে কিন্তু বাড়া দুঃখের কথা, আমি সুদ্ধু লুপ্ত হইয়া যাইব অম্বুরীর জগৎ হইতে।

মনে আছে এর আগের বারে আমি যখন আসিয়াছিলাম—মাস-ছয়েক পূর্বে, অম্বুরী বলিয়াছিল, "আমাদের গ্রামে একটি মেয়ে আছে ঠাকুরপো, তোমার জন্যে আমি এঁচে রেখেছি। তুমি বিয়ে কর; তারপর আবার এখানে ফিরে এস, আমরা দুটি বোনে কাছাকাছি থাকি।…কী পশ্চিমে পড়ে আছ বাপু? বুঝি না—"

মীরা অম্বুরীর সেই স্বপন ভাঙিয়া দিবে। তাই মীরার নামে অম্বুরীর মুখ শুকাইল।

৯

বেশ লাগিতেছে বটে, কিন্তু যতটা শান্তি পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম ততটা পাইতেছি না। যতক্ষণ অনিল থাকে, যতক্ষণ জেঠাইমার সঙ্গে অম্বুরীর সঙ্গে গল্প করি কিংবা খুকীকে লইয়া থাকি, দিব্য কাটে। একলা থাকিলেই মুশকিল—সেদিন লিগু সে ক্রেসেন্ট মুছিয়া যেমন সাঁতরা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সাঁতরাকে বিলুপ্ত করিয়া লিগু সে ক্রেসেন্ট জাগিয়া উঠে। ভাবিয়াছিলাম একবার ঘুরিয়া আসি, একটু শান্তি পাইব, আসিয়া দেখি কবে অলক্ষ্যে অশান্তির বীজ বপন করিয়া ফেলিয়াছি, অঙ্কুরিত হইয়াছে পল্লবিত হইবে, তাহার পর শাখা-প্রশাখা।…শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে।

একলা থাকিলেই মীরার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে তরু, অপর্ণা দেবী, মিস্টার রায়, দাসদাসী কত যে আপনার সব! কিন্তু ঐ এক মীরাকে ঘিরিয়া। তরু মীরার বোন—ভাবিতে এত ভাল লাগে!—কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা বেদনা…

কেমন যেন একটু ভয় হয়—যেখানেই যাইব, এই বেদনা কি জন্মের সাথী হইয়া থাকিবে? এ কি বন্ধন! আবার এই বন্ধন হইতে মুক্তির কল্পনায়ও শিহরিয়া উঠে সমস্ত অন্তরাত্মা। ধর, মীরা নাই; বেদনাও নাই;—কি অসীম, দুঃসহ শূন্যতা!

অনিল সমস্ত সপ্তাহটা ছুটি পাইয়াছে। আজ আপিসে যায় নাই। সকাল বেলাটা দুইজনে ঘুরিলাম একচোট, দেখিয়া-শুনিয়া, দেখাশোনা করিয়া। দুপুরে দুইজনে আহার করিয়া শুইয়া আছি অনিলের ঘরে। গল্প করিতেছি। ছ'মাসের গল্প জমা আছে, একটু ফাঁক নাই যে নিদ্রা আসিয়া প্রবেশ করে।

অম্বুরী টানা বারান্দার ওদিকটায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া 'অন্নদামঙ্গল' কিংবা 'রামায়ণ' কি 'মহাভারত' পড়িতেছে, খুব নীচু স্বরে, দূর থেকে মাত্র একটা গুন্‌গুন আওয়াজের মত মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। আজকাল আমাদের খাওয়াইয়া, পাট

সারিয়া বই পড়িতে দেরি হয় বলিয়া অনিলের মা পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করেন।

হঠাৎ অম্বুরী বলিয়া উঠিল, "ও মা! তুমি কোথা থেকে? কবে এলে?"

বেশ একটা হাস্যোচ্ছল কণ্ঠে উত্তর হইল, "যমের বাড়ি থেকে। এসেছি কাল সন্ধ্যেয়।" "ব'স ঠাকুরঝি, তারপর কি খবর? দু-বচ্ছর আসনি, শুনি বড় কড়া লোক, আসতে দেয় না; তা ছাড়লে যে হঠাৎ?"

একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, অনিল উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাও বন্ধ করিয়া লইয়াছে।

সেইরূপ নি-খাদ কণ্ঠের উত্তর হইল, "জ্বালাস নে বউ, সত্তর বছরের নড়বড়ে একটা মনিষ্যি—মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ির দরজা-জানালাগুলোর মত—সে হ'ল কড়া, সে দেবে না আসতে! দু-বছর আসতে মন চায়নি, আসিনি; আজ মনে হ'ল, এলাম। তারপর, কি খবর? বর কোথায়? শুনলাম নাকি শৈলদা এসেছে? ··শুনলাম তোর একটা খুকী হয়েছে?—কোথায় বৌ?—আন না দেখি ··"

অনিল চুপ করিয়া আছে। আমিও প্রশ্নের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। স্মৃতি হঠাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে।

অম্বুরী উত্তর করিল, "তবু ভাল, খোঁজ রাখ দেখছি!"

কপট গাম্ভীর্যের স্বরে টানিয়া টানিয়া উত্তর হইল, "তুমি তো জান না ভাই, খোঁজ রাখা কত শক্ত। বলে, ছেলেয়-মেয়েয়, স্বামীতে-শ্বশুরে নিজের সংসারের কথা ভেবেই ফুরসত থাকে না; বিশেষ ক'রে কন্দর্পের মত স্বামী, সদাই ভয়—চোখের আড়াল করি আর কেউ কেড়ে নিক্ ··"

এক ঝলক আবার সেই তরল হাসি। অনিলের রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা একটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ওদিকে গম্ভীর হইয়া—

"না বৌ, মস্করা থাক্, এনে দে তোর মেয়েকে দেখি একবার; ছেলেটাই বা কোথায়?"

অম্বুরী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "ওদের কাছে, ঐ ঘরে।"

"তোর বর ঘরে?—শৈলদাও নাকি?"

অম্বুরী নিশ্চয় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "জেগে না ঘুমুচ্ছে লো?"

অম্বুরীও নীচু গলাতেই একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "মনে হয় তো ঘুমুচ্ছিল, কিন্তু তুমি যে রকম···"

"মুয়ে আগুন তোমার, বলতে হয় আগে। নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে, একটু গলা ছেড়েছিলাম

বটে, কিন্তু অনেক দূরে আছি। যা, তুই মেয়েটাকে নিয়ে আয় আস্তে আস্তে। ঐ কোণের ঘরে চল, এখানে স্থবিধে হবে না। শাশুড়ী কোথায়? তুই আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিস্ বৌ! দাঁড়া তো দেখি···ঠিক ইচ্ছে করে।"

তাহার পর দুইটা কণ্ঠের একটা উচ্ছল হাসি শোনা গেল।

অম্বুরী আসিয়া অতি সন্তর্পণে খুকীকে অনিলের বুকের কাছ থেকে উঠাইয়া লইয়া আবার খুব সাবধানে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমরা গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন, গাঢ় সুপ্তির নিঃশ্বাস উঠা-নামা করিতেছে।

প্রশ্ন হইল, "ঘুমিয়েছিল?"

"হুঁ।"

"ভাগ্যিস্! তা হোক, এখানে স্থবিধে হবে না, খুকীকে আমার কোলে দে, তুই মাতুরটা নিয়ে আয়।···বাঃ, কি চমৎকার হয়েছে রে!"

ঘন, আকুল চুম্বনের শব্দ হইতে লাগিল।

ওরা চলিয়া গেলে অনিল প্রশ্ন করিল, "চিনতে পারলি?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "সদু নাকি?"

"হুঁ।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দুইজনেই, তাহার পর আমিই প্রশ্ন করিলাম, "যা বললে ঠিক নাকি অনিল?"

"কি কথা?"

"এই সত্তর বছরের কথা?"

"না।"

"তবে?"

আবার একটুখানি চুপচাপ গেল।

প্রশ্ন করিতেছি না, কি উত্তর দেয় সেই উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছি। একটু পরে অনিল বলিল, "হিন্দুললনা স্বামী সম্বন্ধে কখনও এসব বিষয়ে সত্যি কথা বলতে পারে? নরকের ভয় নেই?—অন্তত পাঁচটা বছর কমিয়ে বলেছে।"

তাহার পর আর কোন কথাই হইল না। দুইজনেই বুঝিতেছি দুইজনেই জাগিয়া, অথচ যেন কথা কহিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে ওদিককার ঘর হইতে হাসির লহর ভাসিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার একটু আগে চা খাইয়া আমরা দুইজনে বাহির হইলাম। অম্বুরী বলিল, "মেলা রাত ক'রো না যেন।"

বলিল, "সে বন্দো রেখে?"

অম্বুরী বলিল, "রঙ্গ নয়, দু-জনে একত্তর হ'লে কোন্ জগতে থাক তার তো ঠিকানা থাকে না।"

খানিকটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম; এখানে আসিলে আমাদের যেমন অভ্যাস। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, যখন বিলম্বিত চন্দ্রোদয় হইল, তখন আমরা বড়পুকুরের ধারে। এদিকটা এখন জনবিরল হইয়া গিয়াছে। চৌধুরীদের তখন অবস্থা ভাল ছিল, মজা-নদী হইতে পুকুরে নূতন জল ফেলিবার জন্য একটা পাকা নালা করিয়া দিয়াছিল। সেটা যেখানে পুকুরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশেই পাকা ঘাট। এখন চৌধুরীদের মত এ দুইটারও অবস্থা শোচনীয়। ঘাটটা পরিত্যক্ত বলিলেই চলে, বাগ্দীপাড়ার মেয়েরা অল্প অল্প সরে। তাহারাও প্রায় লোপাট হইয়া আসিতেছে।

যদিও নিরুদ্দেশ ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়া, তবু দুইজনেই জানি কিসের টানে আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এটা ছিল আমাদের স্নানের ঘাট, সৌদামিনীর বাড়ি এখান থেকে বেশি দূর নয়। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া আমরা এইখানেই স্নান করিতে আসিতাম, বেশির ভাগ। প্রথম আকর্ষণ ছিল ঘাটের উপরের কামরাঙা, জাম আর অন্যান্য ফলের গাছগুলা, দ্বিতীয় আকর্ষণ সৌদামিনী। ক্রমে ধারাটা উল্টাইয়া গেল, আমাদের অজ্ঞাতসারেই। প্রথম আকর্ষণ হইয়া উঠিল সৌদামিনী, দ্বিতীয় আকর্ষণ জাম, কামরাঙা ইত্যাদি। পরে দেখা গেল জাম-কামরাঙার যা কিছু খাতির, সৌদামিনীকে লইয়াই।

সৌদামিনীর একমাত্র অভিভাবক ছিল ওর বুড়ি দিদিমা—অত্যন্ত ক্ষীণ একটা প্রভাব। ছেলেবেলা থেকেই ও যেন ছিল কারুর কেউ নয়, সম্পূর্ণ মুক্ত, নিঃসম্পর্কিত। বড় হইয়া যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে শিখি তখন 'উর্বশী' কবিতাটা পড়িলে মনে পড়িত সৌদামিনীকে, ঠিক মিলিয়া যাইত ওর সঙ্গে।

সেই স্মৃতির মধ্যে আসিয়া বসিয়াছি—আজ দুপুরে যাহা হইয়া গেল তাহার পর না আসিয়া উপায় ছিল না। কেহ কথা কহিতেছি না অথচ বুঝিতেছি দুইজনের মনেই এক প্রবাহ, সেই প্রবাহেই যেন ভাসাইয়া আনিয়াছে আমাদের মন ক্রমেই যেন ভরিয়া উঠিতেছে, এক সময় না এক সময় কথা কহিতেই হইবে, বোধ হয় উভয়ে উভয়ের অপেক্ষায় আছি। পূর্বদিকে চাঁদ একটু উপরে উঠিতে তীরে বৃক্ষরাজির উপর দিয়া আলো আসিয়া পড়িল। ধীর সঞ্চারে কখন একটা হাওয়া উঠিল—যেন কালের ও-প্রান্ত হইতে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল। বড়পুকুরের কালো জল রূপালী রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমিই কথা কহিলাম, বলিলাম, "সদুর কথা তুই আমায় কখনও বলিস্‌নি তো অনিল।"

অনিল স্থির দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়াছিল, বলিল, "আশ্চর্য হলি ?"

উত্তর করিলাম "হলাম বই কি !"

অনিল সেইভাবেই বলিল, "তার চেয়েও একটা আশ্চর্য হবার আছে—অন্তত আমার মনে হয়।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

উত্তর হইল, "তুই কখনও জিগ্যেস করিস্‌নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "না, করিনি জিগ্যেস। বহু দিন আগে এক বার জিগ্যেস ক'রে শুনলাম, বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আর কি জিগ্যেস করব ?"

অনিল বলিল, "তা তো বটেই ;—পরস্ত্রী !"

একটু পরে বলিল, "আমাকেই জিগ্যেস করেছিলি, আমি ঐটুকু খবর দিয়ে-ছিলাম। তুইও আর কিছু জিগ্যেস করলিনি, আমিও আর তুলিনি ওর কথা। ভাবলাম পরস্ত্রীর কথা শুনিয়ে মহাসাত্বিক ব্রহ্মচারীর ব্রত ভঙ্গ ক'রে মহাপাতকের ভাগী হই কেন ?"

অভিমানের কথা অনিলের ! ওর মুখের পানে চাহিলাম—স্ফীংক্‌সের মত সামনেই চাহিয়া আছে, মুখের প্রতিটি রেখা কঠিনভাবে নির্ব্বিকার।

একটু পরে আমার মুখ থেকে যেন আপনি-আপনিই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল, "শেষে পঁচাত্তর বছরের বুড়োর হাতে পড়ল ? ··সহ্ !"

অনিল বলিল, "যখন পড়েছিল তখন অত কোথায় ? পাঁচ বছর তো কেটেও গেল !"

এর পর বহুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বাগ্দী-পাড়ায় একটা গুপী-যন্ত্রের আওয়াজ উঠিল, দু-একটা আলো নিবিল। ··মৌন বিস্ময়ে ভাবিতেছি পাঁচটা বৎসর সৌদামিনী এইভাবে কাটাইল।—প্রথম যৌবনের পাঁচটা বৎসর। নারীজীবনের সার সম্পদ ! ··কী ব্যর্থতা !···

এক সময় কঠোর মুখটা আমার পানে ফিরাইয়া অনিল বলিল, "শৈল, তুই সদুকে বিয়ে কর ; মীরা যে হবে না বুঝতেই পাচ্ছিস্। She is too far off (ও বহু দূরে)।"

এত ধাক্কা জীবনে কম পায় লোকে। বলিলাম, "ওর স্বামী !···তুই কি বলছিস্ অনিল !"

অনিল স্থির কণ্ঠে বলিল, "না, ওর স্বামী থাকতে থাকতে নয়, মরে—মানে স্বর্গ-গত হ'লে।"

অনিল কথা কহিতেছে।—আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম ; কহিলাম, "তুই বলছিস্ অনিল ? সদুর বৈধব্য কামনা করছিস্ ?—সদুর ?—অনিল···তুই !"

আমার ভাষা জোগাইতেছিল না।

অনিল বলিল, 'তাই কামনা করলাম শৈল ?—না কামনা করছি ও চিরএয়োস্ত্রী হয়ে থাকুক ? ··তুই যে অন্তত এখনও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বাঁচবি এটা আশা করা যায় না ?"

তাহার পর অনিলের মুখ খুলিয়া গেল। বলিল, "আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ঐ অশীতিপর বুড়োকেই গন্ধর্বের রূপযৌবন দিতাম শৈল—সব ভুলে—শুধু সৌদামিনীর জন্যে, কিন্তু তা হবার যো নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি, সিঁথির সিঁদুরের উপর বড় মায়া সদুর—কাকে একবার সজল চোখে বলেছিল—'কপালের ঐ আলোটুকু জলতে থাকাই কি কম ভাগ্যি ?'—বুড়োকে এখানে চিকিৎসা করাতে নিয়ে এসেছে, কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার শৈল, আমি দেখে পর্যন্ত এসেছি এর মধ্যে,—দরকার আছে বলে আজ সকালে একবার বেরিয়ে গেছলাম না ?—লোকটা যে এতদিন বেঁচে ছিল কি ক'রে সেইটেই আশ্চর্যের কথা, আর এখন যা অবস্থা হয়েছে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়, মনে হয় যেন মরবার আগেই ভূত হ'য়ে বসে আছে ! সদুর বর !···কাল চল, একবার দেখে আসবি শৈল, ভাগবত হালদারের বাড়িতে রয়েছে···।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ভাগবত হালদারের বাড়িতে !"

অনিল বলিল, "ও, তাও তো বটে, তুই যে কিছুই জানিস্ না !—হ্যাঁ, সদু এখন ভাগবতের ওখানেই ওঠে। ভাগবত এখন ওর মস্ত বড় অভিভাবক, একেবারে বড় কুটুম ! ওর দিদিমা মারা যেতেই ভাগবত ওপরপড়া হয়ে ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল,—সেই থেকেই। সদু তখন সমর্থ মেয়ে, তা ভাগবতের দয়াতে একদিনও তাকে অরক্ষিত থাকতে হয়নি। কেউ বললে, 'সাবাস ভাগবত !' কেউ সদুর জন্যে একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, কেউ বললে, 'ও যা মেয়ে, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছুল—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে' তখন ব্যাপারটা অতশত বুঝি নি, শুনে যেতে লাগলাম। কিছুদিন গেল, তারপর এল ভাগবতের উপকারের দোসরা দফা। একদিন গ্রামে জন দুই-তিন নতুন লোক দেখে খোঁজ নিয়ে টের পেলাম ভাগবতের বাড়ি বরযাত্রী এসেছে—সদুর বিয়ে। দিনটা বেশ মনে আছে। বরযাত্রীদের দেখে আমি সদুর সঙ্গে দেখা করলাম। একটু গা-ঢাকা হয়ে এসেছে ; খিড়কীর পুকুরে গা ডুবিয়ে সে গামছা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছে, ঘাটে রক্ষক হিসাবে ভাগবতের ছোট মেয়ে নারাণী। ভাগবতের বাড়িতে লোকজন তো কমই, বিশেষ কাউকে ডাকেওনি—বললাম, 'তোর বর দেখে এলাম সদী।' বিয়ের জন্যে মুখখানাকে ঘষে ঘষে রাঙা ক'রে ফেলেছে—আবছায়া

হ'য়ে এলেও বেশ বুঝতে পারা যায়, কি রকম সৌখীন জানিসই তো। গামছাটা সরিয়ে মুখের একপাশে জড় ক'রে বললে, 'ও মা, অনিল ? —এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, আমি বলি হঠাৎ কে কথা কয় ? কি রকম বর দেখলি রে ?' বলে গামছা দিয়ে মুখটা সব ঢেকে ফেলে শুধু কৌতুকভরা চোখ দুটো বের ক'রে আমার পানে চেয়ে রইল। বললাম, 'ভালই।' সদু হেসে বললে, 'তবে যে শুনেছিলাম বড় বুড়ো ? অবিশ্যি আমায় কেউ বলেনি, এমনি শুনেছিলাম।' আমি বললাম, 'তোর শ্বশুর খুব বুড়ো সদু, বর-যাত্রীর আর সবাইও বুড়ো-বুড়োই, শুধু তোর বর দেখলাম কম বয়সী, মানে এই ছাব্বিশ, সাতাশ—তিরিশের মধ্যে।' সদু মুখের জলটা কুলকুচি ক'রে ফেলে দিয়ে বললে, 'মরুক গে, শ্বশুর নিয়ে তো আর ধুয়ে খাব না'—বলে খিলখিল ক'রে হেসে বললে, 'তুই এবার সর্ অনিল, উঠতে দে আমায়··আর শোন্, বিয়ে দেখতে আসবি তো ? নিশ্চয় আসবি। তোকে নেমন্তন্ন করেছে ? নিশ্চয় করেনি ; ভাগবত-কাকার জানাশোনা নিজের দলের ক'জন ছাড়া কাউকে বলেনি। না করলেও আমি করলাম। বিয়ে আমার, ভাগবত-কাকার তো বিয়ে নয়'—বলে আবার একবার চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

গেছলাম বিয়ে দেখতে অনিমন্ত্রিত হ'লেও অবশ্য না গেলেই ছিল ভাল। ছাদনাতলায় দেখলাম শ্বশুরই বর, বরোচিত লজ্জায় এবং শ্বশুরোচিত বয়সে এত ঝুঁকে গেছে যে মুখই দেখা যায় না প্রায়। আমার যে কী হ'ল !—না ভাল ক'রে বুঝে কি ভুলটাই ক'রে বসে আছি ! আমি দাঁড়াতে পারিনি, কিন্তু তারই মধ্যে সদুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'য়ে গেল, সে কী নীরব মর্মন্তুদ দৃষ্টি !—যেন এত বড় বিদ্রূপটা আর যার কাছে হোক, অন্তত আমার কাছে ও প্রত্যাশা করেনি।"

অনিল আবার চুপ করিল। পাড়াগাঁ হিসাবে রাত্রি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বাগ্দী-পল্লীতে দুই-একটা যে আলো ছিল নিবিয়া গিয়াছে শুধু জাগিয়া আছে বৈষ্ণব ভক্তের সেই গুপী-যন্ত্রটা। আমার দুইজনেই আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল প্রশ্ন করিল, "বদলালো মত ?"

মনের যে রকম অবস্থা, একটু বিরক্তিও লাগিল। অনিল দার্শনিক, সবাই তো তাহা নয়। মনের ভাবটা চাপিয়া বলিলাম, "থাক্ ও-কথা এখন অনিল।"

অনিল বুঝিল ; বলিল, "নাই বদলাক, একটা কথা শুনিয়ে রাখি। জানিস্ তো সাঁতরায় 'ভাগবত হালদারের উপকারের দুই দফা' বলে একটা কথা আছে ?"

আমি ওর মুখের পানে চাহিলাম।

বলিল, "প্রথম দফা—টাকা হাওলাত দেওয়া, অমন খুঁজে খুঁজে উপকার ও ছাড়া আর কেউ পারবে না ! তার ওপর সুদের তাগাদা নেই—টাকা যে ধার দিয়েছে

ভুলেই গেছে যেন—বলে 'গেরস্ত যখন দেবার দেবেই, তাগাদা দিয়ে মিছে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ফেলা কেন? ফলে ওর সম্বন্ধে লোকে নিশ্চিন্দি হয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় ভাগবত তোমার কাঁধ থেকে বিষয়-সম্পত্তির বোঝা পর্যন্ত নামিয়ে তোমায় আরও নির্ভাবনা ক'রে দিলে।...সদু প্রথম দফা পেয়েছে এখন দ্বিতীয় দফা বাকি, ভাগবত তার গোড়াপত্তন ক'রে রেখেছে। অবশ্য সদীর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সে নিজে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাহিলাম।

অনিল বলিতে লাগিল, "সদুর স্বামী ভাগবতের কুটুম। সে যদি স্বর্গে যায় ভাগবত কি সদুকে ঠেলতে পারে? যে-ভাগবত, যখন একেবারেই কোন সম্পর্ক ছিল না পরের বোঝা বাড়ি এনে থুয়েছিল। গোড়াপত্তনের মধ্যে আরও একটা দূরদৃষ্টি আছে ভাগবতের।—সদুর বর আবার যে-সে কুটুম নয়, দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী?—ভাগবতের এমনই আটঘাট বেঁধে কাজ করা, মানুষেও সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ একটা কিছু হচ্ছে বলতে পারবে না, ভগবানেও নয়। সবার মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছ। অবশ্য সদু এখনও ওকে আগেকার মত 'ভাগবত-কাকা' বলেই ডেকে আসছে, বোধ হয় আশা করে এইটেই হবে ওর বর্ম, ভাগবতের উপকারের পরিণতি থেকে ওকে বাঁচাতে।"

অনিল আবার একটু চুপ করিয়া বলিল, "বুঝেছি তোর মনের ভাব শৈল। সদুর বৈধব্যকে ওর মুক্তি বলতে প্রাণে লাগে, কিন্তু আমি জানি সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যাই বলুক, ও-ও মনে মনে ক্লান্ত। আজ দুপুরে শুনলি তো?...তারপর, বিধবা-বিবাহ ক'রে সদুর জীবনে দাগ, লাগানো!—শিউরে উঠেছিস ভাবতেই। কিন্তু সদুর সামনে ঐ নরক ভাগবতের দ্বিতীয় দফা উপকার।...দেখ্ ভেবে, জীবনকে, সমাজকে তোরা শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিস্, আমার মত নাস্তিকের আবার বেশি বল মানায় না।"

"চল্, ওঠা যাক্, রাত অনেক হ'ল। অম্বুরীর কাছে একটা মিথ্যে জবাবদিহি দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চল।"

১০

কয়টা দিন গুমট করিয়াছিল, পরের দিন সকাল থেকে মেঘ জমিতে জমিতে দুপুরের পর বৃষ্টি নামিল। এই জন্যও, তা-ভিন্ন মনেও দুইজনের মেঘ জমিয়া আছে, সে জন্যও, আর মোটেই বাহির হইলাম না। অম্বুরী বলিল, "হয়েছে ভাল, কাল যেমন আমায় ভাবিয়েছিল..."

বিকালে দুইখানা চিঠি পাইলাম; একটি বাড়ির চিঠি রিডাইরেক্ট করা, একটা তরুর। তরুর সেই প্রীতি-উপহার ছাপা হইয়াছে এক কপি পাঠাইয়া দিয়াছে। সত্যই

খুব ভাল করিয়া ছাপাইয়াছে মীরা, একমাস কি নিউ-ইয়ার কার্ডের মত চারখানি মোটা মোটা পাতার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে ছাপা। চওড়া সবুজ রেশমের ফিতা দিয়া বাঁধা। তরু লিখিয়াছে মীরা নাকি দুঃখ করিয়াছে পদ্যটি যেমন, তাহার যোগ্য ছাপানো হইল না। নিশীথবাবু আসিয়াছিলেন, মীরা নিজের হাতে একখানা দেয়। নিশীথবাবু বলিলেন,—ভয়ংকর চমৎকার হইয়াছে, তিনি কখনও এমন সুন্দর প্রীতি-উপহার পড়েন নাই। আমি চলিয়া আসিতে তরুর মন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে খাবার সময় ওর বাবা, মা দুইজনেই নাম করিতেছিলেন। ওর বাবা বলিলেন, "তরুকে নিয়ে মাস্টারমশাই না হয় বিলেতে চলে যান না, ইচ্ছে থাকে নিজেও কিছু শিখে আসুন।" মা বলিলেন, "লক্ষ্মী-পাঠশালার শখ এর মধ্যেই মিটে গেল?" তাহার পর থেকেই ওর বাবা চুপ করিয়া গেলেন। যদি যাইতে চাই আমি বিলাত, একাই হোক, বা তরুকে লইয়া হোক—তাহা হইলে ওর দিদি চেষ্টা করিতে পারে। আজ আমার ঘরে বসিয়া এই কথা বলিল।

আর একটা কথা বলিল দিদি। বলিয়াছে, "তরু, তোমার মাস্টারমশাইকে সাবধান ক'রে দাও, তাঁর জন্যে মস্ত বড় একটা সারপ্রাইজ তোয়ের করেছি আমি, নোটিশ দিয়ে রাখলাম!"

তরুকে কিছু বলে নাই মীরা, আমি কিছু আন্দাজ করতে পারি কি?

চিঠিটা যখন পাইলাম তখন অম্বুরীও ছিল সেখানে বসিয়া; প্রশ্ন করিল, "সারপ্রাই না কি লিখেছে, ওটার মানে কি ঠাকুরপো? সারপ্রাই তোয়ের করা কি?"

অনিল বলিল, "তার মানে হঠাৎ এমন একটা কিছু ক'রে বসবে যাতে শৈলেনের একেবারে তাক লেগে যাবে।"

"আর আমি ভাবলাম ঠাকুরপোর জন্য মস্ত একটা মালা তোয়ের করছে বুঝি। হাসি নয়, সত্যিই তাই ভেবেছিলাম—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কি ক'রে জানব বল? ভাবলাম ইংরিজীতে মালাকেই বুঝি সারপ্রাই বলে।"

অদ্ভুত আন্দাজে নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে পার ঢাক পিটিয়ে সাবধান ক'রে আর কে মালা দেয়। তা জজ-ব্যারিস্টারের মেয়ে, ওদের পদ্ধতি কেমন কি ক'রে জানব বল?"

একটু থামিয়া বলিল, "বেশ, তা কি সারপ্রাই করবে বলই না—মালা না-ই হ'ল।"

বলিলাম, "সেটা তো তোমায়ই জিজ্ঞেস করব মনে করছিলাম;—মেয়েছেলেদের সারপ্রাইজ, করবার কি সব রীতি তা আমরা কি ক'রে জানতে পারব?—বিশেষ ক'রে আমি বেচারা।"

অম্বুরী চক্ষু তুলিয়া চিন্তা করিতেছিল, অনিল বলিল, "হ্যাঁ, ভেবে আরও দু-একটা বল অম্বুরী, তোমার বা তোমাদের একটা সারপ্রাইজ করবার রহস্য তো জানাই গেল।"

অম্বুরী বিস্মিত ভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি ?"

"এই মালা তোয়ের করবার কথা। যদিও অভ্যেস হ'য়ে পড়ায় আমার কাছে ওতে কিছু সারপ্রাইজ নেই।"

অম্বুরী বলিল, "আমি তোমার জন্যে রোজ রোজ মালা তোয়ের করতে গেলাম! আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যেন।"

অনিল বলিল, "রোজ নয়; রোজ হ'লে তো আর সারপ্রাইজ হ'ল না। যেমন কোন রাত্তিরে যদি তেমন জ্যোৎস্না ফুটল, কিংবা ধর আজ রাত্তিরে—এই ঘন বর্ষা নেমেছে..."

অম্বুরী ধমক দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার লজ্জা বলে একটা বস্তু নেই? কি বেহায়াপনা হচ্ছে বল দিকিন ঠাকুরপোর সামনে?"

অনিল হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, যেন একটা ভুল সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, "ও ঠিক, মনেই ছিল না...শৈলেন, ওটা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার কথা..."

"আঃ কি জ্বালা গা!"—বলিয়া অম্বুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

অনিল বলিল, "অম্বুরীর সামনে কথাটা তুললে ও বোধ হয় মাকে বলত, মা আবার এই নিয়ে ভ্যানর ভ্যানর লাগাত, তাই ওকে দিলাম উঠিয়ে। জিজ্ঞাসা করছিলাম, বিলেত যাওয়ার কথাটা সিরিয়াস ভাবছিল্ শৈল?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'কথাটা কি সিরিয়াস্লি উঠেছে বলে তোর বিশ্বাস অনিল?

অনিল একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ধর, যদি ওঠে কখনও? যে ভাবেই উঠুক, উঠছে তো কথাটা? তোর নিজের কাছেও তো বারদুয়েক প্রশ্ন হয়েছে বললি। আমি যতটা বুঝেছি ব্যাপারটা তোদের দু-জনের সম্বন্ধে তরলতা কিংবা ঘনিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করছে। আমার মনে হয় এখানে রায়-দম্পতি ওঁদের মেয়েকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "ঠিক এখানেই ওঁরা আমার স্বাধীনতা নষ্ট করেছেন। আমি যেতে পারি যদি তরুর গার্জেন হ'য়ে যেতে হয়, কিন্তু সেটা হবে না অনিল।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কেন?"

বলিলাম, "যতদূর বুঝতে পেরেছি, তরুর বিলিতী কেরিয়ার ঐ লরেটো পর্যন্ত। ওর মায়ের ওপর দ্বিতীয় আর একটা আঘাত দিতে মিস্টার রায় সাহস করবেন না। তাঁদের ছেলের আঘাতই তাঁর পক্ষে দিন দিন মর্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে। ভুটানীর ব্যাপারটা যদি নিজের চক্ষে দেখিস্ তো স্পষ্টই বুঝতে পারবি, অপর্ণা দেবী ওর মধ্যে

দিয়েও নিজের পুত্রশোকটা আর একবার ক'রে উপলব্ধি করছেন। শোককে এই রকম দু-ধারায় পান করলে আর কত দিন টিকবেন ?"

অনিল একটু চিন্তিত ভাবে থাকিয়া বলিল, "হুঁ।...বেশ ধর্, তরু যেমন লিখেছে মীরা চেষ্টা ক'রে যদি তোকে একাই পাঠাতে পারে কোন ট্রেনিঙের জন্যে কিংবা ব্যারিস্টারির জন্যে ?"

আমি অল্প একটু হাসির সঙ্গে বলিলাম, "সেই কথাই তো বলছিলাম। পৌঁছুতে পারব কি বিলেতে তা হ'লে ?

অনিল একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিল, "তার মানে ?"

বলিলাম, "তার মানে অতটা লজ্জার বোঝা ঘাড়ে ক'রে যাত্রা করলে জাহাজসুদ্ধ ডুবে মরব না কি ?"

অনিল লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "না না, আমি তা মীন্ করিনি।...আচ্ছা, আর একটা সম্ভাবনার কথা ধর্; মানে ধর্, রায় দম্পতিই যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তোকে পাঠান ?"

বলিলাম, "একই কথা হ'ল না কি ? তার পেছনেও কি মীরা নীরব মিনতি নিয়ে রইল না ?"

অনিল আবার একটু থামিল, তাহার পর বলিল, "কেন যৌতুক বলে কিছু দেবার অধিকার নেই বাপ-মায়ের ?"

বলিলাম, "ঠিক এই কথাই তুই আর একবার জিগ্যেস করেছিলি অনিল, পরশুই। নিজের বুদ্ধিমত আমিও উত্তর দিয়েছি—অর্থাৎ এটা ঠিক যৌতুক হবে না, হবে আমার বর্তমান অবস্থাকে অপমান। গরীব বাপ-মায়ে জন্ম দিয়ে যে আমায় মীরার উপযোগী শিক্ষা দিতে পারলেন না—সেই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যঙ্গ। আমার বাপ-মায়ের গরীবিয়ানা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে।"

বাহিরে প্রবল ধারায় বর্ষাপাত চলিয়াছে। অনিল আবার খানিকক্ষণ মৌন রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "বিলেত তা হ'লে হ'ল না ?"

বলিলাম, "হবেই—যদি এই রকম পড়বার সুবিধেটা থেকে যায়। কোন না-কোন একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমি যাবই বিলেত—বিলেতই হোক বা জার্মানীই হোক।"

অনিল খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিল—"যদি—এই রকম—পড়ার সুবিধেটা থেকে যায়... যদি।..."

সাঁতরায় চারিটা দিন বেশ কাটিল। চমৎকার লাগিতেছে; তবে পূর্বেই বলিয়াছি, অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি নয়, তাহার উপর সৌদামিনী আসিয়া একটা যেন মর্ম-নিংড়ান ব্যথা জাগাইয়াছে বুকের মধ্যে। কাল যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম ঐ কথাই ভাবিয়াছিলাম—সেই সদু!—তার এই দশা?—আহা···

অনিলের প্রস্তাবটা বড় অশুচি বলিয়া বোধহইতেছিল, কিন্তু তবু এ কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না যে, অমোঘ সম্মোহনে ঐ চিন্তাটা আমায় আকর্ষণ করিতেছিল—সত্যই তো সিঁথির সিঁদুর তো ঘুচিল বলিয়া; আজ না হয় দু-দিন বাদে; তারপর?—ভাগবত হালদার? ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ ঐ ওর নিশ্চিত পরিণতি।···কাল যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম, বলাটা ভুল হইয়াছে, আসলে কাল একেবারেই নিদ্রা হয় নাই।

হোথায় মীরা। ভাবিলাম সুখে-বেদনায়, হরিষে-বিষাদে জীবনটা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, যাই দু-দিন একটু মুক্তির আস্বাদ লইয়া আসি।

এই মুক্তি।

আজ দুপুরে আবার আসিয়াছিল সৌদামিনী। সেই কালকের ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান, প্রায় আগাগোড়াই। সেই আমাদের নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকা, আর ওর ছেলেমেয়ে দুইটাকে লইয়া আকুলি-বিকুলি; বেশ বুঝা যায় ও যেন অনুভব করিতেছে এই সন্তান তো ওরই হইবার কথা ছিল। তাই ওদের বুকে করিয়া ওর নাড়িতে টান পড়িতেছে।

আজ বারান্দায়ই কাটাইল, বলিল, "ও ঘরটায় তো বড্ড গরম বৌ। ওঁরা ঘুমুচ্ছেন, এইখানেই আমরা গল্প করি। এই সময় একটু ফুরসত পাই, পালিয়ে আসি, তোর নন্দাই এই সময়টায় একটু ভাল থাকে।···আর ভাল থাকা!···"

একবার বলিল, "আজ শৈলদার সঙ্গে দেখা ক'রে যবে ভাবছি, মনে করবে দুটো দিনের জন্যে এলাম সাঁতরায়, সদী এল, অথচ একবার দেখা করলে না।"

কপট-নিদ্রা শেষ দিকটায় কখন একটু অকপট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন উঠিলাম দুইজনে, তখন সৌদামিনী চলিয়া গিয়াছে। বরাবরই ঘুমাইয়া থাকিবার কথা বলিয়া অম্বুরীর কাছে ওর প্রসঙ্গটা তুলিতেই পারিলাম না।

সদু দেখা করিবে বলিল, আবার কি ভাবিয়া চলিয়া গেল?

বিকেল বেলায় দুইজনে বাহির হইব,—আমি রকে দাঁড়াইয়া আছি, অনিল বাক্স

থেকে কিছু পয়সা লইবার জন্য ভিতরে গিয়াছে। বাহিরে যেন কতকটা পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন কানে আসিল, "এটা কি পরলোকগত সদাশিববাবুর বাড়ি?"

বাহিরের উঠানে পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সানু খেলা করিতেছে, প্রশ্নটা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া।

দু-তিনবার প্রশ্নের পরও কোন উত্তর হইল না, অবশ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। একে তো বছর কয়েক পূর্বে যে মারা গিয়াছে শিশুরা তাহার নাম মনে করিয়া রাখে না, তাহার উপর প্রশ্নকারী 'পরলোকগত' কথাটা জুড়িয়া দিয়া আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষে বোধ হয় ওরই মধ্যে একটু বড় গোছের একটি মেয়ে উত্তর করিল, "না পরলোকের নয় গো, সানুর বাবার বাড়ি।"

অগ্রসর হইতে হইতে শুনিতেছি, "কি নাম বাবার?"

সানু ঠাকুমার কাছে শোনা নামটা বলিল, "বাবার নাম অনা, টোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন।"

বাহির হইয়া দেখি রাজু বেয়ারা চৌকাঠের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। 'পরলোকগত' কথাটার জন্য বিস্মিত হইলাম না। পরে অবশ্য তরুর কাছে টের পাইলাম, মীরা দুষ্টামি করিয়া গালভরা কথাটা শিখাইয়া দিয়াছিল। যা হউক, ওর উপস্থিতির জন্য বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাজু যে! কি ব্যাপার?"

কিছু বলিবার পূর্বে রাজুর দৃষ্টিটা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই বাড়ির উপর একবার ঘুরিয়া গেল, কহিল, "এই বাড়িতেই রয়েছেন আপনি মাস্টার-মশা?"

উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ, এইটেই আমার বন্ধুর বাড়ি, রাজু।...তারপর, ব্যাপার কি বল তো, তুমি হঠাৎ?"

অনিল আসিল, চাপরাশ-আঁটা মানুষ দেখিয়া একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "কে রে শৈল? ...কি দরকার তোমার?"

আমি উত্তর করিলাম, মিস্টার রায়ের বেয়ারা।'

"ডাকতে এসেছে তোকে?"

রাজু উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, দিদিমণি এসেছেন।"

অনিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমিও অতিমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া রাজুকে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার আমরা পরস্পরের মুখের পানে চহিলাম; রাজুকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "কোথায়?"

"ওই মোড়ের মাথায়, পটিয়াকৃটা দাঁড় করিয়ে আছেন।"

এ কি নিদারুণ লজ্জায় ফেলিল মীরা—আমাকেও আর অনিলকেও! আমি যেন বিপর্যস্ত হইয়া অনিলের পানে চাহিলাম, ঠিক ইচ্ছা করিয়া চাহিবার উপায় ছিল না, দৃষ্টিটা আপনা হইতেই তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িল। অনিল কিন্তু নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। বলিল, "একটু দাঁড়া শৈল, এলাম বলে।"

মিনিটখানেকের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল্", বেয়ারাকেও বলিল, "এস হে।"

আঁকাবাঁকা গলিপথ হইতে বাহির হইয়াই আমরা মীরার মোটরের সামনে আসিয়া পড়িলাম। কয়েকজন কৌতূহলী বালক-বালিকা মোটরটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরিয়া সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তরু দরজার উপর মুখ চাপিয়া একটু বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। মীরা গাড়ির ও-পাশে ছেলেমেয়েদেব সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে।

তরু আমায় দেখিয়াই উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও দিদি, মাস্টারমশাই!"

মীরা ফিরিয়া চাহিতেই আমরা দুইজনে নমস্কার করিলাম। আমি অনিলকে পরিচিত করিয়া দিতে, অনিল আব একবার নমস্কার করিয়া দরজাটা খুলিয়া বলিল, "আসুন, নামুন।"

তরুকে বলিল, "নামো খুকী।"

তরু লক্ষ্মী-পাঠশালার পোষাকে আসিয়াছে; জড়িত পদে নামিয়া প্রথমে অনিলের, পরে আমার পদস্পর্শ করিল।

মীরা নামিয়া অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাদের বোধ হয় ভয়ানক আশ্চর্য ক'রে দিলাম; খুব ব্যতিব্যস্ত করলাম বোধ হয়!"

অনিল হাসিয়া উত্তর করিল, "আমাদের মুখ চেয়ে, ব্যতিব্যস্ত করবার ক্ষমতা থেকে ভগবান আপনাদের বঞ্চিত করেছেন! যদি সে রকম অভিসন্ধি ওঠেও কখনও আপনাদের মনে তো আপনারা আগে থাকতেই নোটিস দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে ফেলেন।"

আমরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "তবুও নিশ্চিন্দি হবেন না, নোটিস দিয়েও যে উপদ্রব করা চলে, তার নজির আমাদের দেশে আছে অনিলবাবু! —জানেন তো, এই দেশেই চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত।"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা গেলেন পূর্ণিয়া শৈলেনবাবু, তাঁর কাছ থেকে হুকুম আর মোটর চেয়ে রেখেছিলাম, এলাম চলে।"

বলিলাম, "আমাদের সৌভাগ্য, আপনি যে মনে ক'রে আসবেন এটা আশা-

করিনি।"

তরুর মুখটা যেন একটু বিষণ্ণ। মীরা-অনিলের কথাবার্তার মধ্যে আমায় একটু একান্ত বলিল, "মাস্টারমশাই, উনি বাড়িতেও সবার সামনে আমায় 'খুকী' বলবেন নাকি?"

ও-বেচারির দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না। মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?" প্রথমটা বলিতে চাহিলাম না, কিন্তু ওর জেদাজেদিতে বলিতেই হইল। আমাদের তিনজনের হাসিতে তরু একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া আমার গায়ে সাঁটিয়া গেল। মীরা বলিল, "সত্যিই, কি রকম আক্কেল আপনাদের! দেখছেন কত বড় একটা মেয়ে,—অত কষ্ট ক'রে বেচারি শাড়ি পর্যন্ত পরে এল, তবু 'খুকী' বলবেন।"

চৌকাঠের কাছে গলিতে অম্বুরী দাঁড়াইয়া আছে। একটা ধোপদস্ত শেমিজ আর শাড়ি পরা, চুলটাও সামান্য একটু গোছগাছ করিয়া লইয়াছে।

মীরাকে দেখিয়া প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল যেন, তখনই আবার সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মীরার বাঁ-হাতটা ধরিয়া বলিল, "এস ভাই।"

তাহার পর তরুর পিঠে হাত দিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এই তোমার ছাত্রী ঠাকুরপো? সত্যি কি চমৎকারটি! এত ছোট মেয়ে মেয়েদের স্কুলে পড়ে ঠাকুরপো?"

মীরা তাড়াতাড়ি বলিল, "সর্বনাশ! দেখবেন, ছোট, তা বলে ওকে যেন 'খুকী' বলে বসবেন না আপনিও।"

মীরা নিজেও এবং আমরা দুইজনে হাসিয়া উঠিলাম; তরু আবার লজ্জায় অম্বরীকে জড়াইয়া কাপড়ে মুখ লুকাইল। অম্বুরী আমার মুখের পানে চাহিল, ব্যাপারটা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "না, এ অন্যায়। ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই মিলে আপনারা ওর কি অবস্থা ক'রে তুলেছেন দেখুন তো।"

তাহার পর প্রথম সুযোগেই আমায় একটু একান্তে ডাকিয়া ব্যগ্র মিনতির সহিত বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, আমায়ও যেন 'অম্বুরী' বলে ডেক না—শুধু আজকের দিনটা—ওঁকেও বলে দিও—দোহাই তোমাদের…।"

১২

মীরা প্রথমটা আলাপ-পরিচয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, নূতন পরিচয়ের জড়িমাটা

জাগিয়াছিল একটু, চৌকাঠ ডিঙাইয়া বহিরঙ্গনে পা দিতেই কিন্তু তাহার মনটা যেন নূতন আবেষ্টনীতে একেবারে সাড়া দিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া লইয়া বলিল, "কি সবুজ শৈলেনবাবু সবুজে যেন চোবান! এবার বুঝতে পেরেছি আপনি কিসের টানে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছেন।"

বাড়ির দিকে না গিয়া ডান দিকে তরুলতায় জড়ানো ছোট চাঁপা গাছটার কাছে চলিয়া গেল, পুষ্পভরা লতার একটা ডগা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি চমৎকার ফুল! কি ছোট্ট! কি রাঙা···কি নাম এর? বিলিতি ফুল নাকি—আর, পাতা কি চমৎকার—চিরুনির মত।"

বলিলাম, "না, বিলিতি হ'তে যাবে কেন? একেবারে দিশী। তরুর অন্তত চেনা উচিত।"

হাসিয়া তরুর পানে চাহিলাম।

মীরা রহস্যটা বুঝিতে না পারিয়া অম্বুরীর পানে চাহিল, অম্বুরী বলিল, "একেই তরুলতা বলে, তাই বলছেন ঠাকুরপো।"

নামের এই মিলে মীরার মুখটা একরকম বিস্ময়মিশ্রিত হাসিতে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওদিকে তরু আরও সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে। মীরা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার লতার, একবার তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য শৈলেন বাবু!—এই তরুলতা?"

একটু নালিশের সুরে বলিল, "আপনি জানতেন অথচ বলেন নি আমাদের—"

মীরা আবার ছেলেমানুষ হইয়া পড়িয়াছে; কোন কিছুতে অভিভূত হইয়া পড়িলে উহার এই অবস্থা হয়। জানিলেও এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কি ছিল?

হঠাৎ অম্বুরীর পানে চহিয়া বলিল, "আমি যাবার সময় কতকগুলো চুরি ক'রে নিয়ে যাব। মা যে কী ভীষণ আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন!—কিছু বলতে পারবেন না কিন্তু আপান, আমার ভয়ংকর ভাল লেগেছে।"

অম্বুরী বলিল, "বলব বৈকি, শুধু এক কড়ার না বলতে পারি।"

মীরা একটু থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি?"

অম্বুরী তরুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার তরুলতাটি আমায় দিয়ে যাবেন; আমারও বড্ড ভাল লেগেছে। সত্যি কি চমৎকার!"

সকলের হাসিতে তরু আরও সংকুচিত হইয়া পড়িল। মীরা হাসির পরেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না।"

এবার অম্বুরী একটু থতমত খাইয়া গেল। কোথাও আধুনিক ভদ্রতার ত্রুটি

হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মীরার চেয়েও অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি ?—কি কি হয়নি ?"

মীরা বলিল, "আমি আসতেই আপনি—এস ভাই বলে আমায় ডেকে নিলেন। এরই মধ্যে কিন্তু সুর বদলে 'তুমি' থেকে 'আপনি' ক'রে বসেছেন !"

অম্বুরী যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "এই কথা ?"

মীরা বলিল, "এই কথা বটে, তবে সামান্য কথা নয়, কেন না ঐ স্নেহভরে ছোট ক'রে যে ডেকেছিলেন তারই জোরে আমি মনে মনে একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেলে ছিলাম।"

তাহার পর তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, তরুর দিদি আছে আমার নেই,—আমার হিংসে হবে না ?"

একটা প্রীতির রস যেন সবার মনটাকে ভিজাইয়া তুলিতেছে।

অম্বুরী বলিল, "আমি ভেবেছিলাম পাড়াগেঁয়ে মানুষ—মস্ত একটা ভুল হ'য়ে গেছে কথাটা বলে, তাই..."

মীরা বিপন্নভাবে বলিল, "তবুও মনে করবেন—মস্ত একটা ভুল হয়নি ? পাড়া-গেঁয়েদের বোঝান শক্ত দেখছি তো !"

আবার একটা হাসি উঠিল।

আর একটু দেখিয়াই মীরা বলিল, "চলুন ভেতরে যাই, যেখানে দাঁড়াচ্ছি কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করছে না অনিলবাবু। আর কে কে আছেন বাড়িতে ?"

অনিল বলিল, "ঠিক তো, চলুন ভেতরে! ভেতরে শুধু আমার মা আছেন আর। আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, দুই গেঁয়োতে মিলে আমরা কি ভুল-টাই ক'রছি দেখুন সেই থেকে !"

হাসিতে হাসিতে আমরা ভিতরে আসিলাম। রকের এক দিকটায় অনিলের মা সান্তু আর খুকীকে লইয়া একটা মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। পাশেই আর একখানা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি বিছানো, আগন্তুকদের জন্য। অম্বুরীর অতন্দ্রিত চেষ্টায় বাড়িটা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আজ যেন আরও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। যা মিনিট পাঁচ-ছয় হাতে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে ছেলেমেয়ে থেকে আসবাবপত্র পর্যন্ত সব-তাতেই ত্বরিতে তাহার যাদুস্পর্শটুকু দিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রশংসা হইবে জানিয়াই আগেভাগেই বলিয়া রাখিল, "এই তোমার দিদির গেরস্থালি ভাই, আপন জেনে যদি একটু আনন্দ পাও। আগে একটু বসে জিরিয়ে নাও। তারপর হাত-পা ধুয়ে ফেল। আমি ততক্ষণ একটু চা ক'রে ফেলি...ঝি! নাইবার ঘরে জল-তোয়ালে..."

ঝি ঘরের পাশে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "দিয়েছি জল।"

মা নূতন মানুষের সঙ্গে প্রবেশ করিতেই খুকী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সানু মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল, ঠব্বনাশ! কলকাটা ঠেকে সবাই এসেছেন খুকু, ঠভ্য হয়ে বসটে হয়।"

তাহার কাণ্ডখানা দেখিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অনিলের মায়ের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, তরুও অনুকরণ করিল। অনিলের মা উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা ওষ্ঠে ঠেকাইলেন; বলিলেন, "এস মা, এইমাত্র এলে?"

মীরা খুকীকে কোলে লইতে লইতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার এই মাত্র চলে যেতে হবে।"

বৃদ্ধা একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওমা!—কেন?"

মীরা খুকীকে বুকে চাপিয়া এবং সানুর হাত ধরিয়া পাটির উপর বসিতে বসিতে বলিল, "আপনার বৌ আমাদের এক মিনিট বসিয়ে তার পরেই পা ধুইয়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই চা খাইয়ে, বিদেয় ক'রে দিতে চান।"

আবার হাসি উঠিল। অম্বুরী বলিল, "না ভাই, ঘাট হয়েছে, তোমার যখন যা খুশি কর। ঐগুলো তো সব সারতে হবে, যত দেরি কর ততই আমার লাভ।"

খানিকক্ষণ ধরিয়া বেশ গল্প জমিয়া উঠিল—কেন্দ্র খোকা-খুকী, পাড়ার খানিকটা পরিচয়, খানিকটা কলকাতার প্রসঙ্গ। এক সময় রাগিলও মীরা আমার উপর, বলিল, "অনিলবাবুর যে খোকা-খুকী আছে, একথা ঘুণাক্ষরেও আমায় জানতে দেননি, পুতুল নিয়ে আসতাম তাহ'লে, এখানে আর কি পাওয়া যাবে?—বলিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বাহির করিয়া, অনিল-অম্বুরী আপত্তি করিবার পূর্বেই সানুর দুই হাতে দিয়া মুঠাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর তরুর দিকে চাহিয়া বলিল, "ওঠ তরু, দিদির বাড়ি ঘর-দোর ভালো ক'রে দেখে আসি; উনি নিজে দেখাবেন না।"

মীরা ক্রমেই মুক্তভাবে জায়গাটার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। ওরা তিনজনেই উঠিয়া গেল, আমরা বসিয়া রহিলাম। ঘর-দুয়ার দেখিয়া ছাদে গেল, কিছু বেশিক্ষণ কাটাইল সেখানে। মাঝে মাঝে এক-একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কানে আসিতেছে—মীরার মুখের; চারিদিকের আবেষ্টনীর প্রশংসা—কোন একটা গাছের লতার, কোনও ফুলের। উপরে গিয়া তরুরও মুখ খুলিয়াছে। তরু বলিতেছে, "আজ সকাল বেলা এলে হ'ত দিদি, এক্ষুণি তো চলে যাবে..."

সময়ের অল্পতার কথাই উহাকে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

একটু পরে উহারা নামিয়া আসিল। অম্বুরী বলিল, "এইবার ভাই ঠাটাই কর

আর যাই কর, শুনছি না। মুখ-হাত ধোও গিয়ে ; আমি ততক্ষণ চায়ের যোগাড় দেখি। কত দূর থেকে এসেছ বল দিকিন ! আর এই রোদ্দ,রটা গেছে তো মাথার ওপর দিয়ে ?"

মীরা বলিল, "না, আপনি চা করলে চলবে না দিদি, দাঁড়ান আমি মুখ-হাত ধুয়ে এক্ষুণি আসছি।"

অম্বরী বলিল, "বাঃ, আর আমি খারাপ চা করি নাকি ? জিজ্ঞেস কর বরং ঠাকুরপোদের।"

মীরা স্নানাগারে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল, "ঠাকুরপো প্রভৃতি যাঁরা খুশি হবার জন্যেই সর্বদা তোয়ের হ'য়ে রয়েছেন তাঁদের খুশি করা শক্ত নয় আমার কিন্তু বিশ্বাস পাড়াগেঁয়েরা যেমন কথা বলতে ভুল করে তেমনি চা করতে মোটেই পারে না। তাই নিজে ক'রে খাব।"—বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া মীরা আমাদের বলিল, "আপনারা এবার একটু ওপরে যান। রান্নাঘরের মধ্যে রান্নার নুন্-মসলা খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের একটু ঝগড়াঝাঁটি হ'তে পারে, আমরা চাই না যে পুরুষে দেখে সেটা।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "ঝগড়াঝাঁটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই বিচার-সালিসী প্রভৃতির জন্যে পুরুষের থাকা প্রয়োজন।"

মীরা বলিল, মাফ করবেন, আপনারা দূরেই থাকুন ; ব্যারিস্টারের মেয়ে—বিচার-সালিসীতে আপনারা কতটা সাহায্য করেন আমার খুবই জানা আছে।"

আবার একটা হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা বিভক্ত হইয়া গেলাম।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক উপরে থাকিতে হইল। মীরা যে একটা রন্ধনযজ্ঞ লাগাইয়া দিয়াছে তাহা উপর হইতে বেশ টের পাইতেছি। একবার সিগারেট লইবার জন্য নীচে নামিয়া দেখি মীরা শাড়ির আঁচলটা বাঁ-কাঁধ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া কোমরে জড়াইয়া পাকা গিন্নীর মত একটা খুন্তি লইয়া কড়ায় প্রবল বেগে কি একটা সঞ্চালিত করিয়া যাইতেছে। অম্বরী বোধ হয় লুচি বেলিতেছে ; পিঠের উপর খুকী। কাজের সঙ্গে কি একটা হাসির কথা চলিতেছে যেন। রকটার দক্ষিণ দিকে একটা জামরুল গাছের তলায় রান্নাঘরটা। উহারা দুইজনেই আমার দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও বেশ টের পাওয়া যায়, গৃহিনীপনার এই নূতন কাজে ঘরের তরল অন্ধকারের মধ্যে মীরার একটা নূতন রূপ ফুটিয়াছে। এলো-খোঁপাবা গেরো আলগা হইয়া গিয়াছে, ব্লাউজের বাঁকা ছাঁটের উপরে অনাবৃত স্কন্ধের খানিকট দেখা যায়—অর্ধচন্দ্রাকারে মাঝখানটিতে চেনহারের সোনা চিক্ চিক্ করিতেছে। সুডৌল অনাবৃত হাতটি শঙ্খের বন্ধন-কার্যে যতটা দরকার তার চেয়েও একটু বেশি,

চঞ্চল, তাহাতে একটু যেন ছেলেমানুষির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যতটুকু না দেখিয়া পারা গেল না দেখিয়া লইয়া সিগারেট লইয়া উপরে চলিয়া গেলাম। অনিল ওদিককার আলসের উপর একটু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, প্রশ্ন করিল, "তুমস্তবৃত্তি শেষ হ'ল ?"

বলিলাম, "দেখছিস সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম ; চোখ নেই তোর ?"

অনিল বলিল, "আমি তারও বেশি দেখতে পাচ্ছি ; তিনটে চোখ আছে।"

একটু মৌনতাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে অনিল, সিগারেট ধরাইয়া কয়েকটা টান দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "ভাবিস্ কি ?"

অনিল যেন একটা ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিল, বলিল, "যা ভাবছিলাম তোকে আর সে-কথা বলা চলবে না।" এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে-প্রসঙ্গটা অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল, আশ্চর্য শৈল, আশ্চর্য এই মেয়েছেলেদের ক্ষমতা—মীরা এইটুকুর মধ্যে কি নিশ্চিহ্নভাবে মিশে গেছে দেখছিস্ ?"

আমি বলিলাম, "সে অম্বুরীর গুণ।"

"সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় মীরা এর মধ্যে আর একজনকে বেশি ক'রে পেয়েছে।"

আমি একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল, "তোকে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি রান্নাঘরে রান্না করছি না অনিল, তোর কাছে রয়েছি।

অনিল বলিল, "মীরার কাছে তুই রান্নাঘর থেকে নিয়ে বাইরের চৌকাঠ পর্যন্ত এই জায়গাটা ছেয়ে রয়েছিস্ শৈল, তাই এখানকার মাটি, এখানকার গাছপালা, এখানকার মানুষ যাদের সঙ্গে তুই রয়েছিস্, ওর কাছে এত মিষ্টি হ'য়ে উঠেছে। এর মধ্যেও আর একটা কথা রয়েছে, অবশ্য আমার আন্দাজ, কিন্তু ভুল আন্দাজ নয়।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ?"

"মীরা ভেবেছিল—অন্তত মীরার বোধ হয় একটা সন্দেহ ছিল, তুই নেই এখানে ; সত্যিই একটা ছুতো ক'রে কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিস্ কোথাও। মীরার দোষ নয়, দেবকন্যাও ভালবাসলে এ-সন্দেহ করত, মীরা তো মানুষ। এখানে তোকে দেখে মীরা বর্তে গেছে।"

বলিলাম, "তার তো কৈ কোন লক্ষণ দেখলাম না !"

"তোর মোটা দৃষ্টি দেখতে পাস্নি ; ঐখানেই তো মীরার জিত। ও বরং তোর সঙ্গেই সবচেয়ে কম কথা কয়েছে, তোর দিকে সব চেয়ে কম দেখেছে, কিন্তু ঐ সবই হচ্ছে লক্ষণ। দেখিস্, ও যা কিছু এখানে করবে, তোকে বাইরে যতটা সম্ভব

বাদ দিয়ে করবে। শৈল, মেয়েরা সত্যিই শক্তির অংশ;—ওরা একই সঙ্গে, একই সময়ে খুব কাছে আর খুব দূরে থাকতে পারে। আমরা পুরুষেরা জড় একটা পাথরের টাংয়ের মত—যদি কাছে থাকি তো না ঠেলে দিয়ে দূরে চলে যেতে চাই না, দূরে থাকি তো টেনে না নিলে কাছে আসবার ক্ষমতা নেই—একটা চেতনা-শক্তির নিগ্রহ বা অনুগ্রহের নিতান্তই অধীন, কপালে যেটা যখন জোটে···"

অম্বুরী আসিয়া বলিল, "মীরা একটু চা খাবার জন্যে ডাকতে পাঠালে।"

অনিলকে বলিলাম, "ওঠ, কপালে আপাতত অনুগ্রহ দেখা যাচ্ছে।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "আমার মনে হয় নিগ্রহ—দু-ঘণ্টা ধরে দু-জনে যে রকম খেটেছে দেখছি তাতে গুরুতর একটা কিছু না দাঁড় করিয়ে ছাড়েনি।"

প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত বাড়িটাতে একটা উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া রাত প্রায় আটটার সময় মীরা চলিয়া গেল। অম্বুরী আমাদের এবং পরে উহাদের নিজেদের এবং রাজু ও ড্রাইভারের আহারাদির পর কাছের দু-একটা বাড়ি হইতে মীরাকে একটু ঘুরাইয়া আনিল। তাহার পর সকলে মোটরে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। বিদায়ের সময় মীরা অম্বুরীর হাতটা ধরিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তখন বলেছিলাম, বুঝতে পেরেছি কিসের টানে আপনি এখানে পালিয়ে এসেছেন, এখন বুঝছি কাদের টানে। এই-দুটো টানের প্রভাব কাটিয়ে আবার আসছেন তো শৈলেনবাবু?"

ফিরিবার সময় সবাই চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ির বহিরাঙ্গনে আসিয়া অম্বুরী বলিল, "একটা কথা বলব ঠাকুরপো? বলেই ফেলি, পেটে কথা থাকে না এ বদনাম তো আমাদের আছেই। মীরা বললে, শৈলেনবাবুকে ব'লো না দিদি,—আমার ভয় হয়েছিল উনি বোধ হয় একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দেশে চলে গেছেন, কেন না কলকাতা বোধ হয় ওঁর ভাল লাগে না। তুমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দিও দিদি, না হ'লে তরুর ভয়ানক ক্ষতি হবে—"

অনিল আড়চোখে একবার আমার মুখের পানে চাহিল।

১৩

আর মাত্র দুইটি দিন ছুটি। ইচ্ছা ছিল আরও দুইটা দিন বাড়াইয়া লইব; কিন্তু মীরা আসিয়া পড়াতে সে উপায় রহিল না; বিশেষ করিয়া অম্বুরীর কাছে মীরা যাহা বলিয়া গিয়াছে সেকথা শুনিবার পর।

সকালে অম্বুরী বলিল, "সতু ঠাকুরঝি ছ-দিন এসেছিল ঠাকুরপো। তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি বলি কি, একবার দেখে এস না ওর বরকে ; আহা, ঐ এক পোড়াকপালী ! অমন মানুষ, আর ভগবান্ ওরই ওপর—"

জিহ্বা আর দন্তমূলের সাহায্যে অম্বুরী "চু" করিয়া একটা সহানুভূতিশব্দ করিল।

অনিল আমার পানে চাহিয়া বলিল, "ওকে তো বলেছিলাম, সেদিন—একবার দেখে আসা উচিত, যাব তো বলেও ছিল। কি, যাবি নাকি শৈল ?"

অনেকগুলা কথা একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিল মনে। অস্বীকার করিব না, তাহার মধ্যে মীরার আগমনের কথাটা খুব স্পষ্ট এবং প্রবল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "নাঃ, গিয়ে কি হবে ? ভাল ক'রে দিতে পারবো না তো ?"

অনিল তাহার নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল আমার মুখের পানে, যেন খোলা পাতার মত আমার মনটা পড়িয়া লইল, "তবে থাক, আর সত্যিই তো—"

অম্বুরী অবশ্য বুঝিল না ; একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলিল, "ভাল ক'রে দিতে না পারলে আর যেতে নেই ? দুঃখ-কষ্টের সময় মানুষে চায় আত্মীয়-স্বজনে এসে একটু জিগ্যেসাবাদ করে। তোমাদের দু-জনের কথা এত বলে বেচারী—"

প্রসঙ্গটা কি করিয়া চাপা দেওয়া যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। যাহা এড়াইতে চাহিতেছিলাম, তাহা অন্য এক অসন্দিগ্ধ পথে একেবারে ঘাড়ে আসিয়া পড়িল—

অনিল বলিল, "আজ আর আমি নাইতে যাব না, শৈলেন ; পরশু বৃষ্টিতে ভিজে মাথাটা বড় ভার হয়েছে, তাতে আবার গঙ্গায় নতুন জল নেমেছে। তুই নেয়ে আয়, আমি পারি তো এইখানেই দু-ঘটি তোলা জল মাথায় ঢেলে নেব এর পরে।"

নিরুপায়ভাবে বললাম, "একলা যেতে হবে ?"

সাতু উঠানটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, সহসা থামিয়া সতক করিবার ভঙ্গিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "না শৈল টাকা, খবরদার একলা যেও না ; টুমীরে টেনে নিয়ে যাবে।"

ওর মুরুব্বিয়ানার রকম দেখিয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিলাম। অনিল বলিল, "জেঁপোর একশেষ হয়েছে।"

আমি বললাম, "তুই চল্ না সাতু ; সত্যিই যদি ধরে কুমীরে ··"

"ঠামো।"—বলিয়া সাতু প্রজাপতি শিকার ভুলিয়া তিন লাফে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। আমার সন্ত কিনিয়া দেওয়া জাপানী খেলনা-বন্দুকটা আনিয়া গর্বিত ভঙ্গিতে বলিল, "চলো।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, তাহ তো গা, কি বীরপুরুষ ! কাকার আর ভাবনা রইল

মা। যাচ্ছিস্ তো তেলটা মাখিয়ে দিই দাঁড়া, নেয়ে আসিস্।"

তেল মাখা হইলে সান্ত্রী-সমন্বিত হইয়া স্নানের জন্য বাহির হইলাম।

গলি থেকে সদর রাস্তায় পড়িয়া একটু দ্বিধায় পড়িলাম, গঙ্গায় না গিয়া বড়পুকুরে স্নান করিয়া আসিলে কেমন হয়? বহু দিন স্নান করা হয় নাই বড়পুকুরে—বহু দিন। অনিল সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত; অনিল থেকে আলাদা করিয়া বড়পুকুরের কথা ভাবা যায় না; আরও একজন থেকে আলাদা করিয়া, সে সৌদামিনী। সৌদামিনীর কথা মনে পড়িতেই মনস্থির করিয়া ফেলিলাম···না, ও-পথে নয়। মীরা আসিয়া পথ-নির্দেশ করিয়া গিয়াছে; বড়পুকুরে ডুব দেওয়ার অর্থ যদি হয় সৌদামিনীর স্মৃতিতে ডুব দেওয়া তো বড়পুকুর থাক। সহানুভূতি? তা আছে বইকি সদুর দুঃখে, কিন্তু সে 'আহা'টুর স্পষ্ট করিয়া মুখে বলিলেই কি তাহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে?

সান্তু মীরাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিল, বোধ হয় আমায় একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাহারও মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বলিল, "মীরা মাসীর গাড়ী এইঠানেই দাঁড়িয়েছিল, না শৈল টাকা?··· মীরা মাসী তোমার কে হয়?"

বলিলাম, "কেউ নয়।"

সান্তু ক্ষণমাত্র যেন কি একটা চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কে হবে?"

প্রশ্নটার মধ্যে অস্বীর অলক্ষ্য ইঙ্গিত আছে। কথাটা বদলাইয়া লইয়া বলিলাম, "পা চালিয়ে চল্ দিকিন, নয়তো আবার কুমীর এসে পড়বে গঙ্গায়।"

নিজের মনকে লোকে কি নিজেই চেনে যে কারণটা বলিব? যাহা করিলাম তাহাই বলিতে পারি মাত্র, কয়েক পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িলাম। সান্তুকে বলিলাম, "গঙ্গায় আজ বড্ড কুমীর সান্তু, তুই অতগুলো মারতে পারবিনে একলা, তার চেয়ে চল্ বড়পুকুরে নেয়ে আসি।"

সান্তু একটু নিরাশ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "বড়পুকুরে কুমীর নেই শৈল টাকা?"

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "একটা ছুটো আছে বইকি, চল্।"

"চলো।" বলিয়া সান্তু অগ্রসর হইল। ফিরিয়া যাইতে যাইতে একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা। বুঝিলাম সৌদামিনীর স্মৃতিও ততটা নয়, আসলে পরশু রাত্রে বড়পুকুরের যে রহস্যময় রূপ দেখিয়াছিলাম তাহাই টানিতেছেন অবশ্য তাহার সঙ্গে সৌদামিনী যে নাই এমন নয়। তবে আসল কথা ঐ···বড়পুকুর পাড়াগাঁয়ের প্রতীক···আমার কলিকাতা-শ্রান্ত মন যে পাড়াগাঁকে অন্ধ অন্ধ করিয়া সন্ধান করিতেছে।

বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ঘন আগাছার মধ্যে দিয়ে সরু বিসর্পিত পথ ধরিয়া চলিয়াছি। সান্টু বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া খানিকটা আগে আগে চলিয়াছে; অবশ্য আমি আছি কিনা মাঝে মাঝে দেখিয়া ভরসার পুঁজি পূর্ণ করিয়া লইতেছে। আসিয়া পড়িয়াছি—চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ির একটা কোণ ঘুরিলেই বড়পুকুর দেখা যাইবে। দিনের বেলায় কেমন দেখায় একটা উন্মুখ আগ্রহ লাগিয়া আছে। এমন সময় হঠাৎ সান্টু কোণ ঘুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। কাপড় আলগা হইয়া গিয়াছে, বাঁ-হাতে সেটা গুটাইয়া ধরিয়া বলিল, শৈল টাকা টুমীর!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি—তা চল্, মারবি চল্।"

"টুমি নাও।" বলিয়া অন্য্রার বীবদত্তান আমার হাতে বন্দুক দিয়া বাঁ-হাতে আমার কোমর জড়াইয়া পাশে দাঁড়াইল।

অগ্রসর হইয়া দেখি ঘাটের উপর কেহ নাই। জলে খানিকটা দূরে একটি স্ত্রীলোক যেন আধডোবা সাঁতার কাটিতে কাটিতে ঘাটের পানে আসিতেছে। শরীরের এখান-ওখান জলের উপর জাগিয়া আছে, মাথা আর পা অনুমান আধ হাতে জলে মগ্ন।

আমি ফিরিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, সান্টু বলিল, "মার না শৈল টাকা, ভয় করছে?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, ভয় করছে, চল্।"

সান্টু আমার কোমরের কাপড়টা খামচাইয়া ধরিয়া ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও শৈল টাকা, টুমীর নয়, ড্যাকো, মাসীমা!"

ঘুরিয়া দেখি সৌদামিনী কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সাঁতারের পরিশ্রমে হাঁপাইতেছে। আমায় ফিরিতে দেখিয়াই শরীরটা জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া দিল।

১৪

ক্ষণমাত্র দ্বিধা, তাহার পর আমি আবার ফিরিয়া পা বাড়াইলাম। সৌদামিনী ডাকিল, "ও সান্টু, যাচ্ছ কেন? তোমরা নাইবে এস, আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাচ্ছি।"

আমি ওকে ও-ঘাটে যাইবার অবসর দিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে চাহিয়া দেখি সৌদামিনী সেই ভাবেই চিবুক পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; উর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র ভাল করিয়া লইয়া সংবৃত করিয়া তাহার উপর গামছাটা ঘুরাইয়া দিয়াছে। নড়ন-চড়নের কোন লক্ষণ নাই। আমি ফিরিয়া চাহিতে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "শৈলদার হঠাৎ পুকুরে নাওয়ার সখ হ'ল যে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "গঙ্গায় বড্ড কুমীর, তাই সান্তু আমায় এখানে নিয়ে এল এখানে এসেও সান্তু তোমার ডুব-সাঁতার কাটতে দেখে কুমীর ভেবে পালাচ্ছিল।"

সন্তু বলিল, "যাক ওর ভুলটা ভেঙেছে।... আপনার ভুলটা যেন এখনও রয়েছে মনে হচ্ছে"—বলিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া বলিল, "আপনি বসুন একটু ঘাটে এসে শৈলদা, কতক্ষণ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকবেন?—সো-সাপের আড্ডা। সাঁতার কেটে হাঁপ ধরেছে, একটু জিরিয়েই আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাব।"

চুপ করিয়া রহিলাম একটু দু-জনে। সান্তু প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন নাইবে না শৈল টাকা?"

বলিলাম, "না।"

"কেন?

কাজেই সৌদামিনীর সঙ্গে রং করিতে হইল,—সান্তুর অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার জন্য। বলিলাম, "তুমি রোজ এখানেই নাইতে আস নাকি সন্তু?"

সৌদামিনী উত্তর করিল; "হ্যাঁ, এখানে থাকলেই আসি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের পানে চটুল হাস্যের সহিত চাহিয়া বলিল, "অভ্যাস ম'লেও যায় না কিনা; ঠিকই বল না শৈলদা?"

আমি আর ওর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং যে-কারণে সান্তুকে এড়াইয়া সন্তুর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই কারণেই সন্তুকে ছাড়িয়া আবার সান্তুর সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিয়া দিতে হইল। বলিলাম "না হয় নেমে নাও গে না সান্তু ততক্ষণ।"

"একলা?"

বলিলাম, "একলা কেন? তোমার মাসীমা তো রয়েছেন?"

অতটা পছন্দ হইল না কথাটা সান্তুর। আমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "না, তুমিও চলো।"

ভীষণ বিব্রত হইয়া আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "না।"

সান্তু মুখটা উঁচু করিয়া নাছোড়বান্দার মত বলিল, "কেন? তুমি মাসীমার ঠেঙে নাও না?"

আমার অবস্থা তখন—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" কোন রকমে বলিলাম; "না"—এবং এর পরেও আবার "কেন?" বলিয়া যে প্রশ্ন হইবে তাহার ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিলাম।

সন্তু কৌতুক দেখিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "ওর কথা বিশ্বাস ক'রো না সান্তু; উনি

ছেলেবেলায় তোমার মাসীমার সঙ্গে অনেক নেয়েছেন—এই পুকুরেই ; না হয় তোমার বাবাকে জিগ্যেস ক'রো।"

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু আজকাল আর সে বড়পুকুর নেই ; আছে শৈলদা ?"

যেন পরিত্রাণ পাইলাম। বলিলাম "সত্যিই নেই।"

"আর কিছুই নেই, মজে এসেছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ঘাটে লোক ও থাকে না ; কষ্ট হয় দেখলে!"

বলিলাম, "তবুও তো তুমি আসতে ছাড় না দেখছি।"

সদু জলের মধ্যে তাহার শুভ্র বাহু দুইটি ঘুরাইয়া আনিয়া যেন আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ তবুও আমার বড়পুকুর বড্ড ভাল লাগে, চমৎকার লাগে। এখানে এলেই যেন মনে হয় শৈলদা যে আবার ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছি, সেটা কি অল্প লাভ মনে কর ?⋯ কি রকম জান শৈলদা ?—বয়স হ'লে আবার প্রথম ভাগ কি দ্বিতীয় ভাগ পড়লে যেমন ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছি বলে মনে হয় সেই রকম।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ে সদুর মুখের পানে চাহিলাম, এতটা ভাবসাম্য কি করিয়া আসে ;—ঠিক এই কথাই যে অনিল বলিল সেদিন!

সদু আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, "তুমি বিশ্বাস করছ না শৈলদা ? বড়পুকুরে এলে সত্যিই আমি অন্য মানুষ হ'য়ে যাই। মনেই থাকে না কোথাকার মানুষ কাদের বাড়ির বৌ। তুমি তো দেখেই ফেলেছ আমায়—সাঁতার কাটছিলাম! —বৌ মানুষ সাঁতার কাটে, এ আবার কে কোথায় শুনেছে বল ? আবার যে-সে বৌ নয়, পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর মত সর্বদা সভ্যভব্য ভারিক্কে হ'য়ে থাকা উচিত"—বলিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আবার গম্ভীর হইয়া পড়িতে বলিল, "না সত্যিই বলছি শৈলদা, একবারে অন্য মানুষ হ'য়ে যাই, স্মৃতির পথ বেয়ে যে কোথায় যাই চলে! শুধু আমি কি একাই ? তোমরা পর্যন্ত এসে জোট—তুমি, অনিলদা, বঙ্কু। পরশু এই রকম ঘাটে গা ডুবিয়ে বসে হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠেছি, রতন বাগ্দীর ভাদ্দর-বৌ জল তুলতে আসছিল, দেখতে পাইনি। বলে, 'ওকি সদু ঠাকুরঝি, পাগল হ'লে নাকি ?' আসল কথা, অনেক দিনের একটি কথা মনে পড়ে গেল, বুঝলে শৈলদা ?—জামরুল খেতে সাধ হয়েছে তোমাদের সর্দার। দুপুর বেলা, অনিলদা ঐ জামরুল গাছটায় উঠেছে, তুমি গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে উঠছ, আমি অন্য বাগ্দীর দাওয়ায় বসে দেখছি, এমন সময় দিদিমা-বুড়ী একটা আমের শুকনো ডাল হাতে ক'রে—'কোথায় গেল তারা—গেল কোথায় ?'—করতে করতে হন্ হন্ ক'রে ঘাটের পানে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে

বন্ধু। তাকে তোমরা কি জন্যে খেদিয়ে দিয়েছ বলে সে-ই গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে ওকে। যেমনি গলার আওয়াজ কানে যাওয়া অনিলদা তো সেই মগডাল থেকে একেবারে জামরুলসুদ্ধ পুকুরে ঝপাং ক'রে দে লাফ,—আর তুমি···"

সদু আর হাসির তোড় রুখিতে পারিল না, মুখখানা দুই হাতে ঢাকিয়া দুলিয়া দুলিয়া জলে বেশ খানিকটা বীচিভঙ্গ করিয়া হাসির উঠিল। হাসির ছোঁয়াচ আমাকেও স্পর্শ করিল; কিন্তু অত প্রাণ খুলিয়া হাসিবার শক্তি কি সবার হয়? সদু যখন হাসে তখন হাসেই শুধু—আমি যতটা না হাসিতেছি তাহার বেশি হাসি দেখাতেছি, তার চেয়ে বেশি ভাবনা লাগিয়া আছে, কেহ দেখিয়া না ফেলে। সান্নু আমার মুখের পানে তাহার অবুঝ মুখখানা তুলিয়া হাসিতে লাগিল। সদু হাসিতে হাসিতেই বলিল, "আর তুমি কি করেছ মনে আছে শৈলদা?—নেমে পড়ে একেবারে চৌধুরীদের ঐ জলের নালাটার—ভেতরে—হামাগুড়ি দিয়ে—ওঃ! "

সদু আরও ভুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির চোটে মুখ সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, কোনমতেই যেন সামলাইতে পারিতেছে না নিজেকে। আমি বলিলাম, "থাম, এক্ষুণি আজও আবার না রতন বাগদীর ভাদ্দর বৌ এসে পড়ে।"

সদু চেষ্টা করিয়া নিজেকে থামাইয়া লইল, মুখে এক আঁজলা জল ছড়াইয়া দিয়া হাসির জেরটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আসুক গে, বয়ে গেল।" আবার একটু খুক খুক করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "শৈলদা, আমি দু দিন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, বৌ নিশ্চয় বলেছে, বলতে পারবে না যে, দু-দিনের জন্যে এলাম, সদী খোঁজও নিলে না একবার।"

বলিলাম, "কিন্তু সবুর ক'রে তো একটু বলতে পারনি।"

সৌদামিনীর হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে ভয়ের ভান মিশাইয়া বলিল, "রক্ষে কর, তাহলে ছ-মাস বসে থাকতে হ'ত—কুম্ভকর্ণের ছ-মাস নিদ্রা, ছ-মাস জাগরণ।···আমার তো কোন কাজ ছিল না, মাত্র একবার দোষ খণ্ডন ক'রে আসা—কোন সময় বলতে না পার, সদী একবার খোঁজ নিতেও এল না।"

দুইবার কথাটা বলায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়াই আমার একটা মিথ্যা বলিতে হইল, কেন না ওর যা অবস্থা তাহাতে আমারই আগে খোঁজ নেওয়া উচিত। বলিলাম, "আমিও তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম সদু। আজ বিকেলে একবার যাব বোধ হয়।"

সদুর দীপ্ত মুখখানা যেন ফুৎকারে নিবিয়া গেল। বলিল, "আমার ওখানে কি করতে যাবে শৈলদা?··না, যেয়ো না।"

কলোচ্ছ্বসিত জায়গাতে খানিকক্ষণ একটা থমথমে নিস্তব্ধতা ছাইয়া রহিল। ইহার মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিলাম, সদু গামছার একটা প্রান্ত কামড়াইয়া ধরিয়া আড়চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে। চোখাচোখির পর আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে বলিল, "দেখছিলাম তুমি রাগ করলে কিনা শৈলদা।"

বলিলাম, "রাগ করবার কি আছে এর মধ্যে ?"

সদু শরীরটা আরও একটু ডুবাইয়া লইয়া গোটা-দুই কুলকুচি করিয়া বলিল, 'রাগ করবার নেই—এ কথা শুনব কেন ?—তুমি যাব বললে, অথচ আমি করলাম মানা! তবে কি জান ? এই নিয়ে তোমাদের কেউ দুটো কথা বলে এটা আমার সহ্য হয় না। আমাকে বলে সে আমি গ্রাহ্য করি না—মোটে নয়। যাদের সঙ্গে চিরটাকাল কাটালাম দুঃখে-সুখে, আজ বয়সের ওপর আরও গোটাকতক বছর জুড়ে গেছে বলে তারা আর আমার কেউ হবে না, চিরকাল যেমন হেসে কথা কয়ে এসেছি সেই রকম হেসে কিংবা সোজা মুখ তুলে কথা কইলেই আমার জাত যাবে, এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না শৈলদা। অবশ্য জাত যেত যদি তোমরাও বদলাতে, কিন্তু তা বদলাওনি, বদলাবেও না।"

আমি ফিরিয়া চাহিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া বলিল, "কি করে জানলাম ?—আমার মন বলছে, দেখছিও। আসল কথা সব মানুষ বদলায় না; এই দেখ না, আমি বদলেছি ? এমন অবস্থাতে পড়েও বদলাইনি। কি জানি আমার যেন মনে হয় আমি বরাবরই এই রকম থাকব যত যা-ই ঘটুক না কেন।"

আবার এক ঝলক হাসিয়া জলে একটু একটু আঙুল চালাইয়া বলিতে লাগিল, 'আমি যখন বদলাইনি, তখন তোমরা কোন্ দুঃখে বদলাতে যাবে শৈলদা ? যাক্ কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, আমায় কিছু বললে আমি গায়ে মাখি না, কিন্তু তোমাদের বললে আমার গায়ে লাগে। সেদিন আমরা আসবার পর অনিলদা দেখতে এসেছিল; চলে গেলে ভাগবত-কাকা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'যার চেয়ে যার টান বড় তারে বলি ডাইন।'...কথাটা আমার যেন শক্তিশেলের মত বাজল শৈলদা। কিন্তু সে কি আমার জন্যেই ?—আমি তো সেই দিন দুপুরেই তোমাদের ওখানে গেলাম। পাছে ভাগবত-কাকা টের না পায় সেই জন্যে পকেট থেকে চাবির থোলোটা বের ক'রে নিয়ে তাকে গিয়ে বললাম—'এই তোমার চাবি নাও, কোথায় যে ফেল ভাগবত-কাকা!' চাবি হাতে ক'রে বললে—'কোথায় যেন বেরুচ্ছিস্ তুই এই দুপুর রোদ্দুরে ?' বললাম, 'হ্যাঁ, একবার অনিলদার ওখানে যাব।' আমায় সচরাচর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করে না, কিন্তু আস্পর্দ্ধাটার মাথা ছাড়িয়ে যায় দেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'অনিলদাদা! শুনলাম তোর আর এক দাদাও নাকি এসেছে ?' তারপর

জিজ্ঞেস করল, 'তোকে ডেকে পাঠিয়েছে নাকি ?' এত বড় কথাটা বলতেও ওর মুখে একটু আটকাল না শৈলদা ?"·· বলিতে বলিতে সত্তুর গলাটা একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। মুখটা ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল; তাহার পর বলিল, "আমিও কথা সইবার মেয়ে নই, বললাম, 'ডাকেনি বলেই তো যাচ্ছি ভাগবত-কাকা, যে দরদ দেখিয়ে ডেকে নেয় না তার কাছে যেতেই তো ভরসা হয়।'· কথাটা গায়ে নিশ্চয় বিষ ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে ওর; বললে, 'আর একটা লোক যে ঘরে এখন-তখন হ'যে রয়েছে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই ;'···কথাটা এবার আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিলে যেন, বললাম, 'সম্বন্ধ আমার চেয়ে' "

সত্তু হঠাৎ নিজেকে সংবৃত করিয়া লইল, কথাটা ঐখানে শেষ করিয়া দিয়া সমস্ত ভঙ্গিটা বদলাইয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ! শৈলদা ভাববেন সত্তু সেই থেকে নিজের কথাই পাঁচ কাহন করছে। সত্যি !···তোমার কথা বল এইবার—কত দিন যে তোমায় দেখিনি শৈলদা—উঃ, তারপর ?—শুনলাম বি-এ পাশ করেছ—একটা খাওয়া পাওনা আছে।·· শৈলদা, খাওয়ানোর কথায়, আমার কি মনে হচ্ছে বলব ? রাগ করবে না ?"

শরৎ-আকাশের মত কথায় কথায় ভাবের পরিবর্তন, ভঙ্গির পরিবর্তন ; আমি ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম "কি মনে হচ্ছে ?"

"মনে হচ্ছে বলি, 'শৈলদা পাশ করেছ জামরুল পেড়ে দাও খাই, পেকেছেও কিছু কিছু দেখ না'।" বলিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "শক্তই বা কি এমন ? বস্কাও নেই, দিদিমাও নেই।"

"তবুও পারবে না তুমি, এতক্ষণে একবার সে-সব দিনের মত 'সদী' বলে ডাকতে পারলে না যখন···" বলিয়াই এক মুখ জল লইয়া মুখটা অপর দিকে ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে কুলকুচি করিতে লাগিল। একটু পরে আবার মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আর শুনলাম বেশ ভাল একটা কাজও পেয়েছ—পড়াবার। আরও একটা কথা শুনলাম শৈলদা·· "

থামিল বলিয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া দেখি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে !—বহু দিনের পরিচিত একটা চাহনি—ছেলেবেলার কত ইতিহাস যে মনে করাইয়া দেয়···!

সত্তু বলিল, "যদি নেমন্তন্ন না পাই শৈলদা তো···কি ক'রেই বা বলি ?—রাজকন্যাকে পেয়ে ছোটবেলায় কোন এক সদী-বাঁদীর কথা কি—"

আবার হঠাৎ থামিয়া গেল। প্রসঙ্গ, ভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য—সবই বদলাইয়া দিয়া বলিল, "তাহ'লে তুমি এলে না নাইতে তোমার মাসীর কাছে সাত্তু ? বেশ, আড়ি তোমার সঙ্গে, আর কখনও জামরুল আর গোলাপ জাম নিয়ে যাব না।"

তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এবার তুমি নাইবে এস শৈলদা, আবোল-তাবোল কি সব বললাম, কি মনে করবে জানি না। আসল কথা, তোমাদের দেখলে যেন মনে হয় শৈলদা···না বাপু, তুমি বরং একটু ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও, আমি এখান দিয়ে উঠে যাই ; ও আ-ঘাটা দিয়ে আর উঠতে পারি না ! একে তো অনেকক্ষণ রয়েছি বলে এমনই গা-টা একটু কুট কুট করছে—কি যে হয়েছে অবস্থা বড়পুকুরের—আহা !"

বলিলাম, "হ্যাঁ, সেই কথা আমি ভাবি। তা তুমি তো স্বচ্ছন্দে গঙ্গায় গেলেই পার সদু। তোমরা তো চাও-ও, তোমাদের ওখানে গঙ্গা নেইও তো শুনেছি !

সদু একরকম অদ্ভুত নিষ্প্রভ হাসির সহিত আমার পানে চাহিল। বলিল, "চাওয়া ?···হাঁ, অন্তত উচিত তো চাওয়া···ঠাকুর-দেবতা ! দেখ না ভাগবত-কাকা দু-বেলা ধর্না দেন, সন্ধে-আহ্নিকটি পর্যন্ত গঙ্গার তীরে হওয়া দরকার তাঁর।"

একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কিসের জন্যে ঠাকুর-দেবতার খোশামোদ শৈলদা ?"

১৫

সাধু সঙ্গে ছিল বলিয়া আসিয়াই নিজে হইতে কথাটা বলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সাধু বলিতই ; মাঝে পড়িয়া আমি চোর হইয়া যাইতাম। অনিল অথবা দু-জনেই ছিল।

অম্বুরী গ্রামের সুবাদ ধরিয়া একটা ঠাট্টা করিতে ছাড়িল না। মর্মার্থটা এই যে, টানের প্রকারভেদ আছে—গঙ্গার টান—পুণ্যের টানই যে সব সময় শক্তিশালী হইবে এমন কিছুই কথা নাই। তাহার পর বলিল, "না, সত্যিই ভাল হয়েছে ঠাকুরপো, দু-দিন এল অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তুমিও তো চলে যাচ্ছ, ও-ও থাকে না এখানে।···মেয়েটা বড্ড ভাল ঠাকুরপো।"

আবার একটা ঠাট্টা করিল ; কি কাজে ঘরে যাইতেছিল, ঘুরিয়া বলিল, "আর হ'লও ভাল জায়গাটিতে দেখা ? বড়পুকুর তো শুনেছি ছেলেবেলায় তোমাদের কালিন্দী ছিল—তোমার আর ঐ সাধু-পুরুষটির।" বলিয়া অনিলের দিকে একটু সহাস্য চটুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় কথাটা সবিস্তারে অনিলকে বলিলাম। 'আমি বলিলাম' বলার চেয়ে অনিল বাহির করিয়া লইল বলাই ঠিক। তবু, অনিল কৌতূহলী না হইলেও

তাহাকে বলিব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন-না—গোপন করিব না—যতই সকালের কথাই ভাবি, সৌদামিনী একটা সমস্যার আকারে আমার সামনে ফুটিয়া ওঠে।

স্কুলের মাঠের শেষে, মজানদীর ধারে আমরা দুইজনে বসিয়া। সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই হাওয়াটা থামিয়া গিয়া একটা গুমট পড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে সৌদামিনীর কথা কি হয় শুনিবার জন্য সমস্ত জায়গাটা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

গল্প যখন শেষ হইল অনিল বলিল, "ভেবেছিলাম তোকে আরও দুটো দিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারলেই ভাল হ'ত।"

একটু হাসিয়া বলিলাম, "হঠাৎ?"

অনিল বলিল, "নিতান্ত হঠাৎ নয়। মীরা আসবার পর থেকেই কথাটা ভাবছি আমি—মীরার দিক থেকেও, সদুর দিক থেকেও, আর তোর দিক থেকেও। একটা কথা তোকে জিগ্যেস করি—নিশ্চয় লুকুবিনি—তোর কি মনে হয় না যে সদুর দুর্দিনের ঘূর্ণি অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে, খুব সাবধানে না থাকলে, অর্থাৎ খুব দূরে আর নির্লিপ্ত না থাকলে তুইও তার ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যাবি?—যেতেই হবে পড়ে, তুই যা-ই বলিস্ না কেন। তুই দূর ভবিষ্যতের কথা ছাড়; 'ডি. গুপ্ত সেবনের পূর্বে ও পরে'-র মত তোর মনের ফটো নেওয়া যদি সম্ভব হ'ত—'বড়পুকুরে নাওয়ার পূর্বে এবং পরে'—তাহ'লে ফটো দুটো যে সহজেই চেনা যেত আমার এমন মনে হয় না।"

এত গাম্ভীর্যের মধ্যেও হাসি পাইল, বলিলাম, "এত আজগুবী তুলনাও তোর মেলে অনিল!"

অনিল হাসিল না, বলিল, "তুলনা আমার তোদের মত সাহিত্য-সাজানো না হোক, নিখুঁত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রমটা উল্টে যাবে—ডি গুপ্ত খাওয়ার আগে রুগ্ন, পরে পালোয়ান, বড়পুকুরে নাওয়ার আগে পালোয়ান, পরে রুগ্ন। কথাটা অস্বীকার কর্ একবার!"

বলিলাম, "বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে শুধু, অর্থাৎ ও-রকম অবস্থায় ছোটবেলার নিত্য-সঙ্গিনী কেউ পড়লে সহানুভূতি না হ'য়েই পারে না। তুই সহানুভূতি জিনিসটাকে অতিরিক্ত গাঢ় রঙে রাঙিয়ে একেবারে অন্য জিনিস ক'রে তুলতে চাইছিস্।"

অনিল বলিল, "আর একটা উপমা না দিয়ে পারলাম না। চোর যখন সিঁদকাঠি নিয়ে যথাপদ্ধতি গৃহস্থের ঘরে ঢোকে তখন ততটা সাংঘাতিক হয় না, যতটা হয় সে যদি অতিথি-অভ্যাগতের বেশে এসে খোঁটা গেড়ে বসে। তুই যদি ভালবাসা বলে চিনতে পারতিস্ জিনিসটাকে তাহ'লে মীরার দিক দিয়ে বিপদটা কম ছিল, কিন্তু এই যে ভালবাসাকে ছেলেবেলার সদুর জন্যে সহানুভূতি বলে ভুল করছিস্, এইটেই হচ্ছে

মারাত্মক। মনে রাখতে হবে আমি সমস্ত কথাই মীরার মুখ চেয়ে বলছি। মীরার কথা বাদ দিলে আমার মত যে কি এ-সম্পর্কে তোকে আগেই বলেছি, তুই চটেও গিয়েছিলি। এখন আবার তোকে উল্টো বলব শৈল, তুই সৌদামিনীর কথা আর একেবারেই ভাবিস্‌নি, ভাবলে মীরার উপর ঘোর অন্যায় হবে। সৌদামিনীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তোর পক্ষে অপরাধ নয় একটা, কিন্তু কাল যা দেখলাম তাতে মীরার সম্বন্ধে আর অন্য রকম ব্যবহার শুধু অপরাধ নয়, পাপ তোর পক্ষে। মীরা তোকে ভালবাসে শৈল, আর এই ভালবাসার জন্যে সে অনেক কিছু ত্যাগ করতে বসেছে।"

অনিল চুপ করিল এবং ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ আর কোন কথাই বলিলাম না। অনেকক্ষণ। চারিদিক আরও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, শুধু মজা-নদীর গহ্বর থেকে একটা পোকার একঘেয়ে সংগীত উঠিয়া শব্দের একটা পাতলা কুহেলী বিস্তার করিতেছে।

অনিল হঠাৎ "শৈল!', বলিয়া এমন উত্তেজিতভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অনিল কখনও উত্তেজিত হয় না; এ এক অভিনব ব্যাপার। বলিল, "শৈল, সব ভুল বলেছি, তাই চুপ ক'রে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। সদুকে বাঁচাতে হবে। আমার উপায় নেই! মাঝখানে অম্বুরী, সাম্ব, খুকী। তুই জানিস্ আমি আমাদের ছেলেবেলার নিত্য-সহচরীকে ভুলিনি, তবে আমি ছেলেবেলাতেই বাঁধা পড়ে গিয়ে নিতান্ত নিরুপায়। আমি যা পারলাম না তোকে তাই করতে হবে শৈল; সদুকে ভাগবতের গ্রাস থেকে বাঁচাতেই হবে। ঐটিই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় কর্তব্য—এর সামনে মীরার ভালবাসা একটা সৌখীন বিলাস মাত্র। কে বলতে পারে মীরা তোকে সত্যিই ভালবাসে? আর যদি বাসেই তো অঙ্কুরে রয়েছে সে-ভালবাসা এখনও। তোর নিজের মনের অবস্থা তুই নিজেই জানিস্। যদি খুব এগিয়ে গিয়ে থাকিস্ তো কিছু বলতে পারিনে। তা যদি না হয় তো একটা কথা তোকে ভেবে দেখতে হবে—সত্যিই কি মীরা তার ঐ হেরিডিটির গুমর—ঐ বেয়াড়া রকম আভিজাত্যের গর্ব ঠেলে তোকে গ্রহণ করতে পারবে? কাল যে ছুটে এসেছিল এটা খুব বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই ভাবটা কি স্থায়ী হতে পারবে ওর জীবনে? যদি কোন সময় অন্য ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো তোর জীবনটা কি বিষময় হ'য়ে উঠবে না? সামাজিক স্তরে তোদের দু-জনের প্রভেদটা অত্যন্ত বেশি। ভালবাসা এ প্রভেদ মেটাতে পারে; কিন্তু সে অসাধারণ ভালবাসা! তোদের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটা ডেভেলাপ্‌ড হয়েছে বলে অনুভব করিস্ শৈল?"

যেন আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, ধরে নিলাম হয়েছে, তবু তোকে

ঘুরতে হবে। জীবনে কত বড় বড় জিনিস ছাড়তে হয়, নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে হয়, সে তো মানুষেই করে? তার জন্যেও তো মানুষে মানুষের দিকেই চেয়ে থাকে? ···সদু বসেছে মরতে—মরলেও ছিল ভাল—মরার চেয়ে একটা ভীষণ অবস্থা ওর সামনে, এ সময় একটা হাল্কা ভাব নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে বসা—আমার মাথায় ঠিক আসছে না ব্যাপারটা শৈল। Nero fiddled while Rome burnt,—এটা হচ্ছে যেন তার চেয়েও একটা উৎকট বিলাসিতা।"

একদমে কথাগুলা বলিয়া গিয়া অনিল একটু চুপ করিল। আমি অবশ্য কোন উত্তর দিলাম না; কেন-না অনিল আমাকে কোন প্রশ্ন করে নাই, ওর উত্তেজিত কথাগুলা ছিল সেই ধরনের জিনিস যাহাকে ইংরাজীতে Thinking aloud অর্থাৎ শব্দিত চিন্তাবলী।

অনিল অন্ধকারে সম্মুখের পানে চাহিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে মুখের উত্তেজিত ভাবটা মিলাইয়া আসিল; ধীরে ধীরে শব্দিত চিন্তার ভঙ্গিতেই বলিল, "এদিকেও কি সহজ? আমি যেন বলে গেলাম গড়গড় ক'রে।···বিধবা-বিবাহ, তার মানে নিজের পরিবার, নিজের সমাজ থেকে চিরনির্বাসন। তাও আবার ইচ্ছে করলেই কি হবে?—ভাগবতের দুর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সদুকে ··"

সহসা উঠিয়া অনিল বলিল, "ওঠ, যা হবার হবে, আর ভাবতে পারি না।"

পরদিন বিকালে সাঁতরা ছাড়িলাম। জেঠাইমা বলিলেন, "সুবিধে পেলেই আসবি শৈল, তুই এলে অনা বরং ভাল থাকে, না হ'লে কী যে আকাশ-পাতাল ভাবে সর্বদা? আর বিয়ে-থা কর একটা—যা বুঝি! কেমন যেন নেড়া নেড়া ঠেকে।

বাহিরের উঠানে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া অম্বুরী একটু আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "এত কাছে আছ ঠাকুরপো ইচ্ছে করলেই টুপ ক'রে চলে আসতে পার কিন্তু এমনি ভুলেছ আমাদের যে মনে হয় যেন কত দূরেই যাচ্ছ, কত দিনের জন্যেই না বিদেয় দিতে হচ্ছে।"

সামুকে শিখাইয়া দিল, "বল্ শৈল কাকা নিশ্চয় আসবে শীগ্‌গির।"

সামু ঝাঁকড়া মাথাটি ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, শৈল টাকা নিশ্চয় ঠেলনা নিয়ে আসবে ঠীগ্‌গির।"

বলিলাম, "সেয়ানা ছেলে তোমার অম্বুরী।"

বিদায়ের বিষন্ন আকাশে হাসির একটু বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। গাড়ি ছাড়িবার পূর্বে অনিল বলিল, "একটা বোধ হয় দুর্ভাবনা নিয়ে যাচ্ছিস শৈল। কিন্তু উপায় কি? দেখলি তো ভেতরে ভেতরে ও কত ক্লান্ত, কত নির্ভর করে রয়েছে আমাদের ওপর?'

১

মীরা-সৌদামিনী

লিণ্ড্‌সে ক্রেসেণ্টে ফিরিয়াই একটা মস্ত বড় পরিবর্তনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

যখন বাসায় পৌঁছিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জামা জুতা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া একটা ডেক্‌-চেয়ারে গা এলাইয়া দিলাম। সাঁতরার এই কয়টি দিনের অভিজ্ঞতা এত ঘনীভূত, আর আমার বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এত বিভিন্ন যে, মনে হইতেছে কত দূর আর কত দীর্ঘ এক প্রবাস হইতে ফিরিলাম যেন। কোন্‌টা যে প্রবাস তাহাও ঠিক বুঝিতেছি না। মনটা স্মৃতির ভারে বিষণ্ণ হইয়া আছে—সুখের স্মৃতি, আবার সৌদামিনীর স্মৃতিও। বেশি মনে পড়িতেছে সৌদামিনীর কথাই,—আহা!

নীচে লোক কেহ নাই, বাড়িটি থম্‌থম্‌ করিতেছে, এসব বাড়ি করেই, আজ যেন বেশি। আমার মনের ঔদাসীন্যের জন্যই কি?

ইমানুল আসিয়া উপস্থিত হইল: সেই রকম বিরহক্লিষ্ট, হাতে একটি ফুলের তোড়া। সেলাম করিয়া দন্ত বাহির করিয়া একটু হাসিল, প্রশ্ন করিল, "ভাল থাকছিলেন মাস্টার-বাবু?"

বলিলাম, "ছিলাম একরকম। তোমার খবর কি ইমানুল? বাড়িতে কাউকে দেখি না যে?"

ইমানুল বলিল, "আপনাকে আসতে দেখে ভাবলাম একটা তোড়া দিয়ে আসি। দাড়ান, রেখে আসি এটা অন্দরে।"

তোড়াটা ফুলদানিতে বসাইয়া ইমানুল আমার সামনে থামে ঠেস্‌ দিয়া বসিল, বলিল, "দিদিমণিরা বাইরে গেছেন।...মদন ক্লীনার একটা কথা বললে মাস্টার-বাবু, বলে পাত্রীকে লিখে কিছু হবে না, বলে তাকেই সোজা লেখ, সে তো সাবালিকা হয়েছে..."

একটু উদ্বিগ্নভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "লিখেছ নাকি?"

ইমানুল লজ্জিতভাবে একবার আমার পানে চাহিয়া ঘাড়টা নীচু করিল। উত্তরটা বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, "না, বলছিলাম—নিয়েছ লিখিয়ে কাউকে দিয়ে?"

ইমানুল লজ্জিতভাবে বলিল, "ইংরিজীতে লিখতে হবে..."

বলিলাম, "ও! তাও তো বটে, তা দোব লিখে।"

সামান্য একটু থামিয়া ইমানুল বলিল, "মদন ক্লীনার একটা পত্র দিয়েছে মাস্টার-

বাবু, সেটাও ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে…"

ইমান্নুল বোধ হয় পত্রটা বাহির করিবার জন্যই ফতুয়ার পকেটে হাতটা সাঁদ করাইয়াছে, এমন সময় গেটে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। ইমান্নুল অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেট খুলিতে ছুটিল।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে মীরা আর তরু নামিল। আমাকে দেখিয়াই মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এসে গেছেন তাহ'লে আপনি? ভাবছিলাম আপনাকে গাড়ি পাঠাব।…মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

মীরার দৃষ্টি খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, তরুও উৎকণ্ঠিতভাবে আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি উত্তর করিলাম, "না, আমি এই আসছি, করিনি তো দেখা এখনও।…কেন?"

"বলেনি কেউ? ভুটানী মারা যাওয়ার পর থেকে মা বড্ড বেশি…"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "মারা গেছে ভুটানী?"

মীরা বলিল, "ইমান্নুল বসে ছিল না আপনার কাছে? বলেনি? উজবুক একটা; আসতেই বুঝি পোস্টকার্ড এনে হাজির করেছে?…আসুন ভেতরে! তরু, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে মার কাছে গিয়ে বস, আমি আসছি।"

ভিতরে গিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া মীরা একটা সোফায় বসিল। আমি সামনে একটা চেয়ারে বসিলাম। মীরা বলিতে লাগিল, "ভুটানী এক রকম হঠাৎই কাল বিকেলে মারা গেল, যদিও ও যে আর বেশি দিন নয় এটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে আসছিল। মারা যেতে মা একেবারে আশ্চর্য রকম উতলা হ'য়ে উঠলেন, শৈলেনবাবু! ঠিক যে শোকের ভাব তা নয়; অদ্ভুত রকম একটা নার্ভাসনেস্। বাড়িতে বাবা নেই—এখনও আসেননি তিনি, পুর্ণিয়ার কেসটা নিয়ে আটকা পড়ে গেছেন—আমি যে কী অবস্থায় পড়ে গেলাম বলতে পারি না। আপনি থাকলেও একটা পরামর্শ করবার লোক পেতাম—ফোন ক'রে সরমাদি আর নিশীথবাবুকে ডেকে আনলাম। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ডাক্তার রায়কে ফোন করা হ'ল। তিনি সব শুনে বললেন তাঁর আসাটাই ভুল হবে, কেন-না মার তো হয়নি কিছু, শুধু একটা ভয়ানক নার্ভাস শক্ পেয়েছেন, বরং এ অবস্থায় ডাক্তারকে দেখলে উল্টোই ফল হওয়ার সম্ভাবনা। বললেন, বরং যদি কাঁদবার ঝোঁক থাকে তো কাঁদতে দেওয়া ভাল। কিন্তু কাঁদবার ঝোঁক নয় তো, একটা যেন ভয়ংকর ভয়ের ভাব। বেশির ভাগই চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে শুধু বলেন, 'তাহ'লে আমার কি হবে?' সে যে কী অবস্থায় কেটেছে আমাদের বলতে পারি না, শৈলেনবাবু। বাবাকে আজ সকালেই টেলিগ্রাম করেছিলাম, এখনও উত্তর পাইনি। তিনিও যে কেমন আছেন…"

মীরা তাহার বাবার সম্বন্ধে সভয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ একবার একটু ছলছল করিয়া উঠিয়াই দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নামিল। মীরা সোফার হাতলে মুখ গুঁজিয়া কচি মেয়ের মত কাঁদিয়া উঠিল।

ওর চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিঃসহায় ভাব, ক্লান্তি, উদ্বেগ, আর বাবার উত্তর না পাওয়ায় এই আশঙ্কা ও অভিমান—সব একসঙ্গে ওকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কারণটা নিশ্চয়ই এই যে, এমন একজনকে কাছে পাইয়াছে যাহার উপর ওর একটা আন্তরিক নির্ভর আছে। সমবেদনায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করি আমি?

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল মীরা। আমি নিরুপায়ভাবে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর নিজের চিন্তাধারা খানিকটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আপনি শান্ত হন। বিপদের সময় অতটা ব্যাকুল হ'লে চলে কি? মিস্টার রায়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই; তিনি নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে ওখান থেকে আবার অন্য কোথাও গেছেন, কাল সকাল নাগাদ খবর পাওয়া যাবে। কিংবা এও হতে পারে আপনার টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগেই উনি বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি স্থির হন। আর মার সম্বন্ধে আপনি একটু বেশি নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন। ওঁর শরীরটা দুর্বল নিশ্চয়, কিন্তু ওঁর মাথা বেশ পরিষ্কার আছে, এই আঘাতে অন্য কোন রকম ভয়ের সম্ভাবনা নেই। ওঁর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা খুব দরকারী—জানি না সেটা করা হয়েছে কি না—আপনি যে রকম বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন।"

মীরা অনেকটা সংযত করিয়া লইয়াছে নিজেকে। আমি থামিতেই মুখটা একটু তুলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। বলিলাম, "ওঁকে ও-ঘরটা বদলে অন্য ঘরে আনা দরকার কয়েক দিনের জন্যে। অষ্টপ্রহর ভুটানীর সঙ্গে যে রকম ছিলেন ওখানে, তাতে⋯"

ব্যাপার সামান্যই, কিন্তু মীরা যেন একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মিনতির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি বলুন ওঁকে। সত্যিই বড় ভাল হয় তাহ'লে।"

বলিলাম, "আমি বলছি গিয়ে, রাজিও করাব। আপনি আসবেন কি?"

মীরা চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল। বলিল, "আপনি একলাই যান। যে নিজে অভিভূত হ'য়ে পড়েনি এমন লোকই থাকা দরকার ওঁর কাছে। আমার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া আছে, মা আমায় দেখে আরও যেন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন, শৈলেনবাবু। আমি বুঝছি, অথচ⋯"

নিরুপায় করুণ দৃষ্টিতে মীরা আমার পানে চাহিল। চক্ষু আবার ডবডব করিয়া

উঠিতেছে! দেখিলে কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় নিজের হাতে মুছাইয়া দিই অশ্রুবিন্দু দুইটি।

সেই মীরা আজ আমার কাছে এত দুর্বল হইয়া পড়িল? গভীর দুঃখই কি আসল সম্বন্ধের কষ্টিপাথর?

বলিলাম, "তাহ'লে আমি একাই যাচ্ছি, সেই ভাল হবে বরং। আপনি আর ভাববেন না।"

যে ছোট, আর স্বীয় অন্তরের খুব নিকট, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সময় যেমন একটা মৃদু তিরস্কারের মিশ্রণ থাকে, সেইভাবে বলিলাম, "অত উতলা হয় কখনও মানুষে? দেখুন তো!—ছিঃ!"

২

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে গিয়া ডাকিলাম, "তরু আছ?"

উত্তর করিলেন অর্পণা দেবী, "কে, শৈলেন? এস।"

পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়াছি, তরু আসিয়া আমার হাতটা ধরিল। ও বেচারি যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে, বুঝিতেছি আমায় পাইয়া অনেকটা ভরসা পাইয়াছে। অপর্ণা দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া তরুকে লইয়া একটা সোফায় বসিলাম। অপর্ণা দেবী একটা হেলান চেয়ারে বসিয়া আমি আসিবার পূর্বে বোধ হয় একটা বই পড়িতে-ছিলেন। পায়ের কাছে বিলাস-ঝি বসিয়া তরুর সঙ্গে বোধ হয় তরুর প্রাইজ-বইয়ের ছবি দেখিতেছিল। দেখিলাম কতকগুলা বই ছড়ানো রহিয়াছে।

চরণ স্পর্শ করিতে অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এসে গেছ তুমি, ভালই হ'ল; এরা দুই বোনে বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।"

তরুর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তরু ভেবেছে ওর মা এবার মরে যাবে, মীরা ভেবেছে পাগল হ'য়ে যাবে।"

আমি আর মীরা-তরুর দোষ ধরিব কি, ওঁর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। বিলাস মুখ তুলিয়া বলিল, "বড় মিছে ভাবেনি, কাল তোমার ভাবগতিক ঐ রকমই দাঁড়িয়েছিল, বরং আজ সকাল পর্যন্তও বলতে পারি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, বুড়ীটা ছিল এতদিন কাছে কাছে, হঠাৎ মারা গেল, কষ্ট হয়েছিল যে এ-কথা অস্বীকার করব না; কিন্তু সত্যিই কি আমি এতই অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম?

বিলাস-ঝি বলিল, "অধীর হওয়া বরং ভাল, তুমি একেবারে গুম হ'য়ে বসে থেকে যে আরও ভাবিয়ে তুললে।

অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শোন শৈলেন। শুধু শোকে কেন, যে কোন অবস্থাতেই মানুষ দুটি উপায়ে কাটাতে পারে—হয় চঞ্চল হ'য়ে, না-হয় শান্ত হ'য়ে। যদি একটু অধৈর্য হতাম, এরা বলত শোকে উন্মাদ হ'য়ে গেল ; শান্ত হ'য়ে ছিলাম, এখন বলছে—সে আরও ভাবনার কথা···তোরা বুঝি ভেবেছিলি বিলাস, আমার বাক্‌রোধ হ'য়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ নয় ?"

অপর্ণা দেবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বিলাস রাগিয়া উঠিয়া নথ নাড়িয়া বলিল, "তা বলে তুমি বাপু যেখান-সেখান থেকে ঐ সব নেপালী ভুটানী টেনে আর বাড়িতে তুলতে পারবে না, এটা আমি বলে দিলাম। যত সব অনৈরন তোমার। জানা নেই শোনা নেই ··"

এময় সময় পর্দার বাহির হইতে রাজু বেয়ারার গলা শোনা গেল, "বিলাস, বড়দিদিমণি ডাকছেন তোমায় একবাব।"

বিলাস উঠিয়া গেল। বোধ হয় আমার কথাবার্তার সুবিধার জন্যই মীরা তাহাকে সরাইয়া লইল, বাকি সুবিধাটুকু অন্য প্রকারে হইয়া পড়িল। অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "মীরার এই অবস্থা—ক্রমাগতই বিলাসকে ডেকে পাঠিয়ে খবর নিচ্ছে, মা আছে কি গেল। এদিকে তরু একেবারে আগলে আছে ওর মাকে—পাছে ভুটানী-বুড়ী ডেকে নেয়।"

তরু অভিমানের সুরে বলিল,—"যাও, ভারি দুষ্টু তুমি মা !"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "দুষ্টু মা যাওয়াই তো ভাল। বেশ একটা ভাল মা আসবে···"

দেখিলাম অপর্ণা দেবী ভুল করিতেছেন। তরুর মুখটা জলভরা মেঘের মত থম্-থম্ করিয়া উঠিয়াছে, এধরনের কথা আর একটু চালাইলেই ও আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবে না। বলিলাম, "হ্যাঁ, তরু, তুমি বরং যাও, বই-টইগুলো ঠিক ক'রে রাখ গিয়ে। ভয় নেই, পড়তে হবে না, এসে একবার দেখে নিচ্ছি এ ক'টা দিনে কোন্ পড়া কতদূর এগুল। যাও তুমি।"

তরু চলিয়া গেলে অপর্ণা দেবী অনেকক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন। হঠাৎ এই চুপচাপের ভাবটা ক্রমেই বড় অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও একটা ব্যাপার দু-একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম, অপর্ণা দেবীর আনমিত মুখের ভাবটা ক্রমেই পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে—কেমন একটা গম্ভীর চিন্তিত ভাব, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা বিভীষিকার অতলে তলাইয়া যাইতেছেন।

সহসা মুখ তুলিয়া এমনভাবে চাহিলেন, বেশ টের পাওয়া গেল আমার উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। চেয়ারে

মাথাটা হেলাইয়া দিয়া সুপ্তোত্থিতের মত দুই হাতে নিজের মুখটা একবার মুছিয়া লইলেন, তাহার পর আবার সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শৈলেন, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে।"

ঐটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। একটু পরে অপর্ণা দেবী আবার বলিতে লাগিলেন, "ভুটানীর মৃত্যুটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে শৈলেন; অবশ্য তুমি আর কি করবে, তবুও যেন একজন কাউকে বললে মনটা হাল্‌কা হচ্ছে না। তোমার মনে থাকতে পারে, একদিন তুমি জিগ্যেস করতে ভুটানীর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কার কথা তোমায় বলেছিলাম আমি। তোমায় বলেছিলাম—মনের গতি বড় দুর্জ্ঞেয়, যখন ভাবা যায় বাইরের কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় ক'রে ওপরে উঠছে, তখন হয়তো সে ভেতরে ভেতরে আরও নিজের চিন্তা নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা বড় সাংঘাতিক, আর ভুটানীর ব্যাপারে ঠিক এই কাণ্ডটাই হ'ল। ওকে নিয়ে আমার একটা পরীক্ষা চলছিল জানই। শেষের দিকে এই পরীক্ষাটা আশ্চর্য রকম সফল হ'য়ে আসছিল। বুড়ি এদিকে একেবারে বুদ্ধগত প্রাণ হ'য়ে উঠল। ওর পুজোটা বসে বসে খালি বুদ্ধের জপ থেকে বুদ্ধের সেবায় গিয়ে দাঁড়াল—বৈষ্ণবেরা সেবার মধ্য দিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণের পূজো করে—ধোওয়ান, মোছান, সাজান। অল্প উত্তেজনাতেই যে 'বেটা-বেটা' ক'রে উঠত সে ভাবটাও কমে এল, আর সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন এই হ'ল যে, ওর মনটা যে নিঝুম মেরে থাকত, সেটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। আমি ঝোঁকের মাথায় বৌদ্ধ ধর্মের কিছু বই আনিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম, ইচ্ছে ছিল ধর্মের স্থূল কথাগুলো বুড়ীর মনে আস্তে আস্তে সাঁদ করানো! ওদিকে আলোচনার মধ্যে একেবারেই আসতে চাইত না, কিন্তু এদানিং নিজেই এসে বুদ্ধ সম্বন্ধে আর তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করত, বললে মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করত. বেশ বোঝা যেত সে যেন নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। তারপর আবার হঠাৎ বদলে গেল বুড়ী। পরশু দিন বিকেলে আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে গেলেই বুড়ী সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেদিন জানিয়ে দিলে বুকটা একটু কেমন করছে, যাবে না। ফিরে এসে দেখি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের মূর্তিটাকে বুকে চেপে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর ওর নিজের ভাষায় বিড় বিড় ক'রে কি বলছে। পেছন ফিরে ছিল বলে আমায় দেখতে পায়নি, যখন টের পেলে আমি এসেছি, একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে আমার কাছে এসে বসে নিজে থেকেই বুদ্ধের কথা পাড়লে। সন্ধ্যা থেকে জ্বর এল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে এক-শ পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠেলে উঠে বিকার আরম্ভ হ'ল—শুধু ছেলের কথা। সে যে কী কষ্টের ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস হয় না শৈলেন। ওর নিজের ভাষা বুঝি না, কিন্তু

যেন মনে হচ্ছে ও ওর ছেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও যেন দেখা পেয়েছে, বাড়ি যাবার জন্যে সাধছে। ছেলের বৌকে দেবে বলে বুড়ী ফুলকাটা ইটালিয়ান র‍্যাপার আর চব্বিশ কলার ছুরিটা সর্বদাই বুকের কাছে রাখত—বিকারের ঝোঁকে এক-একবার ঝোলার মধ্যে হাত দিয়ে সেগুলো বের ক'রে আনবার চেষ্টা করছে, আর এক-একবার শূন্যদৃষ্টিতে কাতরভাবে শুধু 'মেমসাহেব, বেটা দেও, বেটা দেও।' ওর ছেলের সন্ধান নিতে যেমন কসুর করিনি, ডাক্তারের বেলাও সেই রকমই যথাসাধ্য করলাম, কিন্তু রোগের কিছুই উপায় হ'ল না। ডাক্তাররা বললে ওর ব্রেন অ্যাফেক্ট করেছে, রক্তেরও জোর নেই, কোন আশাই নেই। সমস্ত রাত একভাবে গিয়ে সকালের দিকে বুড়ী একটু নিঝুম হ'য়ে পড়ল। বেলা যখন আটটা, মনে হ'ল বুড়ীর যেন একটু একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে। সেটা প্রদীপ নেবার আগে জ্বলে ওঠা আর কি। তারপরই—ঘড়িতে ঠিক যখন ন'টা-পনের হয়েছে, বিকারের শেষ ঝোঁকটা উঠে বুড়ী মারা গেল।''

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। খুব সহজভাবে ব্যাপারটা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলেও বোঝা গেল তাঁহার মনের উপর বেশ খানিকটা ঝোঁক পড়িয়াছে। শেষ করিবার পর তাহার প্রতিক্রিয়াটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। যেন, যে ব্যাপারটুকু এইমাত্র বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেটা এবার সত্যের স্পষ্টতায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধতার মাঝে একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম অপর্ণা দেবীর মুখের চেহারাটা বদলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া আছেন, মুখে একটা চাপা আতঙ্কের ভাব, আর সেটা যেন বাড়িয়াই যাইতেছে। আমার ভয় হইল! বেশ বুঝিতে পারিলাম এই জিনিসটি দেখিয়াই মীরা প্রমুখ সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, আর চেষ্টা করিয়া অপর্ণা দেবী আমার কাছে এই ভাবটাই গোপন করিয়া আসিয়াছেন এতক্ষণ।

আমি যে কি বলিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তাহার পর মনে হইল ঘরটা কয়েক দিনের জন্য বদলাইয়া ফেলিবার কথা বলি। পাড়িতে যাইব কথাটা, অপর্ণা দেবী আমার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া কতকটা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, 'বুড়ী গেছে খুবই ভাল হয়েছে শৈলেন, ওর জীবন যে কী দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল তা আমি বুঝতাম, কিন্তু ওর মৃত্যুটা হ'ল বড় ভীষণ!—শেষ পর্যন্ত জগতে আর ওর ধর্ম রইল না, কিছু রইল না, রইল শুধু ওর ছেলে কিংবা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে—ওর ছেলের স্মৃতি। আমি অস্বীকার করব না শৈলেন, আমি ভয় পেয়ে গেছি,··· আমার পরিণামও কি শেষ পর্যন্ত এই হবে? আমার দৃষ্টির সামনে থেকেও ঐ রকম ক'রে ইহকাল পরকাল সব মুছে গিয়ে শুধু জেগে থাকবে এক অপদার্থ ছেলের মূর্তি?

কি ভয়ংকর অবস্থা বল তো শৈলেন, ভাবতে পার? আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না; আমি প্রাণপণে আমার দূরদৃষ্ট থেকে সরে যেতে চেষ্টা করছি। আমি ধর্মে বিশ্বাসী— আমাদের যা ধর্ম, যাতে বলে ভগবান সহস্রমূর্তিতে আমাদের ঘিরে রয়েছেন—সেই ধর্ম আমি জীবনে সত্য ক'রে নিয়েছি। আমার আলমারীতে যা বই দেখছ, আমার ঘরে যা ছবি দেখছ, সে-সব আমার ঘর সাজাবার সৌখিন উপকরণ নয় শৈলেন; কিন্তু আমার আর সন্দেহ নেই কোন এক সময় ভুটানীর মত আমার ছেলের স্মৃতি যখন কাল হ'য়ে আমার জীবনে দেখা দেবে, তখন অন্য কিছুই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কি পাপে এই পরিণাম আমার জন্যে ওত পেতে রয়েছে শৈলেন? কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়?—কেন এমনটা হ'ল?"

কখনও এ রকম ভাবান্তর দেখি নাই অপর্ণা দেবীর মধ্যে, অথবা বোধ হয় মাত্র আর একদিন দেখিয়াছিলাম—যেদিন ভুটানী প্রথম আসে। সেও কিন্তু বিস্ময়কর হইলেও এতটা ভয়াবহ ছিল না। আমি নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলাম, একটু বিরতির সুযোগ পাইয়া শান্ত, সহজ কণ্ঠে বলিলাম, "আপনি মিছিমিছি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, একটা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মনের ওপর একটা ঘটনার প্রভাব যেভাবে পড়েছে ঠিক সেইভাবে যে আপনার ওপরও পড়বে এটা আগে থাকতে ধরে নিয়ে আপনি উতলা হ'য়ে উঠছেন, কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

অপর্ণা দেবী খুব অন্যমনস্ক হইয়া আমার কথাগুলা শুনিতেছিলেন, একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সব মায়ের মন এক শৈলেন,—শিক্ষার সেখানে প্রবেশ নেই। আমাকে যদি শিক্ষিত বলে মনেই করো তো অমন ছেলের চিন্তাই বা আমি করতে যাই কেন? না, ওতে রক্ষা করতে পারবে না। বরং অশিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বেশি, আমার সেই আশা ছিল বলেই আমি ভুটানীকে এই পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলাম,—কিন্তু অসম্ভব! কি রকম সর্বনেশে ব্যাপার দেখ—বুদ্ধদেব ওর ছেলেকে নিজের মধ্যে টানতেপারলেন না, শেষ পর্যন্ত নিজেই ওর ছেলের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। আমি যে সেদিন বেড়িয়ে এসে দেখলাম বুড়ী পেতলের বুদ্ধমূর্তিকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে—তার ভেতরকার ব্যাপারটা বুঝেছ তো? পেতলের মধ্যে বুদ্ধদেব গেছেন নির্বাণ হয়ে, তার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর ছেলে। অনেক দিন থেকেই এই ব্যাপারটা চলছিল ··ধোওয়ান, মোছান, সাজানর মধ্যে যে বুড়ী তার ছেলেকেই দেখে যাচ্ছে, এতটা সন্দেহ না ক'রেই আমি আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে খুশি হ'য়ে উঠেছিলাম। টের পেলাম, যখন আর একেবারেই উপায় নেই।—শৈলেন আমি সত্যই ভয় পেয়েছি। মীরা, তরু— ওরা আমায় দেখে যে আকুল হ'য়ে উঠেছে তাতে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই, কেন-না

চেষ্টা ক'রেও আমি ভয়টা চাপতে পারিনি সব সময়। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার কি হয়েছে জান?—যখন থেকে অসুখে পড়েছিল হাজার চেষ্টা ক'রেও আমি ওকে এক বার বুদ্ধদেবের নাম মুখে আনাতে পারিনি। বিকারের সময় তো কথাই নেই—অসুখ যখন শুরু হয়, আর শেষকালে যখন ওর জ্ঞান হয় খানিকক্ষণ, তখনও হাজার চেষ্টা ক'রেও ওর মনটা বুদ্ধদেবের দিকে ফেরাতে পারিনি। যত বলি—বোলো—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'—অন্তত একবার নামও করুক বুদ্ধদেবের—শুধু বুকে হাত দিয়ে 'বেটা —বেটা—বেটা—মেমসাহেব বেটা দেও'—"

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। আমিও আর কিছু বলিলাম না—নূতন করিয়া আবার কোন দুর্বল স্থানে স্পর্শ দিব এই ভয়ে। ওঁর দৃষ্টি ক্রমে মুক্ত জানালার বাহিরে গিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে দৃষ্টি শান্ত এবং মুখের ভাব সহজ হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম একজনকে কথাগুলা বলিতে পারিয়া মনটা হাল্‌কা হইয়াছে। ধীমতী নারী—মনের ব্যাধিও চেনেন, ঔষধ সম্বন্ধেও ধারণা আছে,—সেই জন্য গোড়াতে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি করবে? কিন্তু তবুও একজনকে বলা দরকার।"

আরও অনেকক্ষণ গেল। একবার বাহির হইতে দৃষ্টি গুটাইয়া লইয়া খুব স্নেহদ্রব কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "খোকাকে 'অপদার্থ' বললাম, না শৈলেন?—ক'বার বললাম বল তো?"

চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আরও কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ অপর্ণা দেবী আবার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "শৈলেন, কিছু একটা হওয়া দরকার; এভাবে এ অবস্থায় আমি থাকতে পারছি না, কিরকম যেন অসহ্য হ'য়ে উঠছে।—উনি কবে আসবেন টের পেয়েছ?"

টের পাই সেটা আর বলিলাম না। বলিলাম, "কাল আসবেন···আমার একটা ছোট্ট কথা মনে হচ্ছে, অনুমতি দেন তো বলি।"

অপর্ণা দেবী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বল।"

বলিলাম, "আপনার আপাতত এ-ঘরটা একটু বদলান দরকার।"

অপর্ণা দেবী ঘরের চারিদিকটা, বিশেষ করিয়া ভুটানী যেখানটায় থাকিত—বুদ্ধের মূর্তি, ভুটানীর চেয়ার—একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দরকার একটু বটে! তরু ওপরে যে ঘরটায় পড়ত সেইটে আমার জন্যে ঠিক ক'রে দিতে বলবে?"

৩

সুখের বিষয় আমার আন্দাজটা ফলিল—মিস্টার রায় পরদিন সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেড়াইবার বাতিক আছে একটু; বাহিরে গেলে তার সুযোগ ছাড়েন না; পূর্ণিয়া-ফেরত মালদহে নামিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিলেন! ভুটানীর মৃত্যুর কথা শুনিয়া বলিলেন, "So she is dead (তাহ'লে মারা গেল)? অপর্ণার পক্ষে ভাল কি মন্দ হ'ল ঠিক বুঝতে পারছি না, অন্তত কতকটা অন্যমনস্ক থাকত। Poor girl! We must watch and see how it re-acts on her. (ওর মনের ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, দেখা দরকার)।"

আমি আর মীরা দুজনেই ছিলাম। মীরা প্রতিক্রিয়াটা কি রকম শুরু হইয়াছে বোধ হয় বলীতে যাইতেছিল, আমি চোখের ইসারা করিয়া বারণ করিয়া দিলাম।

বিকালে আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি—আমি, মীরা আর তরু। তরুকে লইয়া বেড়াইতে যাইব, মোটরে একটা কি হইয়াছে; ড্রাইভার সেটা শোধরাইতেছে। নিশীথ আসিল। নূতন একটা সিডন-বডি গাড়ি কিনিয়াছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখের ভাবটা। ভিতর থেকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "গুড্ আফটারনুন মিস্ রায়," সঙ্গে সাঙ্গে ফেল্ট টুপিটা হাতে করিয়া নামিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা একেবারে শুক্‌নো মত করিয়া প্রশ্ন করিল, "বাই দি বাই, মা কি রকম আছেন? সকালবেলা কোনমতেই আসতে পারলাম না। নেক্সট বোটে বোধ হয় সেল্ করতে হবে। কতকগুলো প্রিলিমিনারিজ্ ঠিক করতে এমন আটকে গেলাম!"

কথা কহিতে কহিতেই হ্যাট-র‍্যাকে টুপিটা রাখিয়া উহারই মধ্যে চকিতে একবার আর্শির মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছায়াটা দেখিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসিল। আবার প্রশ্ন করিল, "মিসেস্ রায় আছেন কি রকম বলুন তো; রাত্তিরটা যা কেটেছে!"

লোকটা দিনকতক, কি কারণে জানি না, একটু যেন ঢিলা দিয়াছিল, আবার প্রাণপণে স্বয়ংবর-সমরে নামিয়াছে। নূতন মোটরও বোধ হয় একটা অস্ত্রই। বোধ হয় আমার এই কয়েক দিনের অনুপস্থিতির সুযোগে আবার নূতন স্টার্ট লইয়াছে। আমার প্রতি ভাবটা এমন দেখাইল যেন আছি কি নাই সে খবরই জানে না ও।

মীরা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "থ্যাংক্ ইউ, মা অনেকটা ভালই আছেন।...শৈলেনবাবুর একটা পরামর্শে অনেকটা সুবিধে হ'ল। সামান্য কথা অথচ আমাদের মাথা একেবারেই আসেনি। মার ঘরটা রাত্তিরে বদলে দিলাম। এটুকুতেই অনেকটা

যেন অন্যমনস্ক আছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

আমি অন্যদিকে চাহিয়া ছিলাম, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার নিশীথের দিকে চোখ পড়িয়া গেল। পরামর্শ দেওয়ার অপরাধে, আমাকে যদি একবার পায় তো যেন চিবাইয়া খায়। মুখের ভাবটা পরিবর্তন করিয়া লইয়া বলিল, "দাঁড়ান, ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। আপনাকে বোধ হয় বলেও থাকব, বলিনি ?"

মীরা বলিল, "আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বলে থাকবেন বোধ হয়।"

"তবে কি তরুকে বললাম ?"

তরু মীরার মত আর সন্দেহের কিছু রাখিল না, বলিল, "না, আমায় তো বলেননি !"

নিশীথ আমার পানে আর একটা কটাক্ষ হানিল—এবার বোধ হয় আমার ছাত্রী স্পষ্ট কথা বলে এই অপরাধে। অন্যায় হইয়াছিল কি না জানি না, তবে আমি একটা লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কতকটা উহার পানে চাহিয়া বলিলাম, "ঘর-বদলানর কথাটা আমার মাথায় প্রথমে আসেনি, এইখানেই কার মুখে যেন শুনলাম মনে হচ্ছে—এখন আপনি বলায় বুঝতে পাচ্ছি ..."

মীরা আমার পানে একবার চকিতে চাহিল, যেন না চাহিয়া পারিল না। নিশীথও আমার পানে আর একবার বক্রদৃষ্টি হানিয়া সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথা পাড়িল ; প্রশ্ন করিল, "মিস্টার রায় এসেছেন শুনলাম !"

মীরা বলিল, "আজ সকালে এসেছেন বাবা।

একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনা যেন নামিয়া গেল, নিশীথ এইভাবে বলিল, "বাঁচা গেল। **I hope he was perfectly all right** (আশা করি বেশ ভালই ছিলেন)।"

মীরা উত্তর করিল, "থ্যাংক্স। ভালই ছিলেন বাবা ...ওঁর বেড়াবার ঝোঁক ; ফেরার মুখে গৌড়ের রুইন্‌স্ দেখে ফিরলেন, তাইতেই দেরি হ'য়ে গেল।"

নিশীথ মুখ ভার করিয়া গাম্ভীর্যের অভিনয় করিয়া বলিল, "ওঁর সঙ্গে একচোট বোঝাপড়া আছে আমার, উনি ওদিকে মন্দির-মসজিদের রুইন্‌স্ দেখে বেড়ান, এদিকে মানুষের রুইন্‌স্ নিয়ে যে ..."

সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্ট এত বড় একটা রসিকতায় বাড়ির অবস্থা ভুলিয়াই মুক্তকণ্ঠে হাসিতে যাইবে, ড্রাইভার আসিয়া বলিল, "ঠিক হ'য়ে গেছে, গাড়িটা।"

আমি আর তরু উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশীথ বলিল, "মিস্ রায়ের কোথাও এন্‌গেজমেন্ট আছে নাকি ?"

মীরা একটু বিলম্বিত কণ্ঠে বলিল, "কই, না !"

"তাহ'লে আমার গাড়িটা রয়েছে। সর্বদাই বাড়িতে বসে থাকাটা ঠিক নয়

আপনার পক্ষে।"

মীরা শরীরটা একটু এলাইয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "একেবারেই বেরুতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন একটা কুড়েমিতে পেয়ে বসেছে।"

নিশীথ বলিল, "সে-সব কিছু শোনা হবে না ; নিন, উঠুন।"

নিমরাজি দেখিয়া এতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে আমা হেন উপেক্ষণীয়কেও সাক্ষী মানিয়া বসিল, "কুড়েমিতে পাওয়াটা একটা দুর্লক্ষণ নয় মাস্টারমশাই ?'

বলিলাম, "নিশ্চয়ই, অবশ্য নিশিতে পাওয়াকে যদি সুলক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়।"

মীরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিশীথও হাসিল, অবশ্য বুঝিলে কখনই হাসিত না। মীরা উঠিয়া গেল, বলিল, "দাঁড়ান, তাহ'লে, এক্ষুণি আসছি, নেহাতই যখন ছাড়বেন না।

নিশীথ আমাদের একটু আটকাইয়া দিল। তরুকে বলিল, "মিস্ রায় জুনিয়ার, তোমার জন্যে একটা চমৎকার জিনিস জোগাড় ক'রে রেখেছি। আন্দাজ কর তো কি ?"

তরু লুব্ধভাবে একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে আবদারের স্বরে বলিল, "না, আপনি বলুন, আমার কিছুই আন্দাজ আসছে না। বলুন, হ্যাঁ বলুন ?"

নিশীথও তারও একটু লুব্ধ করিয়া তুলিল, তাহার পর দুই হাত দেখাইয়া বলিল, "এই ইয়া বড়া এক লালমোহন !"

নিশীথ স্বয়ংবর-সংগ্রামে চারিদিক থেকেই তোড়জোড় লাগাইয়াছে। তরু উৎফুল্ল হইয়া…"আজই আনতে যাব, নিশীথদা"—বলিয়া নিশীথকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এমন সময় মীরা নামিয়া আসিল, বলিল, "নিশীথবাবুর যদি আপত্তি না থাকে তো…"

নিশীথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "কি, কি ? বলুন, আপত্তি কিসের ?"

"মাকেও নিয়ে গেলে হ'ত না আমাদের সঙ্গে ?"

নিশীথের মুখের সমস্ত দীপ্তি যেন নিবিয়া গেল। স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই·· তাঁকে যদি নিয়ে যেতে পারেন তো…"

নিশীথের অলক্ষ্যে মীরা আমার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেন যে—স্পষ্ট বুঝা, গেল না।

অপর্ণা দেবীর অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথাটা মীরাকে বলি নাই, রাত্রে আহারাদির পর মিস্টার রায়কে একান্তে তাঁহার ঘরে বসিয়া বলিলাম। মিস্টার রায় সুরাপাত্রটা ধরিয়া তীব্র উদ্বেগের সঙ্গে কাহিনীটা শুনিতেছিলেন, শেষ হইলে ছাড়িয়া দিয়া কৌচটাতে হেলান দিয়া নিজের কোলে হাত দুইটা জড় করিয়া লইলেন। বলিলেন :

"Here is a pretty piece of business (চমৎকার ব্যাপার) ! ভুটানীর আসার পর থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শৈলেন, যে এই রকম ব্যাপার ঘটবেই ; যদিও ওকে একটু ভুলে থাকতে দেখে এক-একবার আশ্বস্তও হ'য়ে থাকব। আসল কথা—নিজের জীবনের যা ট্র্যাজেডি সেইটে অষ্টপ্রহর আবার অন্যের জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখতে থাকা—এর ফল কখনও ভাল হয় না। আমি অপর্ণাকে দু'একবার হিন্ট্ দিয়েছিলাম। কিন্তু জানই she is self-willed (সে জেদী)। যাক, এখন করা যায় কি ? This must not be allowed to continue (এ ব্যাপারটা কোন-মতেই স্থায়ী হ'তে দেওয়া চলে না)।"

মিস্টার রায় অনেকক্ষণ দুইটা হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার সুরাপাত্রটা তুলিয়া একচুমুক পান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু বিচলিত-ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "O, the golden dream (হায়, সোনার স্বপ্ন) !"

বুঝিলাম মিস্টার রায় মনে মনে সমস্ত জীবনটা এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া যাইতেছেন—অত স্বপ্ন দিয়া রচা জীবন ! অথচ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া রচা, বিশেষ করিয়া সে-ই জীবনটা দুর্বহ করিয়া তুলিল। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হইবে ? পাত্রের সুরাটুকু নিঃশেষ করিয়া আরও একটু ঢালিয়া রাখিলেন, চিন্তা-শক্তিকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ;—কিংবা দুশ্চিন্তাকে ডুবাইবার প্রয়াস এটা ?

আমি বলিলাম, "একটা ব্যাপার অপর্ণা দেবীর জীবনে বড় অপকার করছে, আপনাকে কয়েকবার বলব মনে করেছি, এই সময়টা সেটা আবার খুব বেশি হানি-কারক হ'য়ে উঠেছে…"

মিস্টার রায় স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "You mean her exclusiveness (ওর এই কুনোবৃত্তির কথা বলছ) ? If I have tried once, I have tried a hundred times. She is always her old obdurate self (আমি অশেষ চেষ্টা করেছি ; সেই পুরানো জিদ ওর)।"

বলিলাম, "বলেন তো আমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ওঁর প্রাণ বোধ হয় একটা পরিবর্তন চাইছে এই আঘাতটা পাওয়ার পর থেকে,—এক কথাতেই উনি যেমন ঘরটা বদলাতে রাজি হলেন। আমার মনে হয় ওঁর দিনকতক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকা দরকার—দার্জিলিং, শিলং, পুরী—একটা চেঞ্জ্ অব সীন্ বিশেষ দরকার। যদি খুব রাজি নাও থাকেন, একবার গিয়ে পড়লে নিশ্চয় ভাল লাগবে। উনি এই খানটায় নিজের মনকে বুঝতে পারছেন না।"

মিস্টার রায় অর্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা শুনিতেছিলেন, ভিতরে ভিতরে ওঁর

একটা চিন্তাধারা চলিতেছিল। বলিলেন, "দেখ বলে···By the bye, Sailen, I also have been maturing a plan all the time. It is a lovely plan, only somewhat of a fraud (ইতিমধ্যে আমিও বরাবর একটা ছক পাকা ক'রে আনছি। ছকটা চমৎকার; তবে খানিকটা প্রবঞ্চনা আছে তার মধ্যে)॥"

আমি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহার পানে চাহিলাম। মিস্টার রায় বলিলেন, "তুমিও তার মধ্যে আছ, rather you are the hero of the piece (বরং তোমারই প্রধান ভূমিকা)।"

কৌতূহলটা আরও উদ্রিক্ত করিয়া মিস্টার রায় আবার খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমাদের প্রোফেসার মিস্টার সরকার আমার একজন বন্ধু, শৈলেন। তাঁর কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনতে পাই, he has high hopes about you (তিনি তোমার সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন)। তোমার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার নিয়ে আমাদের কিছু কিছু আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। তোমায় বোধ হয় এর হিন্ট্ দিয়েছি। আমার ইচ্ছে তুমি এম্-এ-টা দিয়ে ইংলণ্ডে চলে যাও, যদিও এম-এ দেওয়াটা আমি অত প্রয়োজন দেখি না—sheer waste of time (নিছক সময় নষ্ট)। সেখানে গিয়ে তুমি গ্রেজ্ ইন বা ইনার টেম্পলে ঢোক, আমি ঢুকেছিলাম ইনার টেম্পলে। এ পর্যন্ত আগেকার প্ল্যান ছিল, সম্প্রতি—মানে আজ এই মাত্র একটু বাড়ান গেল।"

মিস্টার রায় পাত্রে একটি চুমুক দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রিন্‌সিপ্‌ল্ কি? To remain scrupulously honest and clean (একেবারে সাধু আর নিদাগ হ'য়ে থাকা), না, এটা বিশ্বাস কর যে, জীবনে মিথ্যা প্রবঞ্চনারও একটা ন্যায্য স্থান আছে?"

বলিলাম, "আলো-ছায়ার জগৎ—এ তো নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।"

"বেশ, অপর্ণাকে বাঁচাতে হ'লে ঐ ছায়ার সাহায্য একটু নিতে হবে। অবশ্য আশা করা যাক নাও হ'তে পারে, তবে মনে হয়, we ought to be prepared for the worst (খারাপটুকুর জন্যেই তোয়ের থাকা ভাল)।—ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই, তুমি গিয়ে একটু ভাল করে নিতীশের সন্ধান নেবে। এ পর্যন্ত কেউ আপন জেনে এটা করেনি। খুঁজে বের করতে পার, ভালই, আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়ে, বিশেষ ক'রে তার মায়ের অবস্থার কথা বলে তার মতিগতি একটু ফেরাতে পার, আরও ভাল, না পার—ঐ যে বললে ছায়ার কথা, প্রবঞ্চনার কথা তারই—আশ্রয় নিতে হবে। You shall have to pretend—he has been found out, he has been re-claimed and write (তোমাকে মিথ্যে ক'রে লিখতে হবে যে দেখা পেয়েছ, সে শুধরে গেছে)।"

শোনার সঙ্গে বুকটা ছাঁত করিয়া উঠিল। অপর্ণা দেবীর সেদিনের সেই ক্ষুণ্ণ-বংসের কথা মনে পড়িয়া গেল! কলিকাতার গয়লাদের নীচ ফন্দি—ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন অপর্ণা দেবী—বলিতেছেন—"উঃ কি ক'রে পারলাম বল তো শৈলেন!"

কিন্তু এই জীবন, আরোগ্যের জন্য বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা এখানে,—সব সময়েই অমৃতের নয়। পাছে মিস্টার রায় আমার কুণ্ঠা ধরিয়া ফেলেন এই জন্য তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া বলিলাম, "প্ল্যানটা ভালই, আশা করি ভাল ক'রে চেষ্টা করলে ভগবান সহায়ও হ'তে পারেন! কিন্তু ধরুন যদি মিথ্যাই রচনা করতে হয় তো শেষকালে—"

মিস্টার রায়ের মুখটা হঠাৎ রূঢ় হইয়া উঠিল। আমার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইলেন, "তা হ'লে শেষকালে অপর্ণাকে বলতে হবে—The boy is dead, the rascal! We shall have to risk this and see what happens. The poor girl shall not be killed by inches like this (তা হ'লে বলতে হবে হতভাগা ছেলেটা মরেছে। অপর্ণাকে এ চরম আঘাতটা দিয়ে একবার দেখতেই হবে কি ফল হয়। এভাবে তুষানলে দগ্ধ হয়ে মরতে দেওয়া হবে না ওকে)।"

পেগে ধীরে আর একটা চুমুক দিয়া মিস্টার রায় শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যাও শৈলেন, রাত হ'য়ে গেছে, Good Night!"

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা কয়েকজন বাগানের লনে বসিয়া আছি। আজকাল সহানুভূতি দর্শাইতে এই সময়টা রোজই কয়েকজন করিয়া আসে, আজ এ, কাল ও,—এই রকম। অবশ্য নিশীথ বাঁধা আগন্তুক। আজ ছিল নীরেশ, শোভন, আলোক আর সরমা। সরমা আসিলে অপর্ণা দেবীর কাছেই বেশি থাকে, আজ মিস্টার রায় তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সরমা আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিল। রাজু চা দিয়া গেল।

প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত অপর্ণা দেবীর কথাতেই আসিয়া পড়িল।—মনের কথা বাদ দিলেও, বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে তুটানীর মৃত্যুর পর ওঁর শরীর হঠাৎ খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।—লক্ষণটা ভাল নয়। নীরেশ বলিল, "মনটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমার মনে হয় চিকিৎসাটা ওঁর মনের দিক থেকে হওয়া উচিত।" আমিও আমার মতটা বলিলাম—অর্থাৎ স্থান পরিবর্ত্তনের কথা। মনের দিক থেকে যাঁহারা চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলন করিতেছেন তাঁহারা এই চেঞ্জ অব্ সীন্ অর্থাৎ আবেষ্টনীর পরিবর্ত্তনের উপর খুব জোর দিতেছেন। বলিলাম—association (সাহচর্য) জিনিসটার প্রভাব আমাদের প্রতিদিনের জীবনের উপর খুব বেশি। উহারা বলিতেছেন মানসিক উদ্বেলতা যে-ব্যাধির মূল তাহার সব চেয়ে ভাল চিকিৎসা:

পুরাতন, হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন স্থানে নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি।

আলোচনায় সবাই যোগ দিল অল্পবিস্তর; দিল না শুধু সরমা আর নিশীথ। সরমা চিরদিনই কম কথা কয়, কয়েকদিন থেকে যেন আরও বেশি করিয়া দগ্ধ হইতেছে বলিয়া আরও স্বল্পবাক। নিশীথ ঠিক বিপরীত, আজ কিন্তু যেন মুখে ছিপি আঁটিয়া গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আলোচনা আগাগোড়া শুনিয়া গেল,—যেন মনের কোথায় পাতা খুলিয়া প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছে! খুব সতর্ক, যেন একটিও বাদ না পড়িতে পায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মিস্টার রায় অপর্ণা দেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। উভয়েই আসিয়া আমাদের সহিত একটু গল্পগুজব করিলেন। মিস্টার রায় বেশ প্রফুল্ল, যেন একটা প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এবং কতকটা সফলও হইয়াছেন। রাজু ডিশ, প্লেট সরাইয়া টেবিলটা পরিষ্কার করিতেছিল, মিস্টার রায় একটা বিদ্রূপও করিলেন, "রাজু, লাটসাহেবের বাড়ির লেটেস্ট নিউজ্‌টা এদের শুনিয়ে দিয়েছিস?"

সকলে হাসিয়া উঠিতে রাজু বাসন কয়টা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

অপর্ণা দেবী উপরে চলিয়া গেলেন।

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না—কি জানি পৃথিবীতে সুযোগ তো প্রতি মুহূর্তেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে! মিস্টার রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "ক'দিন থেকে ভয়ানক একটা দরকারী কথা ভাবছি—আপনার যদি কাজ না থাকে তো'…'

"কি, বল, এখানে বলা চলবে?"

নিশীথ একটু যেন কিন্তু হইয়া চকিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল, বলিল, "হ্যাঁ, তা…কথাটা হচ্ছে ক'দিন মিসেস্ রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কয়েকজন বড় বড় সাইকলজিস্ট্‌ এ সম্বন্ধে কি বলছেন তাই মনে পড়ে গেল। তাঁদের লেটেস্ট থিয়োরি হচ্ছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসোসিয়েশনের প্রভাব খুব বেশি, সেই জন্যে মানসিক উদ্বেলতা যার মূল সেরকম অসুখের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা এই যে, পুরনো হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে…বিচ্ছিন্ন ক'রে… মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে…"

সবাই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। নীরেশ নিশীথের নামই দিয়াছে গ্রীক-দেবতা Echo অর্থাৎ প্রতিধ্বনি; আজ কিন্তু চরম হইল। নীরেশ গম্ভীরভাবে যোগাইয়া দিল, "আপনি বোধ হয় বলতে চান—নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা…"

একবার আমার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া লইল।

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই নিশীথ বলিল, "Just it (ঠিক তাই) নূতন স্বস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা। যেদিন থেকে কথাটা আমার ষ্ট্রাইক করেছে, সেইদিন থেকেই আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, মিস্টার রায়; এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা—অবশ্য অনুমতি না দিলে ছাড়ানও নেই···রাঁচিতে আমাদের একটা বাড়ি আছে, the best place in Ranchi (রাঁচির মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা), চারিদিক খোলা, কিছু দূরে মোরাবাদী পাহাড়, simply superb (অতি চমৎকার)। আমি আপনার অনুমতি পাবার আগেই বাড়ির চুনটুন ফিরিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রাখতে লিখে দিয়েছি···মানে ওঁর একটা change of scene নেহাতই দরকার—মানে—"

তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিবার উত্তেজনায় একটু হাঁপাইয়াও উঠিয়াছে।

মিস্টার রায় বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, নিশীথের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িতে বলিলেন, Many thanks for your gracious offer (তোমার উদার প্রস্তাবের জন্য বহু ধন্যবাদ), নিশীথ। শৈলেনও কাল রাত্তিরে আমায় এই কথা বলছিল অর্থাৎ এই change of scene-এর কথা। তা মিসেস্ রায়কে রাজি করাতে পারি, আর ডাক্তাররা যদি অন্য জায়গায় যেতে না বলে তো তোমার কথাই হবে; and thanks for that (আর তার জন্যে ধন্যবাদ)!"

৪

নিশীথ না উপকার করিয়া ছাড়িল না, একেবারে অপর্ণা দেবী পর্যন্ত ধর্না দিল, এবং রাজি করাইল। যে-ভাবেই হোক্ একটা খুব ভাল কাজ হইল। আমার কলেজ আছে, যাওয়া সম্ভব নয়; ঠিক হইল সঙ্গে যাইবে মীরা, তরু, বিলাস, রাজু বেয়ারা, ড্রাইভার; এখানে অস্থায়ীভাবে একজন ড্রাইভার রাখা হইবে। মিস্টার রায় রাখিয়া আসিবেন, তাহার পর ছুটি-ছাটা হইলে মিস্টার রায় বা আমি দেখিয়া আসিব।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, বালিকা সুলভ উৎফুল্লতার মাঝে মীরা যেন একটু আবার ম্রিয়মাণও হইয়া পড়িতেছে। যাইবার আগের দিনের কথা। আমরা ভ্রমণে বাহির হইব, মীরা নামিয়া আসিয়া বলিল, "তরু তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে?"

তরু উল্লসিত হইয়া বলিল, "এস না দিদি, তুমি তো অনেক দিন আমাদের সঙ্গে যাওনি-ও, আজকাল নিশীথ-দা।"

মীরা রাগিয়া বলিল, "তাহ'লে যাও।"

তরু বলিল, "না এস, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি।"

মীরা আসিয়া বসিল। তরু রহিল আমাদের মাঝখানে। গেট দিয়া বাহির

হইতে হইতে ড্রাইভার ঘুরিয়া আমায় প্রশ্ন করিল, "কোন্ দিকে যাব ?"

আমি মীরার দিকে চাহিয়া বলিলাম 'আজ ভেবেছিলাম ডায়মণ্ডহারবার রোড হ'য়ে যাব খানিকটা।"

মীরা গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তর করিল, "মন্দ কি ?"

ময়দান পারাইয়া খিদিরপুর পুল উৎরাইয়া একটুপরে আমাদের গাড়ি অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মীরা একেবারে নীরব ; খালটা পার হইয়া একবার শুধু ড্রাইভারকে গতিবেগটা আর একটু বাড়াইতে বলিল ; আর, একবার তরুকে বলিল, "দয়া ক'রে একটু চুপ করবে কি তরু ?"

তরুর রসনা মুক্ত প্রকৃতি আর অবাধ গতিবেগের মধ্যে প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে। এইটুকু ব্যতীত মীরা অখণ্ড মৌনতায় আর নরম, শান্ত, দৃষ্টিতে বরাবরই সামনের দিকে চাহিয়া আছে। মীরা 'আজ এ রকম কেন ?—মনে হইতেছে সে যেন একটি অচঞ্চল সরোবর, বুকে তাহার কিসের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে, সে চায় না সামান্য একটি শব্দের আঘাতেও এতটুকু বীচিভঙ্গ হয়, প্রতিবিম্ব এতটুকুও চঞ্চল হইয়া উঠে। আবিষ্ট মনে একটিমাত্র চিন্তাকে পরিপুষ্ট করিতে ছিলাম, সে মীরার হাত খানেক ব্যবধানের মধ্যে যে-বেহই থাকিত তাহারই মনে ঐ এক চিন্তাই উঠিত ;--ভাবিতেছিলাম মীরার ধ্যান-শান্তমনে এই যে প্রতিচ্ছবি তাহা শুধু কি এই মূক প্রকৃতিই মীরা এর মর্মস্থলে কাহাকেও বসাইয়া কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লয় নাই ? স্পষ্ট উত্তর কোথায় পাইব এ প্রশ্নের ? তবে মীরার কেশের, বসনের সুবাস যে সমস্তই মুক্ত বায়ুতে অপচয় হইয়া যাইতেছে না, নিশ্চয়ই একজনের মর্মকে যে ব্যাকুল করিতেছে, আবিষ্ট ধ্যানের মধ্যে মীরার এ চৈতন্যটা নিশ্চয় সজাগ ছিল—সব যুবতীরই থাকে—এবং এই সূত্রে আমি তাহার অন্তরের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগ অনুভব করিতেছিলাম।

বেহালা পার হইয়া আমরা বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার ধারে আর বাড়ি নাই, ছোট-বড় বাগান, ঘন পল্লবিত তরুলতায় পূর্ণ। প্রায় মাইল চারেক এই রকম গিয়া ফাঁকা মাঠ আসিয়া পড়িল। শুধু রাস্তাটুকু বাদ দিয়া যে সবুজের সমারোহ দুই দিকে আরম্ভ হইয়াছে সেটা শেষ হইয়াছে একেবারে দিক্‌রেখার নীলিমায় গিয়ে। মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে পল্লী, মেটে দেওয়ালের ওপর গোলপাতায়-ছাওয়া ধনুকাকৃতি চাল, ছোট ছোট পুকুর, বিচালির গাদা; এক-আধটা পাকা বাড়িও আছে—রং-করা চারিদিকের সবুজের গায়ে যেন ঝিকমিক করিতেছে। সবার উপর মাথা ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নারিকেলের গাছ, হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া অস্তমিত সূর্যের রশ্মি যেন সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লইতেছে।

ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "ফিরব এবার ? প্রায় বার-তের মাইল এসে পড়েছি।"

আমি মীরার পানে চাহিলাম। মীরা প্রশ্ন করিল, "কাজ আছে নাকি তেমন কিছু?"

উত্তর করিলাম, "কী আর কাজ ?"

ড্রাইভার আগাইয়া চলিল। মীরা প্রশ্ন করিল, "বরং একটু আস্তে ক'রে দাও।" মীরার দৃষ্টিটা আজ অদ্ভুত রকম নরম অথচ কি দিয়া যেন পূর্ণ। কয়েক দিন হইতে মনে হইতেছে মীরা দীর্ঘ বিদায়ের পূর্বে কিছু বলিয়া যাইতে চায়, অথবা যেন চায় আমি কিছু বলি,—এইটেই বেশি সম্ভব। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মীরা আজ কি আমায় একটা চরম সুযোগের সম্মুখীন করিয়া দিতেছে ? ও আজ সাজিয়াছে, সাদাসিধার উপর নিখুঁতভাবে নিজেকে মানাইয়া যেমন সাজিতে পারে ও। একটা অদ্ভুত মৃদু এসেন্স মাখিয়াছে যাহা ওর চারিদিকে একটা স্বপ্নের মোহ বিস্তার করিয়াছে। মীরার আসাতেও আজ একটা সুমিষ্ট লজ্জা ছিল ; আমায় প্রশ্ন নয়, তরুকে,—'তরু, তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে ?"

একটা বেশ বড় গ্রাম পার হইয়া গেলাম, নামটা উদয়পুর বা ঐ রকম একটা কিছু কলতা-কালীঘাট ছোট লাইনের একটা স্টেশন আছে। গ্রামটা পারাইয়া খানিকটা যাইতে রাস্তার ধারে একটা মাইলস্টোনের দিকে চাহিয়া তরু বলিল, "উঃ, সতের মাইল এসে গেছি !"

মীরা ড্রাইভারকে বলিল, "এবারে তাহ'লে ফের।"

আমায় প্রশ্ন করিল, "একটু নামবেন নাকি ?'

যাহা যাহা চাই সে-সব আপনিই হইয়া যাইতেছে, বলিলাম, "মন্দ হয় না, হাত-পা যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।"

অপূর্ব জায়গা ! সন্ধ্যা হইয়াছে ; কিন্তু মনে হইল সন্ধ্যার আবির্ভাব হয় নাই, আমরাই যেন মায়ারথে চড়িয়া সন্ধ্যায় নিজের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। মীরা একবার মুগ্ধবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আজকেও তরুকে পড়াবেন নাকি ?"

অবশ্য না পড়াইবার কোন হেতু নাই, কিন্তু উত্তর করিলাম "নাঃ, আজ আর···"

"তাহ'লে একটু বসা যাক না, কি বলেন ?"

আমরা রাস্তার ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়া বসিলাম, যেমন মোটরে বসিয়াছিলাম,—মাঝখানে তরু শুধু ; তিনজনের মধ্যে ব্যবধানটা আর একটু বেশি।

এক সময় অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে পূর্বচক্রবালরেখা ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠিল।

অল্পে অল্পে মীরা হইয়া উঠিল মুখর। তরুর মাথার উপর দিয়া সোজা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হয় শৈলেনবাবু যে, সন্ধ্যে আর চাঁদ বলে যে দুটো জিনিস আছে, কলকাতায় থেকে

সে-কথা আমি ভুলেই গিছলাম !”

মীরার মুখে উদীয়মান চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে ; তাহার উপর রহস্যময় আরও একটা কিসের দীপ্তি। মীরা কালো, এই চন্দ্রালোকিত ধূসর সন্ধ্যার সঙ্গে তাহার চমৎকার একটা মিল আছে ; আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হইয়া তাহার মুখের উপ সেকেণ্ড কয়েক পড়িয়া রহিল, তাহার পরই আত্মসংবরণ করিয়া আমি চক্ষু দুইটা সরাইয়া লইলাম, সামনে নিবদ্ধ করিয়া বলিলাম “বলেছেন ঠিক, সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে যে স্নিগ্ধশিখা প্রদীপের দরকার তা কলকাতায় নেই ; সন্ধ্যাকে দূর থেকে বিদেয় করবার জন্যেই সে যেন তার বিদ্যুৎ-আলোর চোখ রাঙিয়ে ওঠে··· ··আমিও যেন অনেক দিন পরে দুটো হারানো জিনিস ফিরে পেলাম···যেন···”

এক মুহূর্ত একটু থামিলাম, তারপর নিজের চিন্তাটাকে পূর্ণ মুক্তি না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম, “সব দিক দিয়ে মনে হচ্ছে বিধি হঠাৎ বড় অনুকূল হ'য়ে উঠেছেন আজ···”

অতি পরিচিত একটা সংগীতের একটা সমস্ত পংক্তি তুলিয়া বলিয়াছি, মীরা সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল ; একটা কিছু না বলিবার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই সামনের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, “কেন ?”

জীবনের এইগুলি অমূল্য মুহূর্ত ; কিন্তু মাঝখানে আছে তরু। আর, অনিশ্চিতের আশঙ্কাও তখন সম্পূর্ণভাবে যায় নাই, মাত্র একটি সুযোগে সব সময় যায়ও না। একটু অন্তরাল থাকুক, সবটা আর পরিষ্কার করিব না। আজ মীরা যে মন আনিয়াছে তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে ওটা আমার অন্তরের সংগীতের একটা কলি—“আজু বিহি মোরে অনুকুল ভেয়ল।” বাকিটা থাক না একটু অস্পষ্ট—আজকের সন্ধ্যার মত, এই নূতন জ্যোৎস্নার মত।

মীরার প্রশ্নে আমি একটু মুখ নীচু করিয়া রহিলাম—ও বুঝুক সত্যটা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছি ; তাই কুণ্ঠা, তাই বিলম্ব। একটু পরে তরুর মাথার উপর দিয়া ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, “বিধি অনুকূল এইজন্য বলছি যে, এত দিন বঞ্চিত থাকবার পর একেবারেই অমন চমৎকার সূর্যাস্ত দেখলাম, আবার এমন সুন্দর চন্দ্রোদয় দেখছি !”

মীরাও একটু মুখ নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর স্মিত হাস্যের সহিত একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “আপনি কবি···”

আমি বলিলাম “কবির যশ ততটা কবির প্রাপ্য নয় মীরা দেবী, যতটা প্রাপ্য সেই মানুষের বা অবস্থার যা তাকে কবি ক'রে তোলে।”

মীরা আর মুখ তুলিতে পারিল না। একটু সময় দিয়া আমিও কথাটা বদলাইয়া দিলাম, বলিলাম, আর বিশেষ ক'রে আজ তো কবি-যশে আমার মোটেই অধিকার নেই ; ভুললে চলবে কেন যে আজকের মূলকাব্য আপনার—আপনিই সন্ধ্যে আর চাঁদের কথা তুললেন, আমি যা বলেছি তা তারই ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলেছি মাত্র, আমায় হদ্দ আপনার কাব্যের টীকাকার বলতে পারেন।'

মীরা ঘাসের উপর পা দুইটা ছড়াইয়া দিল—। শরীরে একটা ছোট আন্দোলন দিয়া হাসিয়া বলিল, "নিন, কবি চুপ করলে, কে অমন টীকাকারের সঙ্গে কথায় এঁটে উঠবে বলুন ?"

এইটুকুর মধ্যে কী যে একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে—মীরাকে কত যেন ছেলে-মানুষের মত দেখাইতেছে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর স্বভাবের গাম্ভীর্যের জন্য যে মীরাকে বয়সের অনুপাতে একটু বড়ই দেখায়। ··চাঁদ আরও অনেকটা উপরে উঠিল, জ্যোৎস্না হইয়াছে আরও স্বচ্ছ।···খানিকটা দূরে মোটরটা দাঁড়াইয়া আছে, ড্রাইভার ফুরফুরে হাওয়ায় গা এলাইয়া সীটের উপর লম্বালম্বি শুইয়া পড়িয়াছে, পা দুইটা বাহির হইয়া আছে। তরু একটু আবিষ্ট, স্পষ্ট বুঝিতেছে না, কিন্তু বেশ উপভোগ করিতেছে আমাদের কথাগুলা,—কথা-বার্তার মধ্যে হাসি থাকিলে ও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া উপভোগ করে, গাম্ভীর্য আসিলেই শঙ্কিত হইয়া ওঠে। একবার হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "মেজগুরুমার বরকে দেখলাম দিদি, এত আমুদে লোক ?"

বাহ্যত কথাটা এতই অপ্রাসঙ্গিক যে আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "এর মধ্যে তোমার মেজগুরুমা আর মেজগুরুমশাই কোথাথেকে এলেন তরু ?"

তাহার পর তরুর উচ্ছ্বাসের উৎসটা কোথায় বোধ হয় সন্ধান পাইয়া একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং একটা ঘাসের শীশ তুলিয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল।

······কী চমৎকার একটা রজনী যে আসিয়াছিল জীবনে !···

যেন আরও ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছে মীরা। ওর সঙ্গে কথা কহিতে আর ভয়-ভরসার কথা মনেই আসে না ; ছেলেমানুষকে যেমন না বলিলে চলে না সেই ভাবে কতটা হুকুমের ভঙ্গিতেই বলিলাম, "যেখান-সেখান থেকে যা-তা তুলে নিয়ে দাঁতে দেবেন না ; ওতে···"

মীরা সঙ্গে সঙ্গে আমার পানে চোখের কোণ দিয়া লজ্জিত ভাবে চাহিল, তাহার পর অবাধ্য বালিকা যেমন ভাবে বলে কতকটা সেইভাবে ঈষৎ হাসিয়া এবং চিবুকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমি দোব ; আপনি তরুর টিউটর, তরুকে শাসাবেন।"—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবাধ্যতার একটা নমুনা দাখিল করিবার জন্যই যেন

হাতের খণ্ডিত শীষটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা বড় শীষ খুঁটিয়া দাঁতে দিল। তরু হাসিয়া একবার বোনের মুখের পানে চাহিয়া আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "দিদির মত কখনও অবাধ্য হয়ো না তরু।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সবাইকে গুরুজন বলে মনে করবে, আর…"

গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না, হাসিয়া মুখটা ওদিকে ফিরাইয়া লইল।

এ-সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল মীরা, যতটা পারিলাম সদ্ব্যবহার করিলাম। এর পরে বিধাতা সুযোগ সৃষ্টি করিলেন।—

কতকগুলি চাষাভুষা লোক আমাদের পিছনের মাঠ দিয়া আসিয়া রাস্তা পার হইয়া বোধ হয় সামনের কোন এক গ্রামে যাইতেছিল, রাস্তায় মোটর দেখিয়া কৌতু-হলবশে একটু ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া মোটরের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ লাগাইয়াছে।

তরু প্রশ্ন করিল, "কারা ওরা দিদি? কি অত জিজ্ঞেস করছে? মোটর দেখেনি কখনও?"

মীরা বলিল, "ওরা চাষা।"

তরু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "চাষা কখনও দেখিনি দিদি, যাব দেখতে?"

দু-জনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "মন্দ নয়, চাষারা মোটর দেখেনি, তুমি চাষা দেখনি—অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াল। যাও।"

তরুর কৌতুহল মিটাইতে অনেকক্ষণ লাগিল। জোৎস্না আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। হাওয়াটা আর একটু জোর হইয়া উঠিয়াছে, মীরার কানের দুল চঞ্চল হইয়াছে, বাঁকা সিঁথির রেখা চূর্ণ কুন্তলে এক-একবার অবলুপ্ত হইয়া আবার বেশি করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে,—একখানি মুক্ত অসির ঝলমলানি।…দু-জনেই সামনে চাহিয়া আছি, খুব বেশি কথা বলিবার সময় একেবারে হইয়া গেছি নীরব। দেখিতেছি চক্ষের সামনে বিশ্ব-প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—বাস্তব হইয়া পড়িতেছে যেন স্বপ্ন, আর জীবনের যাহা কিছু এতদিন ছিল স্বপ্ন হইয়া, এইবার যেন বাস্তব হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিবে…

ঘাসের উপর মীরার ডান হাতটা আলগাভাবে পড়িয়া আছে, আঙুল কয়টি হালকা মুঠির মধ্যে গুটাইয়া লইয়া ডাকিলাম, "মীরা…"

"কি বলছেন?"—বলিয়া মীরা স্বপ্নালু দৃষ্টি আমার পানে ফিরাইল।

কি বলি?—কি ভাবেই বা বলি?…মীরার হাতটা বুকের আরও কাছে টানিয়া কি একটা বলিব—এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না তরু ছুটিয়া বলিল, দিদি, ড্রাইভার, বলছে মেঘ উঠেছে দক্ষিণ দিকে।"

দেখি সত্যই মেঘ উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া আমরা মোটর আশ্রয় করিলাম।

বাসায় আসিয়া ঘরে ঢুকিতে রাজু বেয়ারা আসিয়া চেয়ার-টেবিলগুলা ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। যেন সহসা মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিল, "ব্লটিং প্যাডের নীচে একটা চিঠি রেখেছিলাম, পেয়েছেন মাস্টার-মশা?"

দিতে ভুলিয়া গিয়া সামলাইতেছি। আমি প্যাড দেখিবার পূর্বে নিজেই বাহির করিয়া দিল।

অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—একটা সুখবর আছে, সৌদামিনী বিধবা হইয়াছে।

৫

কবে সুদূর হিমালয়ের কোন এক অজ্ঞাত পল্লী হইতে এক পুত্রহারা জননী ব্যর্থ-সন্ধানের নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু আমার জীবনে এর প্রভাব আছে; অল্প নয়, বহুল পরিমাণে।

ভুটানী না আসিলে মীরার আপাতত রাঁচি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

মীরার রাঁচি যাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম আসুকই না একটু বিরহ, মীরা যে-স্মৃতিসম্পদ দিয়া যাইতেছে তাহাকে পূর্ণ ভাবে পাওয়ার জন্য অবসর চাই না?

কিন্তু বিচ্ছেদ কি শুধু স্মৃতিকেই পুষ্ট করে?

কলিকাতায় এই কয়টা মাসে অনুকুল প্রতিকূল নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা বিশেষ অবস্থা এবং একটা পরিচিত সামাজিক গণ্ডির মধ্যে আমি আর মীরা যেন পরস্পরের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিলাম। রাঁচিতে মীরা নিজেকে নিজেদের অভিজাত সমাজে আবার নূতনভাবে দেখিবার সুযোগ পাইল।

আবার ভাবি আমাদের উভয়ের জীবনে বোধ হয় এইটুকুর প্রয়োজন ছিল। বিনা প্রয়োজনে কোন্ ঘটনাই বা ঘটে জীবনে?...

কিন্তু থাক্ একথা এখন, যথাস্থানেই আলোচনা হইবে।

মিস্টার রায় সকলকে রাঁচিতে রাখিয়া আসিবার দুই দিন পরে তরুর চিঠি পাই-লাম। মীরার চিঠির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকিতে হইল। তাহার পর আসিল একদিন চিঠি।

মীরা উচ্ছ্বসিত হইয়া রাঁচির কথা লিখিয়াছে। ওদের বাসাটা রাঁচি হাজারিবাগ রোডে; খুব চমৎকার ফাঁকা জায়গা। সামনেই মোরাবাদী পাহাড়। ওরা গিয়াছিল

একদিন বেড়াইতে এর মধ্যে। পাহাড়ের উপর মহাপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। আরও উঠিয়া গেলে, পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে চারিদিকে খোলা একটি চমৎকার মন্দির, এইখানে বসিয়া তিনি উপাসনা করিতেন। এইখান হইতে নীচের চারিদিকের দৃশ্য যে কী চমৎকার বলিয়া বুঝানো যায় না। কৃষ্ণনগরের গড়া, বাগান দিয়া ঘেরা মডেল পুতুল-বাড়ির মত দূরে কাছে বাড়ি সব—বাগানে পুতুলের মত মালী কাজ করিতেছে—কোন বাড়ির গেটের ভিতর খেলনার মোটরের মত একটি মোটর প্রবেশ করিল—পুতুলের মত কয়েকজন ছোট ছোট মানুষ নামিয়া ভিতরে গেল। সামনে চাহিলে অনেক দূরে দেখা যায় রাঁচি শহর, মাঝখানে রাঁচি হিল। তাহার চূড়ায় মন্দির। আরও অনেক দূরে কাঁকের নবনির্মিত পল্লী। অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ আর চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ উঁচুনীচু পল্লী দেখিয়া মনটা আপনা-আপনিই যেন কিসে ভরাট হইয়া আসে। মীরার অসুবিধা হইয়াছে যে সে কবি নয়, তাহারও উপর অসুবিধা যে একজন কবির কাছে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম ছুটিতেই যেন যাই আমি একবার, যদি মনে করি পড়িবার ক্ষতি হইবে তো সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও।

সবচেয়ে ভাল খবর, মা ভাল আছেন, এত প্রফুল্ল তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মীরার মনে পড়ে না। ধন্যবাদটুকু আমার প্রাপ্য। নিশীথবাবুর বাড়িটা চমৎকার, কয়েকদিন হইল মায়ের জবানীতে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে পত্র দেওয়া হইয়াছে।

চিঠিতে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিক দিয়াও যায় নাই মীরা, যদি যাইত তো শ্রদ্ধা হারাইত আমার।

অনিলের পত্রের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল, কেন-না মীরার চিঠির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লিখলাম :

"অনিল,

সৌদামিনীর বৈধব্যের খবরটা কি আগাগোড়াই সুখবর? ভগবান সুস্থভাবে চলাফেরা করবার জন্যে দুটি ক'রে পা দিয়েছেন; কিন্তু এমন হতভাগাও তো আছে যাদের এই কাজটুকুর জন্যে একজোড়া কাঠের ক্রাচই সম্বল? এখন এই ক্রাচ-বেচারির আসল পা নয় বলে সে দুটির ওপর চটলে চলবে কেন?... ...সৌদামিনীর পঁচাত্তর বৎসরের স্বামী বা তোর দিক দিয়া বলতে গেলে স্বামী পদবাচ্য জীবটি তার ঠিক স্বামী না হ'তে পারুক, একটা মস্ত অবলম্বন ছিল যার জোরে সদু দাঁড়িয়েছিল, ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়েনি। এইবার ওর সেই দুর্দিন এল।"

সৌদামিনীর বৈধব্য সম্বন্ধে এইটুকু অভিমত দিয়া মীরার কথাও একটু লিখিয়া দিলাম, উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যে অনিল স্কুলের মাঠে সদুর সম্বন্ধে যাহা

উচ্ছ্বাসের মুখে বলিয়াছিল, সেদিক দিয়া আর কোন আশাই নাই। লিখিলাম—"এদিককার খবর এই যে, মীরাবা গেছে রাঁচি, বোধ হয় মাসখানেক থাকবে। যাবার আগের দিন ও আমায় এমন একটা জিনিস দিয়া গেল যা রক্ষা করতে হ'লে আমার আর সব কথাই ভুলতে হবে। এই জিনিসটি পাওয়ার জন্যেই আমার এই এত দিনের তপস্যা, তোকে আমি সে কথা বলেও ছিলাম। এ-ভোলার মধ্যে কর্তব্যহানি এসে পড়বে বোধ হয়, কিন্তু সে অপরাধ আমি নিরুপায় হ'য়েই করলাম এইটে জেনে আমায় মার্জনা করিস।"

কয়েকবার পড়িয়া গেলাম, তাহার পর অন্য একটা কাগজে শুধু উপরের কথাগুলি অর্থাৎ সতুর বৈধব্য সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটুকু লিখিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দিলাম। দেখিলাম ওইটুকুতেই আমার উদ্দেশ্যটা বেশ স্পষ্ট হইয়া আছে, বেশি বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই।

একটা কথা আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহা এই যে, মীরা আসিয়াছে পর্যন্ত অনিলের সঙ্গে আমি লুকোচুরি করিতেছি, কথা বলিতেছি মাপিয়া জুখিয়া কাটছাট করিয়া ; না লুকাইবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথায় কি যেন আপনিই আটকাইয়া যাইতেছে। ভাবি কেন হয় এমন ? মীরাকে কাছে আনিতে, অনিল কি দূরে সরিয়া যাইতেছে ? প্রশ্নটা অন্যদিক দিয়া করিলে এই রকম দাঁড়ায়—জীবনে প্রিয়তম কি শুধু একজনই হয় ?

একটা দিন বাদ দিয়াই অনিলের উত্তর আসিল। লিখিয়াছে—"সত্যটাকে তুই পুরোপুরি দেখতে পাস্‌নি, দেখেছিস্ তার অর্ধেকটা। আসল কথা আমাদের দেশে মাত্র পুরুষ মানুষেরই পা আছে, মেয়েদের নেই। এই কথাটা শাস্ত্র নানা ভাবে যুগ যুগ ধরে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। পা নেই বলে—কিংবা আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, পা যে নেই এই সিদ্ধান্তটা নানা উপায়ে সাব্যস্ত ক'রে মেয়েদের জন্যে আগাগোড়া পরিবর্তনশীল ক্রাচের ব্যবস্থা করেছে—যেমন বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র। এর মধ্যে আগের আর শেষের দুটি বিধাতার হাতে, মাঝেরটি সমাজ রেখেছে নিজের আয়ত্তের মধ্যে। ব্যবস্থাটার দোষ-গুণ নিয়ে আমি আলোচনা করছি না এখানে। আমার কথা হচ্ছে—যদি সমাজই এ-ভার নিয়ে থাকে তো মেয়েদের এ-বিষয়ে স্বাধীনতা যদি না দেয় তো, এই যে একটা সুস্থ সবল "রোগী"র জন্যে ঘুণ-ধরা ক্রাচের ব্যবস্থা করা হ'ল এ প্রবঞ্চনার কে জবাবদিহি করবে ? সতুর ক্ষেত্রে জবাবদিহি কেউ চাইবেও না, কেউ দেবেও না, বরং সমাজের যদি অনার্স লিস্ট বের করবার ক্ষমতা থাকত তো ভাগবত হালদার অচিরেই নাইট্ উপাধিতে ভূষিত হ'ত, কেন-না সে যা শিভ্যালরির কাজ করেছে তা মধ্যযুগের ইউরোপীয়ান নাইটের দ্বারাই

সম্ভব ছিল। আমি জানি এসব কথা, তাই সাজা-পুরস্কারের কথা না তুলে, নবীনের কাছে আপীল করেছিলাম যে, (আমি ভেবেছিলাম) সে যৌবনের স্পর্ধিত-বিক্রমে এই অন্যায়ের একটা সমাধান করতে পারবে। সদু যদি শুধুই বিধবা হ'ত তো আমি তাও করতাম না, করলাম এই জন্যে যে ওর বৈধব্য-যন্ত্রণার শেষে আছে ভাগবত প্রাপ্তি।

"আজকাল আমাদের হাসপাতালের চার্জে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে। সে রোগীদের ভাল করবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছে যে, রোগীদের একটা আতঙ্ক এসে গেছে এবং সুস্থ মানুষেরা প্রাণপাত ক'রে চেষ্টা করছে যাতে রোগী হ'য়ে না পড়তে হয়। ডাক্তার বাড়ি বাড়ি ঘুরে দু-বেলা কুশল-সংবাদ নিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং ঘুণাক্ষরেও কোথাও রোগের আঁচ পেলেই হয় আউটডোর নয় ইনডোর পেশেন্ট ক'রে ভর্তি ক'রে ফেলছে। লোকেরা খাতিরে পড়ে কিছু বলতে পারছে না—একটা অতবড় ডাক্তার-গভর্ণমেণ্ট হাসপাতালের চার্জে রয়েছে—সে এসে যদি দু-বেলা তোমার জন্যে তোমার চেয়েও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে তো কি রকম একটা বাধ্যবাধকতায় পড়ে যেতে হয় ভেবে দেখ না। মনে হয় না যে অসুখে না পড়ে কত বড় একটা অন্যায় করছি? এর ওপর বিপদ হয়েছে লোকটা রোগ সারাতে পারে না এবং তার চেয়েও বিপদের কথা এই যে, সারাতে না পারা পর্যন্ত ছাড়ে না। আউটডোর পেশেণ্টরা দেখতে দেখতে ইনডোরের বিছানা ভর্তি ক'রে ফেলেছে এবং ইনডোর পেশেণ্টদের মনের ভাবটা এই যে, যদি যমের দোর দিয়েও তারা বেরিয়ে পড়তে পারে তো বাঁচে।··· পরশু একটা ইনডোর পেশেণ্ট রাত দুপুরে জানালা টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তার ধারণা ছিল তার কোন রোগ নেই অথচ তাকে নাহক আটকে রাখা হয়েছে। এখন তার সে ভুল ধারণাটা গেছে, পা ভেঙ্গে কায়েমী ভাবে পড়ে আছে হাসপাতালে। একটা এমন ত্রাহি-ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে যার তুলনা শুধু কলকাতায় দাঙ্গার সঙ্গে হতে পারে। যার যেখানে আত্মীয়-স্বজন আছে সেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে বাড়ি খালি ক'রে ফেলছে।

"অবশ্য ভাগবত হালদারের সঙ্গে পরেশ ডাক্তারের তুলনা হ'তে পারে না, তবু উপকারীর হাত থেকে মুক্তি-সমস্যার কথায় পরেশ ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল। মুক্তি সম্বন্ধে আমি তোর কথা ভেবেছিলাম অনেক কারণে প্রথমত, এখানে 'রোগী' আমাদের সৌদামিনী, আমাদের ছেলেবেলাকার 'সদী'

"দ্বিতীয়ত, সৌদামিনী দুর্লভ স্ত্রীরত্ন, গলায় হার ক'রে পরবার জিনিস। ওর মত মুক্ত-প্রকৃতির স্ত্রীলোক ক'টা পাওয়া যায় সংসারে? ওর অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেও অমন নিষ্কলুষ শুদ্ধি। আর জানিস্?—তোকে কথাটা বলেছি কিনা আমার মনে পড়ছে না—সদু শিক্ষিতা। 'শিশুশিক্ষা' আর 'ধারাপাত' পড়া নয়—

বাঙালী শিক্ষিত মেয়ে বলতে সাধারণত যা অর্থ দাঁড়ায়; সদু সংস্কৃত খুব ভাল জানে। ভাগবত সৌখীন মানুষ, সংস্কৃত কাব্যে সদুকে বেশ ভাল রকম তালিম দিয়ে রেখেছে, এদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যেও। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় এই যে, যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাতে-কলমে কৃষ্ণপ্রেম চর্চা করবে, তাতে কোন গ্রাম্যতা দোষ না এসে পড়ে। তারপর জ্ঞানের একটা স্পৃহা জাগায় চুরি ক'রে ইংরাজীও শিখেছে ও, অল্প অল্প। তুই লক্ষ্য করেছিস্ কি না জানি না, সদু যখন কথা বলে মাঝে মাঝে শুদ্ধ শব্দ এসে পড়ে, যদিও ওর বরাবর চেষ্টা থাকে ওর শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা কেউ টের না পায়। এ হেন অমূল্য রত্ন কোন্ ধুলায় গড়াগড়ি দেবে?

"ওকে গ্রহণ করতে বলার—আরও স্পষ্ট ক'রে বলি, বিয়ে করতে বলার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল—সমাজকে একটা আঘাত দেওয়া, এমন একটা আঘাত দেওয়া যাতে সমাজকে জেগে উঠে বিস্মিত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অপলক ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে হবে। আঘাত অন্যভাবে দেওয়া যেত, সদুকে রেফিউজে ভর্তি ক'রে দিয়ে বা হিন্দু মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সহজেই একটা বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারা যেত; ভাগবত হ'ত নিরাশ, সমাজ একটু চোখ রগড়াত, কিন্তু তাতে আমার আশ মিটত না! আমি চাই আঘাত হবে রূঢ় এবং তা করতে হ'লে এমন একজন এসে সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এই সদ্য-বিধবাকে গ্রহণ করবে যে বংশে, মর্যাদায়, শীলে, শালীনতায়, শিক্ষায় সমাজের একজন আদর্শ যুবা যার এই দুঃসাহসিকতা দেখে সমাজ যেমন স্তম্ভিত হবে, তেমনি অপর দিকে যাকে হারাবার ভয়ে সমাজের বুক উঠবে কেঁপে। আমি এই জন্যে বিশেষ ক'রে বেছেছিলাম তোকেই। সদুর প্রতি অন্যায় হয়েছিল—সদুর মত মেয়ের প্রতি। শুধু তো সদুর ক্ষতি-পূরণ করলে চলবে না, যে-সমাজ এই অন্যায় হ'তে দিয়েছিল, তার প্রতিও যে আমাদের একটা আক্রোশ আছে। শুধু ক্ষতিপূরণে হবে না, তার ওপর চাই আক্রোশের আঘাত। তা না হ'লে সৌদামিনীর মত অত্যাচারিত হ'য়ে আজ পর্যন্ত যত নারী মরেছে সদুরও জীবনের যে দেবদুর্লভ অংশ এই অর্ধযুগ ধরে তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে ছাই হ'য়ে গেছে, তাদের তর্পণ হবে না। এই যুগের নারী প্রতিনিধি হিসাবে সদু তার এই অর্থহীন সদ্য-বৈধব্যকে অস্বীকার ক'রে নিতান্ত শুদ্ধ শুচি কুমারীর মতই এসে দাঁড়াবে আর পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুই তার গলায় মালা দিয়ে তুলে নিবি। সমাজের বিস্মিত নীরব প্রশ্নের এই হবে উত্তর—অর্থাৎ এ-অত্যাচার এ-যুগের আমরা সহ্য করব না।

"আমার ছিল এই উদ্দেশ্য; আশা ছিল সৌদামিনীর মধ্যে দিয়ে জীবনে যে দারুণ আঘাত পেলাম তার একটা সুফল ফলবে, কেন না শক্ত রকম সব আঘাতেরই একটা সুফল আছে শোনা যায়।...নিরাশ হলাম, আমারই ভুল হয়েছিল! কবি,

সে এতদিন প্রণয়ের স্বপ্ন নিয়ে ছিল ; এখন যখন সেই স্বপ্ন হ'তে চলল বাস্তব, তার কাছে এসব বাজে কথা তোলা উপদ্রব নয় কি ? আমাদের আপিসের বীরু গাঙ্গুলীর কথাটা আমার মনে পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। বীরু ছিল আন্‌পেড্ অ্যাপ্রেন্টিস ! যেদিন তার মাইনে হবার খবর বেরুল সেদিন লড়াইয়ে বাঙালী পল্টন হ'য়ে ভর্তি হবার ফরম্ আপিসে এল। বড়বাবু একটু উঠে-পড়ে লাগলেন। বীরু হাতজোর ক'রে বললে, 'স্যার কাল পর্যন্ত বললে যে-কোন বীরত্বের কাজ করতে বীরু পেছপা ছিল না, দু-বচ্ছর এই পনরটি টাকার স্বপ্ন দেখে যেই ফলল স্বপ্নটা আর সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ে চল ?'

'কাল পর্যন্ত বললে হ'ত একথা অবশ্য তুই বলতে পারবি না, কেন-না সদুর কথা তোকে অনেক দিনই বলে রেখেছি। তবে তোতে আর বীরুতে তফাত আছে নিশ্চয়, সে তবুও কেরানী, তুই একেবারে কবি।

'অম্বুরী বলেছে—এবার যদি ঠাকুরপো আসতে মাসখানেকের বেশি দেরী করেন তো সদলবলে গিয়ে সবাই উঠব, আর তো ঠিকানা লুকুন নেই।' মা একরকম ভালই আছেন। সাদু তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে খুব বড়াই ক'রে বেড়ায়, বলে—'শৈল টাকা খুব বা-আ-ভুর, এট্টো বড়ো বন্দুক আছে।'...কত যে বাহাদুর আর বলিনি। আমার ছেলে যদি কখনও গ্রামের ইতিহাসের এ-অংশটা জানতে পারে আর আমার দৃষ্টি পায় তো নিজেই বিচার করতে পারবে।"

অত্যন্ত চটিয়াছে অনিল। দুঃখ হল। কিন্তু আমি যে কত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি তাহা কি কোনদিন ও বুঝিবে না ? ওর তো বোঝা উচিত, কেন-না ও-ও তো একদিন ভালবাসিয়াছিল। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করি—আজ পর্যন্ত সৌদামিনীর দুঃখ ওর প্রাণে অত বাজে কেন, তাহা হইলে কি ও আমার অন্তরের বেদনা বুঝিতে পারিবে না ? ওর এটা কি শুধুই কর্তব্যের তাগিদ ? শুধুই সমাজ-সংস্কার ? শুধুই সদুর মত নারীরত্নের ক্ষতিপূরণ ?

৬

দেখিতেছি বিরহ জিনিসটা যতই কবিত্বময় বলিয়া মনে করিয়াছিলাম আসলে ততটা নয়, যদি বলি তাহার অর্ধেকও নয় তো নিতান্ত মিথ্যা বলা হয় না। নেহাৎ অবহমান কাল হইতে নানা লোক বলিয়া আসিয়াছে তাই, নতুবা এক-বার মনে হয় ইহাতে কবিত্বের একেবারেই কিছু নাই।

রীতিমত কষ্ট হইতেছে। কলেজে যখন থাকি এক রকম চলিয়া যায়, বাকি সর্বক্ষণই মনটা হু-হু করিতেছে। এ-ধরনের অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও ছিল না।

মীরার কথা চিন্তা করিতে লাগে ভাল, কিন্তু এই স্মৃতি-মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া দুই-তিনটা মাস কাটাতেই হইবে ভাবিলেও আতঙ্ক হয়। কবিতা পর্যন্ত একটাও লিখিতে পারি নাই, এবং এক সময় এই বিরহ লইয়াই কি করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া পদ্য লিখিয়াছি ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এই জিনিসটাই আবার সবচেয়ে বেশি কথা যোগাইত।······একটা মজার কথা মনে হইত' এখন দেখিতেছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যে যখন লড়ে, বসিয়া বড় বড় মহাকাব্য বেশ সৃষ্টি করা যায়। নিজে লড়িয়া সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেলে মারিয়া রিমার্কের "অল্ কোয়াএট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট"-এর ট্রাজেডি ছাড়া আর কিছুই বাহির হইবে না।

অবশ্য রাঁচির খবর খুবই পাই। রাত্রে মিস্টার রায়ের নিকট প্রায়ই খবর পাওয়া যায়। তাহা ভিন্ন তরুর এ বিষয়ে একেবারেই গাফিলতি নাই। দু-তিন দিন অন্তর চিঠি পাওয়া যায়ই—কেমন জায়গা, কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, নূতন কাহাদের সঙ্গে আলাপ হইল, মায়ের কথা, দিদির কথা, কিছুই বাদ যায় না।···মন কিন্তু পড়িয়া থাকে অপর একখানি চিঠির জন্য। কলিকাতা ছাড়িবার ঠিক ছয় দিন পরে পাইয়াছিলাম, এখন নিত্যই ডাক-পিয়নের পথ চাহিয়া থাকি, নিত্যই নিরাশ হই।

একদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া আছি। বিকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল বলিয়া বাহির হই নাই। কান্নার শেষ অশ্রুর দাগের মত তখনও আকাশে হেথায় হেথায় মেঘের ছোপ লাগিয়া আছে। ইমামুল আসিল। আমার পাশের সাটটাও একটা বড় গোলাপ ফুল আস্তে আস্তে রাখিয়া দিয়া বলিল, "আলো জ্বালেননি বাবু? দোব জ্বেলে?

ফিরিয়া দেখিলাম ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই, বলিলাম, "দাও জ্বেলে।" পরক্ষণেই বলিলাম, "ছেড়ে দাও ইমামুল, এই বেশ বোধ হচ্ছে।"

ইমামুল সামনের থামে হেলান দিয়া বসিল। সত্য কথা বলিতে কি মানুষের সান্নিধ্যও ভাল লাগিতেছিল না, এর উপর যদি আবার পোস্টকার্ড বাহির করে তো ধমক খাইবে।

ইমামুল একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "লোক না থাকলে বাড়ি-ঘর-দোর কিচ্ছু না বাবু, লোকই হ'ল বাড়ির জান্।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তবুও বসিয়া ইমামুল উস্‌খুস করিতে লাগিল। নিজে থেকেই বলিলাম "তোমার চিঠিটা কাল লিখে দোব, কাল সকালে এস।"

ইমামুল বলিল, "সেই সওয়ালই করছিলাম বাবু;—চিঠিতে কিছু ফল হবে কি? চিঠি তো···"

বিস্মিত ভাবে চাহিলাম, পাগলামি যে পর্যায় গিয়া ঠেকিতেছে। বোধ হয় একটু রূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "চিঠি ছেড়ে তুমি করতে চাও কি?"

অন্ধকারে ভাল করিয়া মুখ দেখা যায় না ইমামুলের, বিষণ্ণ চক্ষু আর সাদা সাদা দাঁত গুলো শুধু স্পষ্ট। অপ্রতিভ ভাবে ঘাড় কাত করিয়া বলিল, "না, তাই বলছিলাম মাস্টারবাবু..."

আরও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

ইমামুল মালী বাড়ীর মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্ট নয় যে, তাহার গতিবিধির সন্ধান রাখা প্রয়োজন। পরের দিন রাত্রে আহারের সময় মিস্টার রায় বলিলেন, "জান বোধ হয়, মালীটা সটকেছে!"

আমি একটু কৌতুহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় গেছে?"

মিস্টার রায় বলিলেন, "বলে গেছে কি? **He may have lost his head, I knew he would one of these days.** (তার মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকতে পারে, জানতাম শীগ্‌গির একদিন বিগড়োবেই)। কাল বিকেলে আমায় বাগানে একলা পেয়ে একটা বাটনহোল দিয়ে কাঁচুমাচু হ'য়ে জিজ্ঞেস করছে—'আমার কত টাকা জমেছে হুজুর?'

"বললাম, অত হিসেব করিনি। এই ক' বছর আছিস, কোন মাসে আট কোন মাসে দশ এই রকম জমেছে, চাই নাকি টাকাটা'?

"বললে, 'না হুজুর, শুধু একটা লিখে দেবেন কাগজে যে...

"পাগল লোকের ওপর রাগ করা যায় না, বললাম, 'কেন আমার ওপর মোকদ্দমা করবার জন্যে দলিল পাকা করছিস্ নাকি?' অপ্রস্তুত হ'য়ে—না হুজুর, না হুজুর,' করতে করতে সরে পড়ল। আজ মদন ক্লীনার বললে—ইমামুলের কাপড়, স্যুট কিছুই ঘরে নেই, তার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধারও ক'রে নিয়ে গেছে, আমার জামিনে। ...**I knew he would come to this end.** (জানতাম ওর শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম)। ভাবনায় পড়েছি টাকাগুলো নিয়ে।"

পরদিন মীরার চিঠি পাইলাম। তরুও পত্র দিয়াছে। মীরা লিখিয়াছে—'কাল বিকেলে উঠেই কি দেখলাম যদি আন্দাজ করতে পারেন তো বুঝব লেখক আপনি। পারবেন না, কেন-না অত বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা কোন নভেলিস্টের উর্বর মাথায়ও আসতে পারে না। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে উঠেই পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দেখি আমাদের মালী-পুঙ্গব, মিস্টার ইমানুয়েল বোরান, একেবারে স-শরীরে! সত্য কথা বলতে কি, প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি, আর যদি সন্ধ্যের পর দেখতাম তো নিশ্চয় ভূত ভেবে মূর্চ্ছা যেতাম। আসার কারণ যে কি প্রথমটা তো কোনমতেই বলতে চায় না! মার কাছে নিয়ে গেলাম, সেখানে আরও নীরব। জানেন, লোকটা

নির্ঝঞ্ঝাট, ভাল মানুষ আধ পাগলাটে বলে বাড়ির সবাই ওকে ভালবাসে। মা বললেন, 'নিজে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলি, না ছাড়িয়ে দিয়েছেন? যদি ছাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তো বল্, চিঠি লিখে দিচ্ছি, আবার কাজ করগে যা। যদি নিজে ছেড়ে এসে থাকিস্ তো কেন এ মতিচ্ছন্ন হ'তে গেল?—যা ফিরে যা। ফিরে যা।' কোন উত্তর নেই। শেষে সন্ধ্যের সময় আমার সামনে আসল কথাটা বললে।—আমি গিয়ে মিশনরি চাইল্ড সাহেবকে বলে যেন ওর বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে দিই। গিয়ে বলি লোকটা যীশু মেরীর খুব ভক্ত, প্রতি রবিবারেই চার্চে যায়, আর টাকাও বেশ মোটা রকম জমিয়েছে! এর বাড়া পাগলামী কখনও দেখেছেন আপনি?

'অনিলা মিত্রকে বোধ হয় চেনেন, আপনাদের ক্লাসেরই ছাত্রী! অনেকটা আমারই মত অবস্থা—মায়ের অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছে এখানে। ইমানুলের ব্যাপার নিয়ে, তাকে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে খুব উপভোগ করি আমরা। খুব ভাব হয়েছে আমার সঙ্গে। আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে। দু-জনে কাটছে মন্দ নয়। গোড়ায় মিশনরি যে ওর মাথায় সাঁদ করিয়ে দিয়েছিল যীশুর ধর্মে কোন ভেদাভেদ নাই—এই হয়েছে কাল। চাইল্ড সাহেবের ভাইঝিটিকে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধান নিয়ে খবর পেলাম চাইল্ড সাহেব অনেক দিনই সি-পি'র কোন পাহাড় অঞ্চলে বদলি হ'য়ে গেছেন। সাধটা অপূর্ণ র'য়ে গেল। ইমানুলকে বলেছি—'তুই ঠিকানাটা ঠিকমত জোগাড় কর, না হয় আমরা ধরব সবাই মিলে গিয়ে, এই সব পাহাড়ে অঞ্চলেই তো চাইল্ড সাহেব কাজ করেছেন।'......বিশ্বাস করেছে ঠিকানার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

"হ্যাঁ, একটা ফরমাস আছে—ইমানুলের ব্যাপার নিয়ে আপনাকে একটা গল্প লিখতে হবে, অনিলারও এই ফরমাস, সুতরাং অব্যাহতি নেই। আমার কথা না রাখেন, আশা করি কলেজ-সঙ্গিনীর কথা ঠেলতে পারবেন না।

"মার জায়গাটা লাগছে ভাল, আমাদেরও; খুব বেড়াচ্ছি তাঁকে নিয়ে।

"ইমানুলের গল্প চাই-ই। ওর কমিক (হাস্যরসের) দিকটা ভাল ক'রে ফোটাতে হবে।"

আমি চিঠিটা পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম—কি সর্বনাশা মোহ। বাতুলতার সঙ্গে আর কতটুকু ব্যবধান আছে? নিশ্চয় প্রেম নয়, রূপোন্মত্ততা, তবুও প্রশংসা করিতে হয়, অন্তত এই হিসেবে যে এটা একটা ব্যাপারের চরমোৎকর্ষ। যদি এ মোহই হয় তো এ পরিশুদ্ধ মোহের রূপ, বিচারের দ্বিধা আর পরিণামের শঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, নগ্ন মোহ। আর এই মোহই যে প্রেম নয়, তাহাই বা কি করিয়া বলি?

আমি বুঝি ; মীরা আর মীরার সঙ্গিনীরা বুঝিবে না। কবে কোথায় যেন দেখা একটা ছবির কথা মনে পড়িয়া গেল। এক তরুণী একটা প্রস্ফুট কমল দুই হাতে লইয়া একটা ভ্রমরকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নীচে লেখা আছে "খেলা"।

কমলদের জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক এই মর্মান্তিক খেলা নিত্যই চলিয়াছে ; কমলরা এর বেদনা কি বুঝিবে ?

এর কয়েক দিন পরে তরুর একখানি চিঠিতে জানিতে পারিলাম, ইমামুল হঠাৎ রাঁচি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ইমামুল সম্বন্ধে এইটুকু জানি। বাকিটুকু নিজের মনে পূর্ণ করিয়া লইয়া একটা গল্প লিখিলাম। শেষের দিকটা এইরূপ হইল।

রাঁচিতে ইমামুল সেই সখীর অবসর-বিনোদনের মস্ত একটা সম্বল হইল। পাগল ঢের দেখা যায় কিন্তু বিয়ে-পাগলার দর্শন অত সুলভ নয়। কলিকাতায় ইমামুলের শুধু মাঝে মাঝে চিঠি লিখাইবার বাই ছিল, রাঁচিতে চাঁদ একেবারে হাতের কাছে মনে করিয়া তাহার আরও কিছু উপসর্গ জুটিয়াছিল—তাহার একটা বাহ্যিক দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, ইমামুল যখনই বাহির হইত তাহার সুটটি পরিয়া লইত।

তারপর ক্রমে ঐ পোষাকী সুটই আটপৌরে হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন দুই বান্ধবীতে ইমামুলের সুটটা ভাল করিয়া ইস্ত্রী করাইয়া দিল, বলিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ইমামুল ? বাড়িতে কাপড় পরে থাক, ধর যদি তোমার খুড়শ্বশুর কিংবা ধর যদি মিস্ চাইল্ড নিজেই কোনদিন হঠাৎ এখান দিয়ে যায় আর দেখে ফেলে তোমায় ? বলা যায় না তো। তারা কাছে-পিঠেই কোথাও আছে—শহরে দরকার পড়ল, হঠাৎ একদিন এসে পড়ল, এসেই দেখে জামাই কাপড় পরে...।"

অনিলা একটু বেশি উচ্ছল, তাহা ভিন্ন পাগলের কাছে তো লজ্জার বালাই নাই তত, বলে—"আর, তা ভিন্ন তুমি সর্বদা একটু কামিয়ে-কুমিয়ে ফিটফাট হ'য়ে থেক ইমামুল—কথায় বলে, 'কামালে-কুমুলেই বর, নিকুলে-পুতুলেই ঘর'..."

গাম্ভীর্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ইমামুলকে কোনএকটা অজুহাতে তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিয়া দুই সখীতে নিরুদ্ধ হাসিকে মুক্তি দিয়া বাঁচে।

ইমামুল চলিয়া যাইতে দিন দুই-তিন অভাবটা দু-জনেই একটু অনুভব করিল। তাহার পর আবার বেড়ানোয়, পরিচয়ে, পার্টিতে ভুলিয়া গেল ; একটা বিয়ে-পাগলার কথা মানুষে কতদিন মনে করিয়া বসিয়া থাকিবে ?

এক বৎসর পরের কথা। সি-পি'র দূর পার্বত্য অঞ্চলে একটা ছোট ক্রিশ্চান পল্লী। সকাল থেকেই পল্লীটি উৎসবমুখর হইয়া উঠিয়াছে। ওদের পাস্ত্রীর আজ বিবাহ।

এই রকম বিবাহে ক্রিশ্চান-প্রথার আড়ম্বরহীনতার সঙ্গে স্থানীয় প্রথার জাঁকজমক প্রায় খানিকটা মিশিয়া যায়, পাত্রীরা অত কাড়াকড়ি করে না, বোধহয় ফলও হয় না।

এই পল্লীতে সেই দিন সকালে একজন আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইল। মাথায় অবিন্যস্ত বড় বড় চুল, একমুখ গোঁফদাড়ি, চোয়ালের হাড় অস্বাভাবিক রকম ঠেলিয়া আসিয়াছে, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত! লোকটার পরনে একটা জীর্ণ ঢলঢলে স্যুট, মাথায় তাহার মুখের মতই তোবড়ান একটা টুপি।

কয়েকজন নানা রকমের লোক উৎসবের কাপড়-চোপড় পরিয়া এক জায়গায় জটলা করিতেছিল, লোকটা একেবারে তাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; যেন কি একটা অত্যন্ত দরকারী কাজ আছে অথচ সময়ের নিতান্ত অভাব। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা উন্মাদ লোককে মানুষে যে ভয় করে সেই ভয়ে সবাই একটু সরিয়া দাঁড়াইল একজন প্রশ্ন করিল, "কি চাও?"

বড় বড় পার্বত্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, তাহা ভিন্ন আগন্তুক এখানকার লোক না হইলেও ভাষাটা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছে, প্রশ্নটা শুনিয়া যেন পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করিল; নিজের মুখে একবার হাত বুলাইয়া একবার নিজের স্যুটের পানে চাহিয়া লইয়া উত্তর করিল, "নাপিত পাওয়া যাবে?"

বিবাহের উৎসবের মধ্যে এমন সৌখিন পাগল পাইয়া সবাই উল্লসিত হইয়া উঠিল। একজন বেশ রসিক, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সদ্য হোম্ (বিলাত) থেকে এসেই এখানে চলে এসেছ, সেখানে নাপিতের অভাবে বুঝি আর টেঁকতে পারলে না?"

সমস্ত দলটা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

আগন্তুকের গাম্ভীর্য তাহাতে একটুও ব্যাহত হইল না। প্রশ্ন করিল, "আজ তোমাদের কী এখানে?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আবার বলিল, "আজ তোমাদের পাত্রী সায়েবের বিয়ে, না?"

হ্যাঁ, এই সঙ্গে তোমারও একটা হ'য়ে যাবে নাকি?"

আবার হাসির একটা তুমুল উচ্ছ্বাস উঠিল। আগন্তুক বলিল, "এ বিয়ে হবে না; হ'তে পারে না"—তাহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত হাসি থামিয়া গেল। একজন ছোকরাগোছের আর একটা রসিকতা করিয়া সেটাকে উজ্জীবিত করিতে যাইতেছিল, একজন বয়স্কগোছের তাহাকে বিরত করিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?

"রেভারেণ্ড্ চাইল্ড জানেন, কেন। তিনি এসেছেন তো? তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি, বাধা আছে?"

তিনি আজ ছ'মাস হ'ল মারা গেছেন !"

আগন্তুকের মসীবর্ণ মুখটা যেন মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আর নাথু ? তাঁর সহকারী ন্যাথেনিয়েল।"

উত্তর হইল, "সে গেছে প্রায় এক বছর হ'ল।"

পিছন হইতে সেই ছোকরা একটু নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া লইয়া বলিল, "কোন বাধা নেই, তুমি ইচ্ছে করলেই সেখানে গিয়ে দেখা করতে পার !"

দলের মধ্যে যাহারা হাস্যপ্রবণ তাহাদের একটা চাপা হাসি উঠিল।

আগন্তুক নির্বিকার ভাবে বলিল, "কিন্তু এ-বিয়ে হতে পারে না, তিনি অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন, ত্রাণকর্তা যীশু ভয়ানক আঘাত পাবেন মনে তাহ'লে। কখন বিবাহ ?"

"এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, বরবধূ সাজগোজ করছে, এবার বেরুবে !"

"আমি মিস্ চাইল্ডের সঙ্গে দেখা করব।"

"অসম্ভব।"

"করতেই হবে···দেখা···ত্রাণকর্তা···যীশু...আর ফাদার চাইল্ডের আত্মাও কষ্ট পাবেন···তিনি বলেছিলেন···"

অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া স্পষ্টই বলিতে হইল, "মিস চাইল্ড পাগলের সঙ্গে দেখা করবেন না, বিশেষ ক'রে এখন।"

লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। সুঠাম আগাগোড়া দেখিয়া লইয়া দুইটা হাত একবার ঘুরাইয়া বলিল, "পাগল !"

এমন সময় পাদ্রী সাহেবের বাসার দিক হইতে একজন ছুটিয়া ভীড়ের বাহির হইতেই বলিল, "মিস চাইল্ড ওকে একবার ডাকছেন।"

গোলমালের কারণটা বরবধূ ও অতিথিদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। মিস্ চাইল্ড অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

চিনিতে একটু বিলম্ব হইল, তাহার পরই মিস্ চাইল্ড উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ইমানুয়েল ! হাউ নাকি ! তুমি এখানে কোথা থেকে ? এরা কি বলছে তোমার সম্বন্ধে ? তুমি নাকি বলছ—এ বিবাহ হ'তে পারে না ?···তোমার এ রকম চেহারা কেন ? —কত দূর থেকে আসছ ? তুমি কোথায় আমায় কনগ্র্যাচুলেট (অভিনন্দিত করবে, না···"

মিস্ চাইল্ড হাসিয়া উঠিলেন।

বর মিস্টার শেরিডেনও হাসিয়া বলিলেন, "But I am to be congratulated

first (আপনার চেয়ে আমায় আগে অভিনন্দিত করা দরকার।"

অভ্যাগতদের মধ্যে একজন রসিকতা করিয়া বলিলেন, "But he may be your rival ! Excuse me, Miss Child" (কিন্তু ও আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীও হ'তে পারে তো ?···মিস্ চাইল্ড মাফ করবেন) !"

একটা হাসির রোল উঠিল।

ইমানুল মুগ্ধ বিস্ময়ে মিস্ চাইল্ডের পানে চাহিয়া রহিল। কী অপরূপ রূপ ! কী অসম্ভব আশা। আপাদমস্তক বধূবেশের শুভ্র আচ্ছাদন, সূক্ষ্ম ছবির পরীদের মত ; বদন মণ্ডলে পরীদের মতই একটা দ্যুতি, হাতে একটা শুভ্র ফুলের তোড়া চারটি সুসজ্জিতা বালিকা রাণীর মত পিছনের আস্তরণটা তুলিয়া ধরিয়া আছে···

ইমানুল একব'র নিজের পানে চাহিল। কী দুস্তর ব্যবধান ! কত দূরে !—কত দূরে !—সত্যই কত দূরে !

ইমানুলের শীর্ণ মুখে ধীরে ধীরে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। ওকে অন্ধ করিয়াছিল বিকৃত একটা আশা ; নিরাশা ওকে আবার চক্ষুষ্মান করিল। দেরী হইল না, এক মুহূর্তেই ও ওর স্বপ্নের অলীক জগৎ হইতে নামিয়া কঠিন মাটি স্পর্শ করিল। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া ব্যাপারটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল ; বলিল, "আমি বলতে এসেছিলাম...আমি বলতে এসেছিলাম যে..."

মিস্ চাইল্ড প্রসন্ন হাস্যের সহিত স্নেহদ্রব কণ্ঠে বলিলেন, "আমি জানি তুমি কি বলতে এসেছিলে ইমানুয়েল, আমায় অভিনন্দিত করতেই এসেছিলে। যাও, তাড়া-তাড়ি স্নান-টান ক'রে গির্জায় এস। কত দিন তুমি ভাল ক'রে স্নানাহার করনি ? কত দূর থেকে আসছ ?"

মিস্টার শেরিডেন একজন চাকরকে ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিয়া দিলেন।

বিবাহের অনুষ্ঠানান্তে ইমানুলের খোঁজ পড়িল। পাওয়া গেল না কিন্তু তাহাকে।

নিরাশা সত্যই কি তাহাকে চক্ষুষ্মান্ করিল ? না, একবার দুর্নিরীক্ষ্য আলোকের সম্মুখীন হইয়া তাহার নয়নের দীপ্তি চিরদিনের জন্যই লুপ্ত হইয়া গেল ?

৭

গল্পটার নাম দিলাম 'আলোক'। এক কপি মীরার নিকট পাঠাইয়া দিলাম, এক কপি পাঠাইলাম একটা পত্রিকায়।

মীরা লিখিল—"গল্প পাঠানর জন্যে ধন্যবাদ, আরও ধন্যবাদ এই যে, আমাদের মূঢ় ফরমাস অনুযায়ী ইমামুলকে আমাদের হাসির খোরাক ক'রে সৃষ্টি করেননি। আমরা দু-জনেই আপনার দৃষ্টি আর অনুভূতিকে অভিনন্দিত করছি।"

আরও একটা খবর দিল—নিশীথের হঠাৎ বায়ু-পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ায় রাঁচিতে উপস্থিত হইয়াছে ; একটু দূরেই ওদের আর একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইখানেই উঠিয়াছে। ভগবান যখন মারেন এমনি করিয়াই মারেন,—শুধু ইমামুলকে সরাইয়া লইলেন না, নিশীথকে ঘাড়ে আনিয়া ফেলিলেন। এই সব অন্যায় করেন বলিয়া ভগবান মানুষের সামনে আসিতে সাহস করেন না। মীরা চেষ্টা করে নিশীথকে অনিলার ঘাড়ে চাপাইবার, কিন্তু অনিলা বড় সেয়ানা মেয়ে। যা হোক্ বাঁধা মার সয় ভাল, দুইজনে যথাসম্ভব ভাগাভাগি করিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছে। এত বড় বাড়ির ভাড়া বলিয়াও তো একটা জিনিস আছে ?—নিশীথ যদি সেটা এই আকারেই আদায় করিতে চায় ?

আর একটি পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছে। এখানকারই বাসিন্দা। কর্তা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট্ জজ, গৃহিণী বর্তমান, তিনটি মেয়ে, একটি ডায়োসেসনে পড়ে ; দুইটি ছেলে, বড়টি ডেপুটি, এখন রাঁচিতেই থাকে। চমৎকার পরিবারটি।

আমায় একবার যাইতে লিখিয়াছে মীরা। এত দেখিবার, বেড়াইবার জায়গা আছে ওখানে! আমি গেলে রাঁচি-হাজারিবাগ রোড হইয়া হাজারিবাগ যাইবে। অমন সুন্দর পথের দৃশ্য নাকি ভারতবর্ষের এ অঞ্চলে কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আমাদের ছোটখাট ছুটি নাই এদিকে ? না থাকিলেও তিন-চার দিনের জন্য যেন যাই একবার ; অত বই আর পার্সেণ্টেজ আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে অনেক জিনিস থেকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

যাইবার প্রবল ইচ্ছা, নানা কারণেই ; কিন্তু বাধা আছে। একটা এবং প্রধান বাধা এই যে, কোন ছুটি নাই এবং বিনা ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়াটা বড়ই বিসদৃশ দেখায়—বেড়াইবার অতিরিক্ত যে উদ্দেশ্যটা—যেটা আসল উদ্দেশ্য—সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠে।

রাত্রে আপনিই সুবিধা হইয়া গেল। আহারের সময় মিস্টার রায় বলিলেন, "আজ অপর্ণার চিঠি পেলাম শৈলেন। লিখেছে সে ভালই আছে, তার জন্যে তরুর আর সেখানে থাকবার দরকার নেই পড়ার ক্ষতি ক'রে—প্রায় মাস-দুয়েক হ'তেও চলল। অপর্ণার নিজের ইচ্ছে আমার চিঠি পেলে রাজুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় ; কিন্তু লিখেছে মীরা তাতে মোটেই রাজি নয়, বেটাছেলে এর মধ্যে থেকে একজনও কমলে তার অত বড় বাড়িটায় থাকতে ভয় করবে। মীরার একান্ত ইচ্ছে যে আমি নিয়ে আসি তরুকে,

as if that is possible, silly girl (বোকা মেয়ে, সেটা যে অসম্ভব তা বোঝে না)। আমি বলি কি, তুমি দিন চারেকের ছুটি ক'রে ঘুরে এস না…"

মেয়েটি যে তাঁহার নিতান্ত 'সিলি' নয় এ-কথা আর ব্যারিস্টার হইয়াও ধরিতে পারিলেন না।

আমি রাঁচি স্টেশনে নামিলাম প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। পথে নামিয়া একবার জামসেদপুরটা দেখিয়া লইলাম।

স্টেশনে তরু আসিয়াছিল। আনন্দে আমার হাতটা জড়াইয়া সমস্ত শরীরটার ভার আলগা করিয়া দিল। বলিল, "দিদিও আসতেন মাস্টারমশাই; আজ রাত্তিরে নিশীথদার ওখানে ভোজ, দিদির ওপর সব ব্যবস্থার ভার পড়েছে, তাই পারলেন না। আপনার টেলিগ্রাম আমরা কালই পেয়েছিলাম।…হাজারিবাগ রোড কবে যাবেন মাস্টারমশাই ?…রণেনদাকে আপনি চেনেন না ?—রণেনদা ডেপুটি ! ওঃ কি ভয়ংকর ভাল লোক ওরা সবাই !…আর, আপনার রাজু এক কাণ্ড করেছে সেদিন মাস্টারমশাই !…"

মাস-দুয়েকের রাশীকৃত খবর ; সঙ্গে মীরাও নাই যে বাধা দিবে। সমস্ত রাস্তায় এক মুহূর্তের বিরাম দিল না।

প্রথমেই অপর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা করিলাম। মোটরের আওয়াজ শুনিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, আমি গিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম

ওঁর শরীরটা সত্যই ভাল হইয়াছে অনেকটা, যদিও মুখের সেই ক্লান্ত উদ্বিগ্ন ভাবটা এখনও একটু লাগিয়া আছে। ওটা ওঁর চেহারার একটা অঙ্গ, যাইবার নয়। যাইলে, নিরাশও হইতাম।

বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প হইল। মিস্টার রায়ের কুশল-সংবাদ অবশ্য আমিই দিলাম। তাহার পর প্রথমেই সরমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বুদ্ধি করিয়া সরমার সহিত দেখা করিয়াই আসিয়াছিলাম, জানি তাহার প্রশ্ন আগেই হইবে। বলিলাম "সরমা দেবী ভালই আছেন, আমি গিয়েছিলাম কাল, আপনাদের তিনজনের নামে তিনখানা চিঠি দিয়েছেন। একটু হাসিচ্ছলেই বললেন, কাকীমাকে বলবেন আমার জন্যে না ভাবতে, তাঁর তাড়াতাড়ি একটু সেরে চলে আসা দরকার ; একলা পড়ে গেছি বড্ড'।"

চিঠিটা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তরু উঠিয়া ছুটিয়া গেল, বোধ করি ওর দিদির কাছে।

অপর্ণা দেবী তখনই চিঠিটা খুলিলেন না। সামনে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া কতকটা আপন মনেই ধীরে ধীরে সরমার কথাটা আবৃত্তি করিলেন, "কাকীমাকে বলবেন

আমার জন্যে না ভাবতে···বুড়ী হ'য়ে গেল সরমা! হবে না?—বুড়ী কি বয়সেই হয়? হয় দগ্ধানিতে...”

তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, “শৈলেন, ও ঠিকই ধরেছে, আমি ওর কথাই আজকাল বেশি ভাবি। ভুটানীর মৃত্যুতে অবশ্য মনটা আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে খোকার জন্যে উতলা হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক, আজকাল সরমার জন্যেই মনটা বেশি আকুল হ'য়ে থাকে। আমি মা হবার অপরাধ করেছি, নিরুপায়; কিন্তু সরমা কি দুঃখে নিজেকে অমন তিল তিল ক'রে দগ্ধাচ্ছে বল তো?···বাগদত্তা?—ঠিক যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদত্তা কখনও হয়েছিল তাও নয়; তবে?···বুক ফেটে যায় শৈলেন, ও আজ আমায় গিন্নীর মত উপদেশ দিয়ে পাঠালে—,আমার জন্যে ভাবতে বারণ করলেন!'···খোকা গিয়ে পর্যন্ত মেয়েটার মুখে একদিনও যাকে হাসি বলে সে হাসি ফোটেনি। হাসতে হয় হাসে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয় মেশে, কথা বলতে হয় কথা বলে, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ নেই দেখতেই তো পাও। এমনও লোক আছে শৈলেন, যারা বলে—সরমার এটা অভিনয়। তা বলবে—ওকে বোঝবার ক্ষমতা ক'টা মানুষের আছে বল তো শৈলেন? দেখতে তো পাচ্ছ আমাদের অবস্থা? চলা-বসা, হাসা-গাওয়া,সামাজিক শিষ্টাচার—সবই যেখানে অভিনয় হ'য়ে উঠেছে, যেখানে যা আসল, যা খাঁটি তাকে চেনবার চোখ কোথায়? সরমা কি ওদের যুগের? সরমা কি ওদের সমাজের—যে চিনবে ওরা?···আমার এক-একবার কি মনে হয় জান?—মনে হয় সরমা উমার তপস্যা করছে। উমা কার জন্যে তপস্যা করেছিলেন আর সরমা কার জন্যে করছে সেইটেই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তপের উগ্রতা নিয়ে। কী সংযত উদাসীনতা! রাজার ছেলে পর্যন্ত পাণিপ্রার্থী হ'য়ে নিরাশ হয়েছে শৈলেন এখন দেখছ তো?—ওর দিকে কেউ আর চোখ তুলে চাইতে সাহস করে না। যাদের চরিত্রে একটুও মনুষ্যত্ব আছে তারা ওকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ক'রে এড়িয়ে চলে; যাদের একবারেই নেই, তারা ওর প্রতি উদাসীন,—তারা এই বলে আনন্দ পায় যে, সরমা অভিনয় করছে।···সরমা সত্যিই উমার তপস্যা করছে। আমি স্ত্রীলোক, তা ভিন্ন আমার বংশে দুই দিক দিয়ে সতীর রক্তের ধারা আছে, আমি এ-তপস্যা চিনি। তোমার কাছে লুকোব না শৈলেন, —আমার কি আশা জান?—আমার আশা, আমার বিশ্বাস—সরমার এই তপস্যাই আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনবে, সে যেমন ছিল তেমনি ক'রে—বরং তার চেয়েও ঢের ভাল ক'রে—সরমার উপযোগী করে।···আমি রাঁচিতে এসে যে ভাল আছি, তার কারণ রাঁচির জল-হাওয়াও নয়, নতুন নতুন দৃশ্যও নয়, নতুন নতুন পরিচয়ের আনন্দ নয়, তার কারণ শুধু এই যে, আমি এখানে এসে—বোধ হয় খুব কাছে থেকে

কয়েক দিনের জন্যে সরে আসবার ফলেই তপস্যার মূর্তিটি খুব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছি, এই বিশ্বাসটা আমার মনে হঠাৎ উদয় হয়েছে আর যতই দিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় হ'য়ে উঠছে ...”

সেদিনকার ছবিটা আমার মনে গাঁথিয়া বসিয়া আছে। অপর্ণা দেবীর নতুন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটা অস্তরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে ফেরানো, আয়ত চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতেছে; তাহার উপর একটা অলৌকিক আভা। সতীর তপস্যা-কাহিনী বলিতে বলিতে ওঁর ধমনীর সতী-রক্তের ধারা যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে তপস্যার বিশ্বাসে কী একটা অনির্বচনীয় ভাব! হিন্দু, তাই নিজের ধমনীতেও সে রক্তোচ্ছ্বাসের আমন্ত্র শোনা যায়। মনে হইল এই সার্থক সন্ধ্যাটির জন্যই যেন আসা আজ বাঁচিতে। কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমায় আজ এ পুণ্যের ভাগী করিয়াছে—তাহাকে মনে মনে প্রণাম জানাইলাম।

ক্রমে অপর্ণা দেবীর মুখমণ্ডল সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গেই আবার ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল। আমার দিকে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, “এক-একবার আবার এও মনে হয়—নিজের স্বার্থটাকেই বড় ক'রে দেখছি না তো? ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে জানি না, তবে সরমাকে বুঝিয়ে বলেওছি অনেকবার, উনিও বলেছেন, কিন্তু ...”

মীরা আসিল, সঙ্গে তরু। সবচেয়ে স্বাস্থ্য ওরই ফিরিয়াছে, অবশ্য ফিরিবার কথাও। চেহারাটা অবিন্যস্ত, রাঁধিতেছিল তাহারও প্রমাণ আছে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বলিল, “ভয়ানক ব্যস্ত, রাঁধতে রাঁধতে শুধু দেখা করতে এলাম একটু। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি—কোথায় তিন-শ মাইল দূরে পাহাড় জঙ্গলের এদিকে একটা নেমতন্ন পেকেছে, কি ক'রে টের পেলেন বলুন তো?...এই ক'রেই তো আপনারা আমাদের ব্রাহ্মণদের বদনাম করেছেন...”

আমি একটু ভয়ের অভিনয় করিয়া মীরার হাতের দিকে একবার চাহিয়া বলিলাম, “ভাগ্যিস আপনি খুন্তিটা হাতে ক'রে নিয়ে আসেননি!...”

সকলেই উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলাম।

৮

নিশীথ আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। অবশ্য যথাপদ্ধতিই করিল, তবু—বোধ হয় ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও—এমন একটা কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হইয়া গেল যে, মনে হইল এই সঙ্গে যদি যমালয় থেকেও একটা নিমন্ত্রণপত্র বিলি করাইয়া দিতে পারিত তো খুশি হইত।

পার্টিটা মাঝামাঝি-গোছের। স্বয়ংবর-সাধনে খুব আটঘাট বাঁধিয়া নামিয়াছে

নিশীথ। নিতান্ত একটা ছোট পার্টির কর্ত্রী করিয়া মীরাকে ফাঁকি দেয় নাই, আবার সেটা মেলা বড় করিয়া তাহাকে ভারাক্রান্তও করে নাই। জন বার-চৌদ্দ লোক হইবে সব মিলিয়া।

তরুকে বলিয়া দিয়াছিলাম সব হইয়া গেলে যেন আমায় খবর দেয়। ভাবিলাম মীরা থাকিবে ব্যস্ত, নিশীথ থাকিবে বিরূপ, আগে গিয়া মিছামিছি অস্বস্তি ভোগ করা কেন।

আমি যখন পৌঁছিলাম তখন পরিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রায় সকলেই চেয়ার গ্রহণ করিয়াছে। তিন-চারজন বসিবার অনাগ্রহটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অকাজের ব্যস্ততা সৃষ্টি করিয়া।

আমি আসিতেই একটি তরুণী নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল। লীলায়িত ভঙ্গি সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আসুন, শুনলাম আপনি এসেছেন, অথচ..."

প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম, "অপর্ণা দেবীর সঙ্গে গল্পে লেগে গিয়েছিলাম একটু।" টেবিলের উপর চোখ বুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিলাম, "ঠিক সময়েই এসেছি কিন্তু।

সহাস্য উত্তর হইল, "এত ঠিক সময়ে আসাটাই বেঠিক। কোথায় ভেবেছিলাম যে একটু গল্প-স্বল্প করব।"

এই অনিলা মিত্র। কলেজে সম্পূর্ণ অন্যরূপ—গম্ভীর, মুখে রা নাই, ক্লাসের হাজার হাসির কথা হইলেও ঠোঁটের একটা কোণ চাপিয়া এত অল্প হাসে যে, মনে হয় ও জিনিসটা যেন শেখাই হয় নাই। মনে পড়ে না কখনও একটি কথা হইয়াছে, সিঁড়ির বারান্দায় দেখা হইলে হদ্দ একটু নমস্কার-বিনিময়।

আমায় নিজের খালি চেয়ারের কাছে লইয়া আসিল। পাশেই মীরার চেয়ার; বলিল, "শৈলেনবাবুর এই এতক্ষণে আসবার ফুরসত হ'ল মীরা-দিদি।"

একটু আগে আমায় যে ঠাট্টা করিয়াছিল, মীরা আবার সেইটেরই পুনরুক্তি করিল, একটু হাসিয়া বলিল, "তা বলে তুমি যেন মনে ক'রো না যে উনি নির্লোভ, উদাসীন মানুষ; গন্ধ পেয়ে তিন-শ মাইল থেকে ছুটে আসছেন।"

"কিসের গন্ধ?" বলিয়া একটা হাসির আভাসমাত্র দিয়াই অনিলা তখনই কথাটা ঘুরাইয়া লইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, "বাঃ দাঁড়িয়ে রইলেন যে? —বসুন!"—বলিয়া চেয়ারটা আমার পিছনে একটু টানিয়া দিয়া আমায় প্রায় আটকাইয়া দিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, মীরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাঃ, আর তুমি?"

অনিলা ফিরিয়া আসিল। মীরার কাঁধের উপর দুইটা হাত দিয়া একটু ঝুঁকিয়া

চাপা গলায় বলিল, "আহা, মীরা-দিদি যেন কিছু জানেন না! মিস্টার দত্ত তখন থেকে আমার ওপর কি রকম অ্যাটেন্‌শন্‌ দিচ্ছে বলো দিকিন, দু-কুড়ি বয়েস আর দোজবর বলে যেন মানুষ নয় বেচারী!"

আমি যে শুনিলাম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ওদিকে একজন মাঝবয়সী খুব ফ্যাসান-দুরস্ত ভদ্রলোকের পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

মীরা আমায় বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন? বসুন।"

উপবেশন করিলে বলিল, "আপনাদের কলেজের অনিলা মিত্র, চেনেন নিশ্চয়!"

বলিলাম, "চেনা শক্ত, কলেজে একেবারে অন্যরূপ।"

মীরা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? কিন্তু চমৎকার মেয়ে। আর সর্বদাই একটা-না-একটা মতলব···"

হঠাৎ থামিয়া গেল; নিশ্চয় এই 'মতলব' করিয়া আমায় তাহার পাশে বসাইয়া দিয়া যাইবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

কাঁটা-চামচের টুংটাং শুরু হইয়া গেল।

দেখিতে পাইলাম এবং তাহার চেয়ে বেশি অনুভব করিলাম, আমি সকলেরই যেন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। অনিলার অভ্যর্থনা—পদ্ধতি, তাহার পর আবার মীরার পাশে স্থান পাওয়া—তাহাও এই-ভাবে—সকলেই মনে করিল আমি বিশিষ্ট কেউ একজন।

আর একটা জিনিস অনুভব করিলাম, মীরা ভিতরে ভিতরে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে! দোষ দেওয়া যায় না মীরাকে, কিন্তু আমিও যেন একটু জড়ভরত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

নিশীথ ব্যাপারটাকে ফুটাইয়া তুলিল।—

দু-একবার নিশীথের পানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিয়াছি; নিমন্ত্রণ করিয়া এমন মৃত্যুযন্ত্রণা কাহাকেও কখনও ভোগ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তরুর কাছে শুনিলাম, আমার টেলিগ্রাম পাইয়াই নিশীথ ভোজের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, নিশ্চয় উদ্দেশ্যটা মীরাকে যতটা সম্ভব অন্যদিকে ব্যস্ত রাখা।...পরিণাম এই। দুইবার চাহিলাম, দুইবারই ওর সঙ্গে চোখোচোখি হইল! অন্যদিকে আর মন দিতে পারিতেছি না। আহা, বেচারী! ··কষ্টও হয়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত তো নয় এটা আমার; এমন কি পছন্দসইও নয়।

হঠাৎ একবার নিশীথ অভ্যাগতদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, একজনকে তো আপনাদের সঙ্গে ইনট্রোডিউসই করা হ'ল না!"

তাহার পর কায়দামাফিক হাতের চেটো দিয়ে আমার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল,

"ইনি হচ্ছেন মিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ···শৈলেন্দ্রনাথ···ভিয়ার মি !—দেখুন, এতদিন রয়েছেন মীরা দেবীদের বাড়ীতে, অথচ আপনার পদবীটা !"

মনে মনে বাহাদুরী দিলাম নিশীথকে। উপেক্ষার ভাবটা বেশ ফুটাইয়া আনিতেছে, বুদ্ধি খুলিতেছে ওর। মিস্টারের সঙ্গে না খাপ খায় এই জন্য সহজভাবে হাসিয়া বলিলাম, "মুখোপাধ্যায়।"

"হ্যাঁ, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মীরা দেবীর বোন তরুকে পড়ান। মিসেস্ রায় আর মিস্টার রায়ও প্রায়ই আমার কাছে সুখ্যাতি করেন ওঁর,—খুব ভাল মাস্টার। খুব বিশ্বাসযোগ্য···আর কি সব কোয়ালিফিকেশন আছে ওঁর মীরা দেবী ?"

মনে মনে একটু হাসিলাম, এতেও এতটুকু মৌলিকতা দেখাইতে পারিল না নিশীথ ?—সেই মীরার অস্ত্র !

একটু সময় দিলাম মীরাকে, দেখিলাম মীরা যেন বিপর্যস্ত, একটু সহজভাবে মুখ তুলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উত্তর কিছু জোগাইল না ওর। আমিই হাসিয়া বলিলাম "এর চেয়ে আর বড় কোয়ালিফিকেশন কি হ'তে পারে নিশীথবাবু ? —মাস্টারি করি, তাতে দু-জন মনিবই খুব সন্তুষ্ট বলছেন আপনি। ওঁদের বাড়িতে অত পুরনো চাকর ; অল্প দিন হ'লেও আমাকে খুব বিশ্বাস করেন, একজন প্রাইভেট টিউটরের এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হ'তে পারে বলুন ?"

জড়ভরতের ভাবটা অনেকক্ষণ কাটাইয়া উঠিয়াছি, নিশীথ যেটাকে আমার গ্লানি বলিয়া ইঙ্গিতে জাহির করিতে চাহিয়াছিল, সেটাকে বেশ ভাল করিয়াই স্পষ্ট করিয়া দিয়া, সমর্থনের জন্য সপ্রতিভ ভাবেই হাসিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া লইলাম।

অনিলার মুখটা গম্ভীর। নিশীথের কাঁটা-চামচে আর মটন-চপে জড়াজড়ি হইয়া গেল। রণেন মীরার দুই সীট ওদিকে বসিয়াছিল, ঘাড়টা বাড়াইয়া কতকটা যেন নিশ্চিন্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তরুর টিউটর উনি ?"

মীরা জড়িত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর ··"

সূত্রটা অনিলা খুঁটিয়া লইল, বলিল, "কিন্তু ওঁর আসল পরিচয় বোধ হয় এই যে, উনি একজন উদীয়মান লেখক, বাংলার অনেক বড় বড কাগজেই..."

মীরাও এতক্ষণে অনেক সামলাইয়া লইয়াছে, অনিলাকে বলিল, "আর ওঁর কলেজ কেরিয়ারের কথা বললে না ? তুমিই তো বলেছিলে—শৈলেনবাবু নেক্স্ট ইয়ারে নিশ্চয় একটা পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ্ নিয়ে বিলেত কিংবা জার্মানীতে ··"

মীরা যে ব্যাপারটা এতটা বিসদৃশ করিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করি নাই। তবে কারণটা বুঝিলাম,—ও যে মাস্টারের সঙ্গে মেলামেশা করে, পাশে বসিলেও আপত্তি করে না, এই অভিজাত সমাজে প্রথম সুযোগেই তাহার জবাবদিহি করিতেছে ও।

অর্থাৎ বাড়ির মাস্টার হইলেও নিতান্ত অযোগ্য নই আমি।—আমি একজন সাহিত্যিক, একজন বিশিষ্ট ছাত্র, অবিলম্বেই বিলাত কিংবা জার্মানী গিয়া খেতাব আনিব ; আজ না হয় অন্তত দু-বছর চার বছর পরে এই সমাজের উপযোগী যে হইবেই তাহাকে একটু প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিলে নিতান্ত অশোভন হয় না, ভাবটা ওর নিশ্চয় এই।

সমস্ত শরীরটা যেন আমার অস্বস্তিতে সির্ সির্ করিয়া উঠিল। একটা উত্তর দিব যাহা একদিকে কাটিবে মীরাকে আর একদিকে আঘাত দিবে নিশীথের অক্ষর-লাঙ্গুলে। সুযোগ একটা এই ছিল যে, পার্টিতে সমীহ করিবার মত কেহ ছিল না। বয়স্ক যাঁহারা—রণেনের পিতা, মাতা, অপর্ণা দেবী, অনিলার মা—এঁরা পূর্বেই একবার আসিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ একটু প্রাণখোলা হাসিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বলিলাম, অযোগ্যকে তার অনাগত যোগ্যতা দিয়ে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন দেখে আমার হাসি সংবরণ করা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে, মীরা দেবী। চার বছর পরের ভাবী শৈলেনকে অভিনন্দিত ক'রে আজকের দীন, অযোগ্য শৈলেন-মাস্টারকে লজ্জিতই করছেন···বিলেত, জার্মানী, কি অন্য কোন বিদেশী খেতাবের উপর আপনাদের যতটা টান আছে আমার নিজের ততটা নেই কিন্তু, থাকলে গোটাকতক অক্ষর জাহাজে আনিয়ে নিতে কতক্ষণ ?

হাসির সঙ্গী বাড়াইবার জন্য বলিলাম, "আমার কি মনে হয় জানেন ?—ও অক্ষর-গুলো নিতান্ত ভুয়ো, যদিও হয়তো বিবাহের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অনেকে বোধ হয় ভাবেন মাথায় আকাশচুম্বী টোপর লাগিয়ে অনুরূপ দীর্ঘতার একটা অক্ষরের লাঙ্গুল না পরে নিলে একটা ভদ্রোচিত বিবাহের আসরে ব্যালান্স (ভারসাম্য) রক্ষা হয় না, তাই..."

পেট ভরিয়া আসিলে অল্পই হাসি পায় ; আমি শেষ করিবার পূর্বে সকলেই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, সকলে মানে অবশ্য নিশীথ সেন এস্কোয়ার, এম-আর-এ-এস, এফ-টি-এস, পি-আর-এ-এস-এ ছাড়া। তাহার কাঁটা-চামচ আর চপ-কাটলেট একেবারে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। অবশ্য হাসিবার চেষ্টা যে একেবারেই না আছে এমন নয়।

অতিথিধর্মের ব্যত্যয় হইয়া যাইতেছে বলিয়া চুপ করিলাম। অবশ্য আমার সান্ত্বনা এই যে, আমি আরম্ভ করি নাই, আগে হইয়াছে আতিথ্যধর্মেরই লঙ্ঘন। তবে আমি এত সাধারণ ভাবেই এবং এমন হাসিচ্ছলে বলিয়াছি যে, এক মীরা আর নিশীথ ভিন্ন এর হুলের সন্ধান বিশেষ কেহ একটা পায় নাই, অনিলা কিছু কিছু বুঝিয়া থাকিতে পারে, আরও বোধ হয় দু-একজন যাহারা নিশীথের অসার টাইটেল-প্রীতির সন্ধানটা পাইয়াছে।···যাক্ অত ভাবিয়া কথা বলিলে তো চলে না। অযথা আঘাতই

বা মাথা পাতিয়া লইব কেন? আমার আজ যাহা উপজীবিকা সে সম্বন্ধে আমার কোন লজ্জাই নাই; কেনই বা থাকিবে?—যদি সেইটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কেহ আমার চোট দিতে চায় বা এড়াইয়া চলিতে চায় তো তাহাকে আমার মনের ভাবটা জানাইয়া দিতে হইবে বৈকি!

হাওয়াটা যে অস্বস্তিকর হইয়া পড়িয়াছে এটা অস্বীকার করা যায় না। আমার মনের অবস্থাটা নিমন্ত্রণ খাওয়ার একেবারেই অনুকূল নয়। সাধ্য থাকিলে উঠিয়া নিজেও বাঁচিতাম, অনভিজাতদের সঙ্গ থেকে এদেরও অব্যাহতি দিতাম, কিন্তু তাহার উপায়ই ছিল না কোন! সুতরাং সাধ্যমত হাওয়ার গতিটা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টায় রহিলাম।

একটা নিতান্ত চলতি ঠাট্টার সুযোগ আসিল, কিন্তু চলতি হইলেও হাতছাড়া করিলাম না। ওয়েটার দইয়ের প্লেট বিলি করিতে করিতে অনিলার কাছে যাইতেই বলিলাম, "দেখো, ওঁকে যেন দিয়ে ব'সো না!"

অনিলা কাঁটা-চামচ থামাইয়া বিস্মিত ভাবে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, কেন দেবে না?"

অন্য সকলেও বিস্মিত হইয়া একবার তাহার পানে, একবার আমার পানে চাহিতে লাগিল। আমি অনিলার কথার উত্তর না দিয়া মীরার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজ আপনাদের গানের ব্যবস্থা হয়নি?"

মীরা আমার পানে চাহিল, পরে অনিলার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "অনিলা গাইতে জানে নাকি? কৈ আমাকে তো বলেনি কখনও! তাহ'লে কাজ নেই দই দিয়ে, গলা বসে যেতে পারে।"

অনিলা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "না না মীরা-দিদি, আমি মোটেই গান জানি না—আমার একেবারে আসে না!…"

তাহার ভাবগতিক দেখিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে খুব উপযুক্ত প্রসঙ্গই আরম্ভ করিয়াছিলাম; এই সব উপলক্ষ্যে এই ধরনের কথা একেবারে জমিয়া উঠে, আর বিশেষ করিয়া—দু-একজন ছাড়া যে ধরনের মানুষ লইয়া পার্টিটা—বড় কোন আলোচনা বা সূক্ষ্ম কোন রসিকতা জমিতও না।

আমি অনিলার আপত্তির দিকে একেবারেই কান দিলাম না। মীরার পানে চাহিয়া তাহারই কথার উত্তর দিলাম; হাসিয়া বলিলাম, "বাঃ একটা মানুষ কষ্ট ক'রে গান শিখবে, তার ওপর আবার কষ্ট ক'রে বলবে, তবে আপনারা টের পাবেন?"

অনিলা ওদিকে পরিত্রাহি আপত্তি করিয়া যাইতেছে, "বাঃ, না—কি মুশকিল! …দইয়ের প্লেট দাও আমায়, চলে যাচ্ছে যে? অথচ দই আমি ভালবাসি। কি

ফ্যাসাদ দেখ তো?···আচ্ছা, আপনি কি ক'রে জানলেন যে গাইতে জানি?—মীরা-দি'কে যে বলতে গেলেন?

আমি নিরীহের মত মুখের ভাব করিয়া বলিলাম, "বাঃ, এক কলেজে পড়ি—এক ক্লাসে! আপনি কি ক'রে জানলেন যে স্টেট-স্কলারশিপ্ নিয়ে জার্মানী যাব?—মীরা দেবীকে যে বলতে গেলেন?"

হাসির আর একটা তোড় উঠিল। কেহ হাসিচ্ছলে, কেহ বা বিশ্বাসভরেই অনিলাকে আহারের শেষে গানের জন্য ধরিয়া বসিল।

রণেন বলিল, "এঁদের চেনা দায়। এই থেকে আমার আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে···"

বেটাছেলে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল, "কি সন্দেহ? বলুন।"

রণেন গলাটা একটু সামনে বাড়াইয়া মীরার দিকে চাহিয়া বলিল, "তাহ'লে মীরা দেবীও আমাদের এত দিন ধরে যে প্রবঞ্চনা না ক'রে এসেছেন···"

মীরা দারুণ বিস্ময়ে কাঁটা-চামচ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, "মাফ করবেন, আমি একেবারেই জানি না, দোহাই। শৈলেনবাবুর কথাতেই তার প্রমাণ রয়েছে—গান জানলে আমি অনিলাকে নিশ্চয় চিনে নিতে পারতাম।"

রণেন বলিল, "ওটা কাজের কথা নয়, বেশ, শৈলেনবাবুকেই সাক্ষী মানা যাক্, উনি তো একসঙ্গেই থাকেন?···কি মশাই?"

মীরা মিনতির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দোহাই শৈলেনবাবু আপনি আবার 'নয়'কে 'হয়' করতে পারেন··

মীরার গানের কথা বোধ হয় পূর্বে একবার বলিয়া থাকিব—গলা খুব মিষ্ট তবে সুরজ্ঞানটা একটু কম। অথচ সেজন্য এসব ক্ষেত্রে ওকে বাঁচাইতে যাওয়াটাও ভাল দেখায় না। কি করিয়া সামলাইব ভাবিতেছি, মীরা নিজেই বলিল, "না, ওঁর সাক্ষী চলবে না,—অনিলা ওঁর সুখ্যেৎ করছে, সঙ্গে সঙ্গে উনি ওর সুখ্যেৎ করলেন, আমি করেছি, আমায়ও নিশ্চয় উনি বাড়াবেন।"

অনিলা বলিল, "বাঁচালে মীরা-দিদি।··এবার আপনারা মানুষটির স্বভাব টের পেলেন তো? যদি সুখ্যেৎ করলেন, অন্যায় সুখ্যেৎ ক'রে ফাঁপরে ফেলবেন··"

পাশের ভদ্রলোকটির অন্য কোন দিকে মন ছিল না, অনিলার আহারের দিকেই তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহ'লে আপনাকে আর এক প্লেট দই দিয়ে যাক্, ভালবাসেন বললেন ওটা···এই ওয়েটার!"

চাপা হাসিতে অনিলার মুখটা সিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েকজন প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি হল?"

চাপা হাসিতেই অনিলার শরীরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলাম, ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলাম, "গানের কণ্ঠের দরকার নেই বলে ওঁর কথা কওয়ার কণ্ঠও যেন অতিরিক্ত দই খাইয়ে রোধ করিয়ে দেবেন না!"

সকলের উচ্চকিত হাসিতে ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "না, না, উনি বললেন দইটা ভালবাসেন, তাই···"

বলিলাম, "ভালবাসাটাই বজায় থাকতে দিন না; একরাশ দই খাইয়ে গলা ভাঙিয়ে দইয়ের প্রতি জন্মের মত একটা আতঙ্ক দাঁড় করিয়ে দিয়ে কি হবে?"

হাসিটা গড়াইয়া চলিল।

ওয়েটার ট্রেতে কতকগুলো প্লেট লইয়া বাহির হইতেই ভদ্রলোক মোটা চশমার ভিতর দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, দরকার নাই··"

বলিলাম, "এ যে আরও নিদারুণ হ'য়ে উঠল মশায়!—সন্দেশের প্লেট নিয়ে আসছে—সবার জন্যে!"

আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমার এইটুকুই দরকার ছিল। আত্মসম্মান বাঁচাইতে বাধ্য হইয়া যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটুকু আনিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, সেটাকে বেশ ধুইয়া মুছিয়া অপসারিত করিয়া দিলাম।

আহারের শেষে গানও হইল কিছু কিছু। আমি খানিকটা এস্রাজ বাজাইলাম এবং শেষ পর্যন্ত নিশীথকে এতটা সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম যে, যাইবার সময় সেও শেক্‌হাণ্ড করিয়া বলিল, "আজকে আমার পার্টির সাক্‌সেস্ অনেকটাই আপনার উপর নির্ভর করল শৈলেনবাবু; থ্যাঙ্কস্।"

ভালই হইল। ওদের থেকে বিদায় লইতেছি, মুখে তবুও যে একটু মিষ্টস্বাদ লাগিয়া রহিল, এই ভাল।

৯

হ্যাঁ, ওদের মধ্যে থেকে এবার বিদায় লইতে হইবে।

রুচির এই পার্টিতে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—মীরা আমাদের উভয়ের ব্যবধানটা ভুলিতে পারে নাই। ওর দোষ দিই না, ভোলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

ধরা যাক, আজ অনিলা যেমন কৌশলে উহার পাশে আমায় বসাইয়া দিল, সেইরূপ যদি ব্যারিস্টার নীরেশ লাহিড়ীকে, কিংবা রণেনকে, কিংবা এমন কি নিশীথকেও বসাইয়া দিত, তাহা হইলে অবস্থাটা কি রকম হইত ?···মীরা লজ্জিত হইত, কিন্তু বিপর্যস্ত হইত না। অনিলাকে ধন্যবাদ দিই, একটা আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া সে আমার চোখ খুলিয়া দিল।

আজ অবশ্য মীরার নাসিকার সেই ঈষৎ কুঞ্চন ফুটে নাই ! না, ফুটে নাই ; আমি খুব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। হয় মীরা তাহার সেই মুদ্রাদোষটা একেবারেই দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে ; না হয় ইতিমধ্যেই আর একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। এত কটুতার মধ্যেও সে-কথা ভাবিতে সুখ।—মীরা বোধ হয় সত্যই আমায় ভালবাসে, ব্যক্তিগতভাবে, জীবনের সেই নিভৃতে যেখানে ও একা। নিশ্চয় ভালবাসে মীরা, ডায়মণ্ডহারবার রোডের সেই সন্ধ্যা তাহার সাক্ষী। কিন্তু সমাজগতভাবে—যেখানে ও রাজার দৌহিত্রী, ব্যারিস্টার-কন্যা, যে আসরে নবীন ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ডেপুটি, (অপদার্থ হইলেও) নিশীথের মত রাজরক্তের অধিকারী তাহার পাণিপ্রার্থী—সেখানে মীরা আমাকে লইয়া বিপর্যস্ত। ডেপুটি আর নিশীথের কথায় মনে পড়িয়া গেল—রাঁচি-প্রবাসে টের পাইলাম—কতক এদিক-ওদিক হইতে আর কতক নিজেই লক্ষ্য করিয়া, যে মীরা বেশ গা ঢালিয়া দিয়াই নিশীথের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছে—গল্পসল্প, বেড়ানো, পার্টি ! অবশ্য নিশীথের যা উগ্র আরাধনা, উপায়ও নাই বেচারির ;—একেবারে পরের জাহাজেই গ্লাসগো যাওয়া বন্ধ করিয়া ধর্না দিয়া পড়িয়া আছে !

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ডেপুটি রণেন যথাসাধ্য মীরার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে। মীরার দলের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য আমি যতটুকু ছিলাম সে যেন চেষ্টা করিয়াই আমায় দেখাইতে লাগিল যে, রণেন তাহার কাছে উৎসাহ পাইতেছে ; কিন্তু সেটা কিছু প্রমাণ নয়। আমার ঈর্ষা উদ্রেক করিয়া আমায় সতর্ক করাটাও তাহার একটা কারণ হইতে পারে। সত্যই যদি চাহিয়া থাকে মীরা আমায় তো এইটেই সম্ভব। এইটেই সম্ভব নিশ্চয়—মীরাকে কি এতই কম জানি যে, এ কথাটুকুও জোর করিয়া বলিতে পারি না ?

মীরাকে কিন্তু আমি জানাইয়া দিলাম যে ভাঙন ধরিয়াছে। মীরা-বোধ হয় নিজেই টের পাইল—যখনই আমি পাশে বসিতেই সে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বুঝিল যে আমি তাহার সংকোচের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও আমি বুঝাইয়া দিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় তরুকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। হুড জোনহা-প্রপাত, রাঁচি-হাজারিবাগ রোড, জগন্নাথপুরের মন্দির—সবই রহিল

পড়িয়া। অপর্ণা দেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন ; চলিয়া আসিলাম বলিয়া নয় চলিয়া আসার মূলের যে রহস্য থাকা সম্ভব তাহারই আশঙ্কায়।

সে-রাত্রিটা গাড়িতে যে কি ভাবে কাটিয়াছিল অন্তর্যামীই জানেন। সেকেণ্ড ক্লাসে দুইটি মানুষ, তরু আর আমি। তরু বিমর্ষ, তবুও একটু কথা চালাইবার চেষ্টা করিল। উত্তরের মধ্যে আমার মনের সন্ধান না পাইয়া চুপ করিয়া গেল। একটু পরে নিদ্রিতও হইয়া পড়িল। জাগিয়া রহিলাম আমি আর আমার চিন্তা। সমস্ত বুকটা যেন হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে। কী করিয়া বসিলাম! কেন হঠাৎ চলিয়া আসিলাম? এর দ্বারা জীবনে যে সবচেয়ে প্রিয় তাহাকে যে কি গুরু আঘাত দিয়া আসিলাম তাহা একবারও ভাবিলাম না ?··দূরত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা বক্ষের পিঞ্জরে ততই যেন আছাড় খাইতে লাগিল—নিজের অসহায়তায়। কাল রাত্রির পর থেকেই মীরার মুখ বিষণ্ণ ; যখনই জোর করিয়া প্রফুল্ল করিতে গিয়াছি, আরও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।···এর উপর আরও নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে আঘাত দিয়াছি। আজকের সকালের কথা মনে পড়ে। মীরা যেন অনেক সংকোচ কাটাইয়া কালকের রাত্রের কথাটা পাড়িল একবার, ইচ্ছা ছিল যদি সম্ভব হয় তো কালকের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিবে আমাদের জীবন হইতে। বলিল, "কাল শৈলেনবাবু নিশীথবাবুকে খুব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ; নেমন্তন্ন ডেকে কি অন্যায় ওঁর !···"

আমি একটুও চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, "কি করব বলুন? নিজের মর্যাদার ওপর চারদিক থেকে আঘাত পেয়ে আমার অতিথিধর্মের কথা ভুলে নিজেই ব্যবস্থা করতে হ'ল। আশা ছিল আমার তরফে একজনও উকিল পাব, তা···"

মীরার মুখের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে উবিয়া গেল। একটাও কথা আর বলিতে পারিল না সে। তাহার সেই নিষ্প্রভ মুখটাই শুধু মনে পড়িতেছে ; কতবার তাহার মুখখানি হাসিতে কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে মুখ মনে আনিতে পারিতেছি না। মীরা তাহার পর আর আমায় উৎকণ্ঠিত, উল্লসিত হইয়া কিছু বলে নাই। ও আমায় পাল্টা আঘাত করে নাই, ভালবাসিয়া বোধ হয় সে-ক্ষমতা হারাইয়াছে, অন্তত এখানকার মত হারাইয়াছে। ও নীরবে সহিয়া গেল, শুধু নিজের মর্যাদাকে আর আহত হইতে দিল না। সমস্ত দিনে আমাদের হাসিয়া কথাও হইয়াছে ; তরুর আব্দারে সকলে মোরাবাদী পাহাড়ে বেড়াইয়াও আসিলাম, মীরাও গেল, শুধু নিজে আর কোথাও যাইতে বলিল না— হাজারিবাগ রোড, জোনহা-প্রপাতে—কোথাও না। থাকিতে বলিল না, আসিয়াই চলিয়া যাইতেছি কেন, প্রশ্ন করিল না একবারও। সবই বুঝিল. কিন্তু একবার

আঘাত খাইয়া ও সমস্ত দিন যেন নিজের আহত মর্যাদাকে পঙ্কাবৃত করিয়া বাঁচাইয়া চলিল।

না, এত বড় অন্যায় করা চলিবে না মীরার ওপর। গিয়াই পত্র দিব মীরাকে—যে আঘাতটুকু দিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া। আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। কাজ নাই আমার কলেজের পার্সেণ্টেজে, পরীক্ষার কৃতিত্ব। এত সাধনায় যে-ধন লাভ করিলাম, এমনি করিয়া হেলায় হারাইব? থাক্ না মীরার একটু অবজ্ঞা, সব সহিয়া যদি ভালবাসিতে না পারিলাম তবে আমার ভালবাসা কিসের? মীরার রক্তের মধ্যে রহিয়াছে সাধারণের জন্য অবজ্ঞা, কি করিবে ও?—নিতান্ত নিরুপায় যে মীরা ওখানে। অপর্ণা দেবীর কথা মনে পড়িল—"ও মেয়ে ভাল শৈলেন···তোমাদের যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে মহত্ত্ব—সেখানে ওর চোখ গিয়ে পড়ে, কিন্তু মায়ের বংশের কোন্ যুগের রাজামহারাজারা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে···"

আমি ভালবাসিয়াও যদি ওর এ নিরুপায় দুর্বলতার কথা না বুঝি তো কে বুঝিবে? ভালবাসায় যদি অপরিসীম ক্ষমা রহিল না সরমার মত, যদি অন্ধতা রহিল না ইমানুলের মত, যদি উদ্দম আবেগ রহিল না ভূটানীর ছেলের মত, তবে কিসের ভালবাসা? ··হাসি পায়—আমি ইমানুলের প্রেমকে আমার গল্পে অভিনন্দিত করিয়াছি!—অপদার্থ সাহিত্যিক, জীবনে প্রেমকে করি পদে পদে অবমাননা, সাহিত্যে তাহাকে পরাই রাজমুকুট!

গাড়ির গতিবেগে বাতাসে একটানা হুঁহু শব্দ। জানালা দিয়া বাহিরে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছে। অনুভব করিতেছি—প্রতি মুহূর্তেই মীরা হইয়া যাইতেছে সুদূর।···এ-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নাই? ধরো যদি মীরার অভিমান না ঘোচে! মীরাকে যদি আর ফিরিয়া পাওয়া না-ই যায়! তাহার পরেও তো দিনের পর দিন জুড়িয়া কাটাইতে হইবে এই জীবনটাকে!

বাসায় আসিয়াই তরুকে মিস্টার রায়ের নিকট লইয়া গেলাম। তরু তাঁহাকে উৎফুল্লভাবে জড়াইয়া বলিল, "কি চমৎকার জায়গা বাবা, কি বলব তোমায়! আমি কিন্তু শীগগিরই আবার চলে যাব বাবা তা বলে দিচ্ছি···কী রোগা হ'য়ে গেছ বাবা তুমি!"

মিস্টার রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভেবেছিলাম, এইবার মোটা হব, মা এসেছে। তা তুমি তো আবার চলেই যাচ্ছ।"

তরু হাসিয়া বলিল, "তোমায় আবার মোটা ক'রে দিয়ে তবে যাব।"

মিস্টার রায়ও হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম, তাহ'লে বেশ দেরী ক'রে মোটা হব'খন, না হওয়া পর্যন্ত তো আর যেতে পারবে না?"

আমায় বলিলেন, "তুমি হঠাৎ ফিরে এলে শৈলেন ?"

উত্তর করিলাম, "ভাবলাম মিছিমিছি পার্সেণ্টেজ নষ্ট ক'রে"···

মিস্টার রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "Well, I clean forgot it (একেবারেই ভুলে বসে আছি); তোমার এক বন্ধু এসেছিল কাল। Let me see, ক্লীনারের হাতে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় রেখেছি দেখি দাঁড়াও।"

চিঠিটা বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার যাও তোমরা।···আর তরু, তুমি একটু জোর ক'রে লাগো ; you must soon decide whether it should be Loreto or লক্ষ্মী-পাঠশালা। (লরেটোতে পড়বে কি লক্ষ্মী-পাঠশালায়, শীগ্‌গির এবার ঠিক ক'রে ফেলতে হবে)।"

ওদের বাপে মেয়েতে ইংরেজী চলে মাঝে মাঝে। তরু যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, "I have already decided Daddy, if you come to that। (যদি তাই-ই ··বলো তো আমি মনস্থির ক'রেই ফেলেছি বাবা)।"

মিস্টার রায় কৌতুহলের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, "Well (অর্থাৎ) ?"

তরু হাসিয়া বলিল, "I would prefer লক্ষ্মী-পাঠশালা। (লক্ষ্মী-পাঠশালাই পছন্দ আমার)।"

মিস্টার রায় বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মুখটা লম্বা করিয়া লইলেন, বলিলেন, "As much as to say you prefer your mummy to your poor old dad (তার মানে তুমি বুড়ো বাপ-বেচারির চেয়ে মাকেই চাও বেশি) ? না, কখনো তোমার হাতে আর আমি মোটা হতে চাইব না, আড়ি তোমার সঙ্গে।"

পিঠে তুইটা আদরের চাপড় মারিয়া হাসিয়া বলিলেন,"Go and have a bath, look sharp, I will have it out with your mother (শীগ্‌গির গিয়ে এবার হাত-পা ধুয়ে ফেল, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করব)।"

ঘরে আসিয়া চিঠিটা খুলিলাম। অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—

"নিতান্ত জরুরী কাজ বলে ছুটে এসেছিলাম। চিঠিতে লেখবার নয় বলে কোন ইঙ্গিতও দিলাম না। রাঁচি থেকে এসেই চলে আসবি একবার ; নিশ্চয়।
—অনিল।

তখনই গিয়া মিস্টার রায়ের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আসিলাম।

১০

আমি যখন পৌঁছিলাম সন্ধ্যা হব-হব হইয়াছে। বাড়িতে কাহারও সাড়া নাই, ভিতরে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চিবুকটা চাপিয়া অনিল বুকের উপর পায়চারি করিতেছে। আমায় দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "শৈল বুঝি? আয়।"

কাছে আসিলে আমার মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "রাচি থেকে একটু বেশী তাড়াতাড়ি চলে এসেছিস্।"

বোধ হয় একটু জড়িত কণ্ঠেই বলিয়া থাকিব, "মিছিমিছি পার্সেণ্টেজটা নষ্ট করা···"

কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না, স্থির-দৃষ্টিতে আরও কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "এখানে অনেক ব্যাপার ঘটেছে এবং ঘটবে।"

আমার দৃষ্টিটা উৎসুক হইয়া উঠিল। অনিল বলিল, "এক নম্বর—বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়িটা হ'য়ে গেছে খালি।"

শঙ্কিত ভাবে একবার চারিদিক চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল বলিল, "অবশ্য অম্বুরী এণ্ড কোম্পানী কথকতা শুনতে গেছে, আটটা আন্দাজ ফিরবে; আমি বলছিলাম মার কথা—বুঝতে পারছি একা যদি মা না থাকে তো বাড়ি খালি হ'য়ে গেছে বেশ বলা চলে।"

আমি আরও শঙ্কিত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া ওর মুখের পানে বিমূঢ় ভাবে চাহিতেই বলিল, "না, অত দূর নয়,—মা কাশী-বাসিনী হয়েছেন। মামার একমাত্র ছেলে গেল মারা; বৈরাগ্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে কাশীবাসিনী হলেন। মার একমাত্র ছেলে রয়েছে বেঁচে, আতঙ্কে কাশীবাসিনী হলেন। অনেক বোঝালাম, কিন্তু ভাইপোর কীর্তিতে কি যে একটা অবিশ্বাস আমার ওপর হ'য়ে উঠল, কিছুতেই শুনলেন না। 'তোরা সব পারিস্, দাদার মত আমায়ও বুড়ো বয়সে দগ্ধাবার জন্যে আর বেঁধে রাখিস্‌নি, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শরণ নিচ্ছি, আর বাধা দিস্‌নি'—বলে জীবিত ছেলের শোকে চোখ মুছতে মুছতে ভাই আর ভাজের সঙ্গ নিলেন!···বাঙালী মায়ের প্রাণের একটা নতুন দিক দেখলাম, অদ্ভুত! কত গভীর স্নেহ হ'লে এ রকম অহেতুক আতঙ্ক হয় ভেবে দেখ দিকিনি!···যাক্ ভালই হয়েছে।"

বলিলাম, "বড় কষ্ট হবে, এই যা···"

অনিল বলিল, "বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হবার পর থেকে নিজের শরীর বলে

আলাদা কিছু থাকে না, সন্তান হবার পর একেবারেই না ; সুতরাং শরীরের কষ্ট ওদের কষ্টই নয়। বাঙালী জাতটা বোধ হয় অনেক বিষয়েই সবার চেয়ে ছোট, কিন্তু এদের স্ত্রী আর মা আর সব জাতের স্ত্রী আর মায়ের অনেক ওপরে। জাতটা এই জন্যেই বেঁচে আছে এখনও, শৈল।"

একটু চুপ করিয়া, অন্যমনস্কভাবে আরও কয়েকবার পায়চারি করিয়া বলিল, "দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, সদু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "আত্মহত্যা ! কেন ?"

"কেন !" বলিয়া অনিল একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "তুই দাঁড়িয়েই আছিস্ !" ভিতর থেকে একটা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দিয়া বলিল, "এই হ'ল যা ঘটেছে। যা ঘটবে তা এই যে, সদুকে আমি আমার নিজের বাড়িতে এনে রাখব ঠিক করেছি।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। না বলিয়া পারিলাম না, "তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে অনিল ?"

আমি বসি নাই, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম। অনিল ঠিক আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কতকটা ব্যঙ্গের হাসির সহিত বলিল, "আমি জানতাম ঠিক এই-ভাবে প্রশ্ন করবি। তুই হচ্ছিস্ আমাদের সমাজের প্রতীক শৈলেন ; সমাজের নিজের মাথার ঠিক নেই, যদি ঠাণ্ডা ক'রে কেউ সমস্যার সমাধান করে তো উল্টে বলবে তারই মাথা খারাপ হয়েছে। সদু মরতে বসেছে চারদিক দিয়ে, সমাজ ভ্রুক্ষেপও করবে না ; এখন আমি তাকে চারদিক থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি—বলবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমায় একঘরে ক'রে আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রে আমার চিকিৎসা করবে। এ-এক চমৎকার ব্যাপার, যতই ভাবি ততই আশ্চর্য বলে মনে হয় আমার। আইন, যেটাকে আমরা প্রাণহীন যন্ত্রের সামিল বলে ধরে নিই, সেটা পর্যন্ত সদুর মত হতভাগিনীকে মরতে দিতে রাজি নয়, মরতে চেষ্টা করছে খবর পেতেই দারোগা এসে তদন্ত ক'রে গেল, একটু লেখালেখি হাঁটাহাঁটি পড়ে গেল, বেশ টের পাওয়া গেল তার যান্ত্রিক বুকে একটা আঘাত লেগেছে। আর সমাজ, যাকে আমরা প্রাণবন্ত বলে মনে করি সে রইল একেবারে নির্বিকার। একবার কেউ ফিরেও দেখলে না।'

"ওরই মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হ'যে গিয়েছিল, তোকে না বলে থাকতে পারলাম না। তার পরদিন ছিল সাতকড়ি চাটুজ্জের ছেলের পৈতের নেমন্তন্ন। আমি যে-সারিটাতে বসেছি তার পেছনের সারিতে, আমার সঙ্গে প্রায় পিঠোপিঠি হয়ে বসেছে সনাতন চক্রবর্তী আর পুরুষোত্তম সার্বভৌম। দ্বিতীয়বার মাছ পরিবেশন

করতে এসেছে। শুনছি সার্বভৌম কি একটা চিবোতে চিবোতে বলছে—'মাছ তো পাতে রয়েছে প্রচুর, মুড়ো থাকে তো দিতে পারো একটা, একটার বেশি নয়, পরিপাক শক্তি আর সে-রকম নেই কি না।' চক্রবর্তী বললে, 'কাল দেখলে তো ব্যাপারটা পুরুষোত্তম?—একেবারে আত্মহত্যা!…। পুরুষোত্তম ঘেন্নায় আতঙ্কে এমন শিউরে উঠল যে, আমার পিঠটাতে পর্যন্ত ধাক্কা লেগে গেল। বললে, 'নারায়ণ! নারায়ণ!… তুমি এ-রকম একটা অশুচি প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আর অবসর পেলে না সনাতন? শাস্ত্র বলেছেন আত্মহত্যার কথায় শ্রুতি পর্যন্ত কলুষিত হ'য়ে যায়। শিব! শিব! নারায়ণ! নারায়ণ!' …এদের পাশে যে ব'সে আছি এতে আমার সমস্ত শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠল। মাথায় একটা দুষ্টবুদ্ধি এল। সার্বভৌম যেই 'নারায়ণ! নারায়ণ!' ক'রে উঠেছে, আমি আগে যেন কিছুই শুনিনি এই ভাবে 'কি হ'ল! কি হ'ল!'… বলে একেবারে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম! একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল, আর এ অবস্থায় যেমন হ'য়ে থাকে, আরও কয়েকজন আতঙ্কের মাথায় উঠে দাঁড়াল! সার্বভৌম মুড়োটা তুলতে যাচ্ছিল মুখে, হাঁ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, 'কি হ'ল?' সেরকম নৈরাশ্য আর নিষ্ফল ক্রোধের মূর্তি আর কখনও দেখিনি শৈল! কি আনন্দ যে হ'ল! বললাম, 'আপনি হঠাৎ 'নারায়ণ নারায়ণ' ক'রে উঠলেন, ভাবলাম মস্তবড় একটা ছোঁয়াছুঁতের ব্যাপার হ'য়ে গেছে বা অন্য রকম কিছু বিঘ্ন হয়েছে; পেছনে ফিরে আছি, দেখতে তো পাইনি, ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি; আর বসাটা শাস্ত্রসংগত হবে না বোধ হয়?'…সবারই খাওয়া গেল, কষ্ট হ'ল, একটা গোলোযোগও হ'ল খুব; কিন্তু একা সার্বভৌমের হাতের মুড়ো যে মুখে উঠতে পেল না সেই আনন্দে আমি আর কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না; মনে হ'ল সত্নর অপমানের তবুও টাটকা-টাটকি একটা প্রতিশোধ নিতে পারলাম। কিন্তু সে একটা সাময়িক ফুর্তি; নেহাত একটা সুবিধে হাতের কাছে এল, ছাড়লাম না। ওতে তো সত্নকে বাঁচাতে পারা যাবে না। একটা উপায় ছিল তোর হাতে; কিন্তু তোর যা চিঠি দেখলাম, তারপর আমার দ্বিতীয় চিঠির পরে তুই যেমন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলি তাতে বুঝলাম ও-গুড়ে বালি। তখন নিরুপায় হ'য়ে ভেবে ভেবে এই উপায় ঠাওরালাম, মানে সত্নকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসা। অম্বুরীকে পর্যন্ত রাজি করলাম, অবশ্য খুব সহজেই হ'ল, কেন-না যে-ব্যাপারে আমি রয়েছি তাতে অম্বুরীর নিজস্ব একটা মত থাকতে পারে, কিন্তু অমত নেই। অর্থাৎ কি ভাল কি মন্দ সে খুবই জানে, কিন্তু সবার ওপরে জানে স্বামী-দেবতার কথা।

"এখন তুই প্রশ্ন করবি, সবই যখন ঠিক তখন তোর কাছে আবার কি করতে ছুটেছিলাম। ছুটেছিলাম এই জন্যে যে, সমস্তটার যখন প্রায় জোট খুলে এনেছি মধ্যে

করলাম, তখন হঠাৎ দেখি সেটা আরও সাংঘাতিক রকম জটিল।...তুই দাঁড়িয়ে রইলি শৈল, বস্।"

অনিল নিজেও মাদুরটাতে বসিল। আমি বসিলে বলিল, "অম্বুরীর মত পাওয়ার পর, কিম্বা অম্বুরীর মুখে আমার মতের প্রতিধ্বনিটা শোনবার পর বাকি রইল খোদ সৌদামিনীর মত নেওয়া। তার সঙ্গে দেখা করলাম। কোথায়, কবে, কখন— —সে-কথা থাক্; এ তো আর কাব্য হচ্ছে না। সদুকে সব কথা বললাম। বললে, 'এটা তোমার সম্ভব বলে মনে হয় অনিল-দা?'...বললাম, 'অসম্ভব কিসে?' বললে, 'ভাগবত-কাকা ছাড়বে কেন? একটা কুকুরকে দু-মুঠো ভাত দিলে তার ওপর অধিকার জন্মে যায়।'...আমি বললাম, 'কিন্তু মানুষের ওপর জন্মায় না; তুমি সাবালিকা।'

"...সদু বললে, 'ও তো আইনের কথা: একই গ্রামে রয়েছি, ভাগবত-কাকার কাছ থেকে আইন কতদিন বাঁচাব? সমাজের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, সবার টিকি ভাগবত কাকার কাছে বাঁধা' টিঁকতে পারবে?'—বললাম, 'সে ঠিক করেছি; না পারি বাড়ি-ঘর-দোর বেচে চুঁচড়োয় গিয়েথাকব।'...সদু কাতরভাবে বললে 'অনিলদা আমার সবচেয়ে ভাবনার কথা কি জান? আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই; এই দশা হ'য়ে পর্যন্ত শুধু একটি দিন আমার মাথার ঠিক ছিল—যেদিন বিষ খাই। অনেক ভেবেচিন্তে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দেখলাম এ পৃথিবী থেকে যাওয়াই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু হ'ল না। তারপর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে দেখবার ক্ষমতা হারিয়েছি। এ অবস্থায় আমায় আর লোভ দেখিও না অনিলদা। তোমার বাড়ি আমার স্বর্গ, যে নরক যন্ত্রণায় ভুগছে তাকে যদি স্বর্গে ডাকা যায় সে কি বিচার ক'রে দেখতে পারে? তবে মোটামুটি বুঝছি কাজটা ভাল হবে না।'

"আমি অনেক ক'রে বোঝালাম; বললাম, বিপদ যদি থাকে তো আমারই; তা আমরা দু-জন যখন তার জন্যে তোয়ের রয়েছি, সদু অমত করে কেন? তার কলঙ্ক আছেই কপালে, আমার বাড়িতে থাকলেও, ভাগবতের বাড়িতে থাকলেও; তবে সে নিজে যদি এই জায়গায় অপবাদের মধ্যে কোন রকম তফাত না দেখে, আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস করে তো আমার কথাটা তোলাই ভুল হয়েছে।

"অবিশ্বাসের কথায় সদু একটা কাণ্ড ক'রে বসল। দু-হাতে আমার হাত দুটো খপ্ ক'রে ধরে নিলে। বললে, 'সেই সদুই আছে তোমার; ঈশ্বর সাক্ষী ছেলেবেলায় তোমাদের হুকুম করতাম, সেই অপরাধের এই রকম ক'রেই শোধ নেওয়ালেন ভগবান,—মেনে নিচ্ছি তোমার এ রোকম হুকুম অনিলদা। কবে আসছে বলছ, বলো। সত্যিই ভাগবত-কাকার নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছে না।

"সদু একেবারে ভেঙে পড়ল। আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে, আমার হাত দুটো নিজের মাথায় চেপে ফুলে ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলে। আমি কিছু বললাম না। মনটা হালকা হ'লে উঠে দাঁড়াল, আমার হাত দুটো ধরেই আছে। মিনতির স্বরে বললে, 'শুধু একটা কথা রেখ অনিলদা'...জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা?' সদুর চোখে আবার জল উপচে উঠল, বললে, 'অবিশ্বাসের কথা নয়, ধর্ম সাক্ষী। কিন্তু সদাীর জীবনে কখনও দুঃখের অভাব হয়নি, হবেও না, তাই, যদি কখনও এমনই হয় যে পোড়া প্রাণটাকে হিঁচড়ে বের ক'রে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় না থাকে তো বাধা দিও না, এখন থেকেই মিনতি ক'রে রাখলাম।'

"সদু আর এক চোট ভেঙে পড়ল!"

অনিল চুপ করিল। আলো জ্বালা হয় নাই, বাড়িতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল বলিয়া উঠিল, "কি বলিস্? সমস্যা নয়?"

বলিলাম, "সমস্যা বৈকি; মরণ যেন ওর জন্যে ওত পেতে বসে আছে।"

অনিল বলিল, "অথচ এই মরণের হাত থেকে ওকে বাঁচানো যায়; অব্যর্থ।"

আমার মনটা মথিত হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবে সদু ওর একারই চিন্তা? পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি? ওর একা সদু, আমার সদু আর মীরা—কর্তব্য আর ভালবাসা। আমার যন্ত্রণা অনিল বুঝিবে না, যতই বুদ্ধিমান হোক্ না কেন। আমি নীরব আছি দেখিয়া অনিল বলিল, "তাই তোর কাছে গেছলাম তাড়াতাড়ি শৈল। তোকে এক সময় বলেছিলাম চিঠি পেয়ে এবং না পেয়ে তোর মনের ভাব বুঝেছি, আর যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু দেখলাম সদুর সমস্যা আরও জটিল, আমি তাকে বাড়িতে ঠাঁই দিলেই মিটবে না। তাই ভাবলাম আর একবার বলে দেখি শৈলকে। অবশ্য সদুকে বলিনি এখনও, কিন্তু আমি ওর মন জানি। ইদানীং সদুর সঙ্গে কথাবার্তায় একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি শৈল, এ-সময় বলাটা ঠিক হবে না, ভাববি আমি তোর মন ঘোরাবার জন্যে করেছি, শৈল, এ-সময় বলাটা ঠিক হবে না, ভাববি আমি তোর মন ঘোরাবার জন্যে মিথ্যে রচনা ক'রে বলেছি; কিন্তু তবু বলি—সদু আমায় কখনও ভালবাসত না শৈল। যখন টের পেলাম, মনে একটা ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম ঐটেই ঠিক স্বাভাবিক। আমি সদুকে ভালবাসতাম, তুই ছিলি উদাসীন, সব মেয়েরই উমার অংশে জন্ম—উদাসীনের জন্যেই তাদের তপস্যা।"

আমার মনে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এ তত্ত্বটা আমিও টের পাইয়াছিলাম—অর্থাৎ আমার প্রতি সৌদামিনীর মনের ভাবটা। অনিলের উপর ওর সব-ঢালা

নির্ভর আর অপরিসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু অনিল যাহা আশা করিয়াছিল সদু তাহা দিতে পারে নাই, সে-জিনিসটা সদু আমায়ই দিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হইয়াছিল।

কিন্তু আমার নিজের কথা ?... মনে পড়িতেছে মীরার মুখখানি। বেশ বুঝিতেছি ঐ একখানি মুখ জীবনে ভালবাসিয়াছি, কামনা করিয়াছি, স্বপ্নমণ্ডিত করিয়াছি। আঘাত দিয়া আসিয়াছি ; স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপলক দৃষ্টিতে অপস্রিয়মান গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে মীরা। কি কঠিন, সমস্ত চিত্ত উদাস-করা বিদায় !

অপর দিকে ঐ ভালবাসার সামনে—চিত্তের ঐ বিলাসের তুলনায় সৌদামিনীর ব্যর্থ, বিপন্ন জীবন—রূঢ় কঠোর বাস্তব !

কি করি আমি ? এ কি অসহ্য অবস্থা !

আমি ব্যথিতভাবে অনিলের পানে চাহিয়া বলিলাম, "অনিল, আমি পারব না। উপায় নেই ; কিন্তু তবুও বলছি আমায় সাতটা দিন সময় দে ! পরশু একটা ব্যাপার হয়েছে যাতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যদি পারি তো জীবনে আর আমি হঠাৎ কিছু ক'রে বসব না। কিন্তু আমি করছি চেষ্টা। বোধ হয় তোর কথা রাখতে পারব না অনিল, এই রকম ভাবেই মনটাকে তোয়ের রাখিস্। সঠিক উত্তর এই সাতটা দিন পরে দোব।"

অন্য দিন হইলে বোধ হয় অনিলকে কথা দিয়াই দিতাম, ওরই প্রস্তাবে সায় দিতাম, সদুর মৃত্যুর সম্ভাবনাও তো কম ব্যাপার নয় একটা। কিন্তু মীরাকে আঘাত দিয়া আসিয়া বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অম্বুরী আসিল। বাড়িতে ঢুকিয়াই বলিল, "জ্বালোনি তো আলো ঘরে ? কি আলসে-কুড়ে মানুষ বাপু ! কোথাও গিয়ে যে একটু নিশ্চিন্তি..."

দু-জন দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, "অন্য কেউ না, শৈল এসেছে। তুমি যত মিষ্টি মিষ্টি শোনাবার শুনিয়ে যেতে পার, তোমার পতিভক্তির আসল রূপ জানাই আছে ওর।"

১১

পরদিন দুপুর বেলার কথা। অনিল আপিস গেছে। অম্বুরী খাওয়া-দাওয়া সারিয়া খুকীকে লইয়া পাড়ায় কাহার বাড়ি বেড়াইতে গেল। অম্বুরীর পুত্র একে বীর, তায় টাটকা কথকতা শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আমার মত আদর্শ শ্রোতা পাইয়াছে, জাপানী ভাঙা বন্দুকটা লইয়া হাত-পা নাড়িয়া আস্ফালন করিতেছে, "এবার যখন রাবণরাজা সীটাকে ঢরটে আসবে শৈল টাকা, আমি এই বণ্ডুক নিয়ে যাব,

ভশটা মুণ্ডু হওয়া বের ক'রে ডোব। টুমি এই ভাঙাটা সেরে ডিয়োটো শৈল টাকা।"

বলিলাম, "তার চেয়ে একটা নতুন কিনে দিলে কেমন হয়?"

সানু উল্লসিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বাইরের রকে আওয়াজ শোনা গেল, "বৌ আছিস্?" এবং সঙ্গে সঙ্গে সদু আসিয়া প্রবেশ করিল।

জানা থাকিলেও যেন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখিয়া অন্তরে চমকিয়া উঠিলাম। সিন্দুরহীন সীমন্ত, অধরে তাম্বুলরাগ নাই, বস্ত্রে পাড়ের স্নিগ্ধতা নাই, পায়ে আলতার চিহ্নমাত্র নাই;—একটা অশুভ শুভ্রতায় সদু আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। হঠাৎ যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম—কী রিক্ততাই আসিয়াছে ওর জীবনে।

ও-ই প্রথম কথা কহিল, "শৈলদা? কবে এলে?"

স্বপ্নোত্থিতের মত খানিকটা আবিষ্টভাবেই বলিলাম, "এই যে সদু—আমি কাল—হাঁ, ঠিক তো, কালই সন্ধ্যেয় এসেছি।"

"ভাল আছ তো?"—বলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে হুঁশ হইয়াছে।

সদু বলিল, "বৌ কোথায় গেল? তার কাছে এসেছিলাম, একটু দরকার ছিল।"

"ও!"—বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ভুলটা সংশোধন করিয়া সানু বলিল, "মা বেড়াটে গেছে···রাবণের গল্প শুনবে সডু পিসীমা?—টা-হলে শৈল টাকার কাছে বসো।"

সদু আমার পানে চাহিয়া বলিল, "না, রাবণের গল্প শুনলে চলবে না আমার, তোমার শৈল টাকাকে শোনাও।"

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে ছিল, সদুকে আটকান দরকার। সানুকে বলিলাম, "তুমি আরম্ভ তো ক'রে দাও, শুনলে কি যেতে পারবে তোমার পিসীমা?"

সদু হাসিয়া বলিল, "না, আরম্ভ ক'রে কাজ নেই সানু, শুনলে শেষকালে আবার যেতে পারব না! আমার কাজ আছে, অন্য দিন শুনব'খন।"

আমায় প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন থাকবে শৈলদা?"

বলিলাম, "না, আজই যাব।"

তাহার পর কথাটা আরম্ভ করিবার একটা সুবিধা পাইয়া বলিলাম, "ভয়ংকর দরকারী একটা কাজ আছে বলে অনিল ডেকে এনেছে।"—বলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে সদুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সদু ক্ষণমাত্র বিচলিত বা অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "ভয়ংকর কি এমন কাজ? আমি তো জানি সেইখানেই তুমি এমন ভয়ংকর কাজে থাক যে নড়বার ফুরসত থাকে না, দুনিয়ার কি হ'ল খোঁজ রাখতে পার না।···লুকুলে কি হবে?—আমি বৌয়ের কাছে সব শুনেছি"—বলিয়া সেই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু নামাইতে হইল। যখন

তুলিলাম তখন আমার চোখে জল ভরিয়া গেছে। বলিলাম, "সদু, মাফ ক'রো আমায়! আমি খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্যিই খোঁজ নেওয়া যাকে বলে তা হ'য়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত। আর এ অপরাধের জবাবদিহিও নেই কোন আমার কাছে।"

সদু বারান্দার দরজায় পিঠ দিয়া, দুইটা হাত দুয়ারের মাথার উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, "দেখ কাণ্ড! বেটাছেলের চোখে জল!···কি এমন হয়েছে আমার যে ···"আর অগ্রসর হইতে পারিল না; তাড়াতাড়ি হাত দুইটা নামাইয়া দুই হাতে আঁচল ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চাপা, নীরব কান্না, সামলাইতে পারিতেছে না, ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, সমস্ত শরীরটা এক-একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, অঞ্চলের আগল ঠেলিয়া ক্ষুব্ধ স্বর এক-একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

কিছু বলিলাম না। একটু কাঁদুক। সমস্ত পৃথিবীতে ওর কাঁদিবার জায়গা মাত্র দুইটি—এক অনিলের আর এক আমার সামনে। এত বড় কথাটা ভুলিয়া ছিলাম কি করিয়া? কাঁদুক, বুকে যে পাষাণভার রহিয়াছে, অশ্রু-স্রোতে তাহার এককণাও যদি ক্ষয় করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে।

সদু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আঁচলটা সরাইয়া লইল; দোরে ঠেস দিয়া মুখটা বাহিরের দিকে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক-একবার সমস্ত শরীরটা সঘন বিক্ষোভে কাঁপিয় উঠিতেছে। সদু শোকের উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে। যাইতেও পা উঠিতেছে না।

সান্থ হতভম্ব হইয়া মুখ নীচু করিয়া ভাঙা বন্দুকটা নাড়াচাড়া করিতেছে, এক-একবার চক্ষুপল্লব তুলিয়া আমাকে আর সদুকে দেখিয়া লইতেছে।

একটু পরে একবার কোনরকমে আমার মুখের পানে চাহিয়া সদু বলিল, "এখন যাই শৈলদা।"

পা বাড়াইতে আমি বলিলাম, "একটু দাঁড়াও সদু।"

মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দু-জনে, তাহার পরে আমি বলিলাম, "অনিলের কাছে সব শুনলাম সদু,— তুমি এখানে আসবে শুনে ··"

সদু বাধা দিয়া বলিল, "না, আসছি না শৈলদা, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম বৌকে।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "আসছ না!—কেন?"

সৌদামিনীর মুখটা যেন একটা মাত্র ভাব-ফোটানো পাথরের মূর্তির মত কঠিন

হইয়া উঠিল, "কেন আসব শৈলদা? আমার দুখে অনিলদা 'আহা' বলতে গেছেন বলে এই প্রতিদান দোব আমি? ওঁর সর্বনাশ করব, ওঁর স্ত্রীর সর্বনাশ করব, ওঁর সন্তানদের কপালে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে বংশটাকে চিরকালের জন্য দাগী ক'রে দোব? আমি যে এক সময় এটা ভাবতে পেরেছিলাম কি ক'রে, অনিলদার কথায় কি ক'রে 'হাঁ' বলতে পারলাম, তাই ভেবে সারা হচ্ছি।...আমার দোষ নেই শৈলদা, আমি অনিলদাকে বলেইছিলাম আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে কাজ করবার, ভেবে কথা বলবার শক্তি আমি হারিয়েছি।...কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ফেরবার পর আমি স্থির মনে কথাটা ভেবে দেখেছি, যতই ভেবেছি ততই আশ্চর্য হয়েছি—ওঁর এতবড় সর্বনাশ আমি কি ক'রে করতে যাচ্ছিলাম! আমি তাই ছুটে এসেছি এই অসময়ে, যতক্ষণ না বৌকে বলতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে একটু শান্তি নেই শৈলদা। বৌ জানে কথাটা, দু-জনে মিলে আমায় দিয়ে এই পাপটা করাতে বসেছিল। আশ্চর্য!—ওদের দু-জনকে কি এক ধাতুতে গড়েছিলেন বিধাতা? বৌ মেয়েছেলে, একটু পরামর্শ দিতে পারলে না অনিলদাকে? আর কিছু না হোক্ নিজের স্বার্থটাও তো দেখা উচিত ছিল। বুঝলাম ও নিজের স্বামীকে খুব ভাল ক'রে চেনে, সেদিক দিয়ে ভয় নেই ওর, কিন্তু স্ত্রীর ঈর্ষা বলে তো একটা জিনিস থাকতে হয়? ওর তাও নেই?—ও একেবারে সব ধুয়ে মুছে বসে আছে?'

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "বেশ, এলে না, তারপর?"

সদু বলিল, "এর আর তারপর নেই শৈলদা। না-আসা মানে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া। ভেবে দেখলাম সেইটেই মানুষের স্বধর্ম;—এই নিজের অদৃষ্টকে চিনে তাকে মেনে। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার জীবনের গতি কোন্ দিকে। যার এই রকম বিয়ে, এই রকম বিধবা হওয়া, এই রকম ভাবে চিরজন্ম এমন একজনের অন্নদাসী হ'য়ে থাকা যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই—তাকে ভগবান কিসের জন্যে সৃষ্টি করেছেন সে তো স্পষ্ট। ভাগবত-কাকা সময় সময় আমাকে গীতা, ভাগবত—এই সব থেকে শ্লোক শোনান—হ্যাঁ, ঠিক কথা, মন্ত্রও দিয়েছেন আমায়।—তুমি আশ্চর্য হচ্ছ?—বলিদানের পাঁঠার কানে পুরুত মন্ত্র দিয়ে দেয় না? তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শ্লোক হচ্ছে—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। আজ সাত-বছর ধ'রে এই মারাত্মক শ্লোকটার বিরুদ্ধে লড়েছি শৈলদা, কিন্তু আর না, এবার হৃষীকেশ আর তাঁর ভক্তেরই শরণ নোব ঠিক করেছি। ভেবে দেখলাম অনিলদার মত মানুষকে ধ্বংস করার চেয়ে সে ঢের ভাল। কেন-না এই আমার স্বধর্ম, আর গীতা বোধ হয় একেই 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' বলে প্রশংসা করেছেন। সত্যিই তো—সব রকমে মরাই যদি আমার স্বধর্ম হয় তো আমিই মরব—একজন; অনিলদা মরবে কেন?

বৌ মরবে কেন, আর সবচেয়ে—ঐ দুগ্ধপোষ্য শিশু—ও কি করেছে যে······”

সত্ন আর পারিল না। মুখটা বাহিরের দিকে ঘুরাইয়া লইল। দেখিতেছি কান্না চাপিবার জন্য নীচের ঠোঁটটাকে এক-একবার নিষ্ঠুরভাবে কামড়াইয়া ধরিয়েছে। আর পারিল না;—অস্বস্তির মাঝে পড়িয়া সান্থু চোরের মত নামিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বুকে চাপিয়া উদ্বেলিত কান্নার মাঝে বলিয়া উঠিল, “আমার কি দশা হবে সান্থু?·· ওঃ, বাবা গো, আর সহ্য হয় না কষ্ট!”

সান্থুকে বুকে চাপিয়া কপালটা কপাটে লাগাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে এক অসহ্য দৃশ্য,—পাষাণও বোধ হয় গলিয়া যায়; আমার সমস্ত শরীর-মন চাপিয়া যেন একটা জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে। একটা সর্বব্যাপী বিরাট দুঃখের উচ্ছ্বাস যাহা আর সব থেকেই যেন আমায় বহু উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে—ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র ভালবাসা, ক্ষুদ্র বিচার-কল্পনা, সব থেকেই। আমি আর থাকিতে পারিলাম না; উঠিয়া গিয়া সত্নর পাশে দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিলাম, “অত নিরাশ হ'য়ো না সত্ন, আরও একটা উপায় আছে।”

কোন উত্তর হইল না, সহানুভূতির কথায় কান্নাটা শুধু আরও বাড়িয়া গেল।

একটু চুপ করিয়া আবার বলিলাম, “আরও একটা উপায় আছে সত্ন, একেবারেই উপায়হীন করেন না ভগবান।”

সৌদামিনী ধীরে ধীরে মুখটা তুলিতে যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া নামাইয়া লইল, প্রশ্ন করিল, “কি?”

কি ভাবে যে বলিব কথাটা প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না; তাহার পর নিজের মনটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, “তোমায় আর আমায় নিয়ে কথা সত্ন, অবশ্য ধর্ম থাকবেন মাঝখানে।”

সত্ন কোন উত্তর দিল না। সান্থুকে বুকে লইয়া, কপাটলগ্ন করতলে কপাল দিয়া তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না; শুধু একটু পরে বুঝিতে পারিলাম অশ্রুধারা আরো প্রবলতর হইয়া নামিয়াছে।

বলিলাম, “থাক্ সত্ন, ভেবে দেখ, তোমার উত্তরের জন্যে না হয় আর একদিন আসব শীগ্‌গির।”

আর একদিন থাকিয়া গেলাম। পরদিন অনিল আহার করিয়া আপিসে বাহির হইয়া গেলে, অম্বুরী আমার সামনে আসিয়া জানালার খিলানের নীচে বসিল, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, “সব শুনেছ তো ঠাকুরপো?—কি হবে?”

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চেহারাটা হইয়া পড়িল ভীত-ত্রস্ত হরিণীর মত। বুঝিলাম এই ওর এখনকার আসল চেহারা, যদিও অনিলের যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও

ছিল সেই চিরকালের হাস্যমুখরা অম্বুরী। এই এক নারী যে উদয়াস্ত অভিনয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। আমি জানি অম্বুরীর এ কাজ নয়, এত বড় স্বার্থত্যাগ ওর দ্বারা সম্ভব নয়। যে একটা বড় স্বার্থত্যাগ করিবে তাহার তেমনই বড় একটা পৃথক সত্তা থাকা দরকার। সে সত্তা অম্বুরীর কোথায়?

একটা উপায় ঠাহর করিয়াছি বলিয়াই একটা পরিহাস করিলাম, বলিলাম, "বাঃ, এই শুনলাম তুমি নিজেই একটি সতীনের জন্যে…"

অম্বুরী অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা রাখো, ঠাট্টার ঢের সময় আছে ঠাকুরপো। ওঁকে যদি বাঁচাতে না পারে তো সদু-ঠাকুরঝি যে পথ ধরেছিল আমিও সেই পথ ধরব ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

অম্বুরীর চেহারা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলাম। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলাম, "বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে অম্বুরী। তাহলে তুমি রাজি হ'লে কেন সদুকে জায়গা দিতে?

অম্বুরী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, বলিল, "কিছু শুনব না। ওঁকে বাঁচাও, নইলে ঐ কথা;—অম্বুরীকে তোমরা আর বেশি দিন পাবে না।"

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। অম্বুরীর রাজি হওয়ার অন্তরালে এই সঙ্কল্প। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, "উপায় একটা ঠাউরেছি অম্বুরী।"

অম্বুরী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কি, বলো!"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "ও বুঝেছি, উনি বলেছিলেন বটে একবার।"

তাহার পর আমার উপর স্থিরভাবে চাহিয়া বলিল, "না, সেও হবে না; বংশে একটা দাগ লাগাবে ওর জন্যে?"

ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম, "তাহ'লে সৌদামিনী যায় কোথায়?"

অম্বুরী দৃঢ় অথচ অনায়াসকণ্ঠে বলিল, "ঢের পথ আছে; একবার ফিরে আসতে হয়েছে বলে বার বারই কিছু ফিরতে হবে না।"

অম্বুরীর উপর রাগ করিতে পারিলাম না। সংস্কারের ডেলা বাঙালী ঘরের আদর্শ গৃহস্থ বধূ,—কিন্তু সেই সংস্কার একদিকে যেমন ওর অন্তরে স্বর্গের অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, অন্য দিকে দুর্বলও তো করিয়াছে, তেমনই!

জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসা অম্বুরীর মত মেয়েই পারে দিতে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অম্বুরী শৃঙ্খল, ওর কাছে কর্মের মুক্তি নাই, এমন কি চিন্তারও মুক্তি নাই।

১২

আমি আর একটা দিন যে থাকিয়া গেলাম সে এক প্রকার আলস্যভরেই এবং অন্যায়।

ভাবেও,—কেন-না তরু রহিয়াছে, আর আমারই উপর এখন তাহার সম্পূর্ণ ভার।

শরীর-মন কি রকম এলাইয়া পড়িয়াছে, কলিকাতার কোন আকর্ষণ অনুভব করিতেছি না। নিছক কর্তব্যজ্ঞানই সব সময় জীবনকে সচল করিতে পারে না, আরও কিছু চাই।

পরদিন একটা সুযোগে অনিলকে সব কথা বলিলাম, অবশ্য অম্বুরীর কথাটা বাদ দিয়া। অনিল প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না, ক্রমে তাহার মুখটা ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওর স্বভাবের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই বড় একটা, শান্তকণ্ঠেই বলিল, "তুই যে কি স্বার্থত্যাগ করলি, যার জন্যে করা সেও বোধ হয় কখনও জানতে পারবে না, তবু পৃথিবীতে অন্তত একজনের জানা রইল, আর জানলেন ভগবান। লোকে যে কথা যত কম জানতে পারে তাঁর কাছে সে কথা তত বেশি ক'রে পৌঁছোয় শৈল।"

জীবনে এক-একটা কেমন অদ্ভুত ঘটনাসাদৃশ্য আসে! চারিদিন পূর্বে কলিকাতা অভিমুখী গাড়িতে বসিয়া আমি যে ধরনের চিন্তা করিতেছিলাম, চারিদিন পরে কলিকাতা অভিমুখী আর একখানি গাড়িতে, সন্ধ্যায়ই, আবার সেই ধরনের চিন্তা। কিন্তু দুইদিনের চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে যেটুকু পার্থক্য সেইটেই বেশি অদ্ভুত। সেদিন ছিল মীরা, আর আজ, এই চারিদিনের ব্যবধানে তাহার জায়গা লইয়াছে সৌদামিনী। সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মীরার কাছে ক্ষমা চাহিব, আজকের প্রতিজ্ঞা সদুকে উদ্ধার করিতেই হইবে—যাহার অর্থ হয় মীরাকে ভোলা। মানুষের কত দম্ভের প্রতিজ্ঞা!

বাসায় আসিতেই প্রথমে তরুর সঙ্গে দেখা। আনন্দের চোটে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "মাস্টারমশাই, কে আজকে এসেছেন বলুন তো, বুঝব বাহাদুর।"

বাহিরের কাহারও এখানে আসা যাওয়া খুবই কম, বিশেষ করিয়া আজকাল, যখন অপর্ণা দেবী, মীরা কেহই নাই। আন্দাজ করিতেছিলাম, তরুর আর ধৈর্য রহিল না, বলিল, "মা, দিদি!—একটুও ভাবতে পেরেছিলেন এত শীগ্‌গির আসবেন? সকালে উঠে পাঠশালায় বেরুব, হঠাৎ ট্যাক্সিতে ক'রে মা, দিদি, রাজু, মদন! ছুটে গিয়ে বাবাকে…"

কথার মধ্যেই আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তরু থামিয়া গেল। আমারও হুঁশ হইল; তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হঠাৎ যে চলে এলেন! শরীর ভাল আছে তো তরু?"

তরু আশ্বস্ত হইল, বলিল, "শরীরে কি হবে?—এই তো, পরশু আমরা এলাম; মা বললেন, তুই চলে আসতে একেবারে মন টেঁকছিল না তরু তাই…"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "আর তোমার দিদি,—তিনি কি বললেন ?"

তরু বলিল, "অত জিজ্ঞেস করতে যাইনি আমি। এলেন চলে, কেমন আমোদ হবে তা নয় কেন এলে, কি করতে এলে—এই ক'রে তাকে উস্তমখুস্তম ক'রে তাড়াই ···মাস্টারমশাই যেন কী !"

রাগের ভান করিতে গিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল।

মীরার সঙ্গে দেখা হইল। এই দুইটি দিনে কত পরিবর্তন! মীরা রাঁচিতে স্বাস্থ্যের যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল সব যেন দিযা আসিয়াছে, বরং তাহার পূর্ব স্বাস্থ্য থেকে কিছু লইয়া। মুখে একটা আকুল, সশঙ্ক ভাব, খুব চাপা মেযে, তবু সেটা খুব প্রকট। নিজেই বলিল, "চলে এলাম। তরু চলে আসতে বাড়িতে যেন ফাঁকা ঠেকতে লাগল ; এমন জানলে তরুকে আসতে দিতাম না।"

মুখের ভাবটা একটু অপ্রতিভ ; বক্তা আর শ্রোতা দু-জনেই যখন ভিতরে ভিতরে জানে যে একটা মিথ্যা কথা বলা হইতেছে, সেই সময় বক্তার মুখের ভাবটা যেমন হয় আরকি।

মানানসই কিছু মুখে জোগাইল না, বলিলাম, "একটু তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল যেন !"

"তা গেল।"—বলিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মীরা চলিয়া গেল।

যাহা হউক প্রথম দেখা হওয়ার সংকোচটা কাটিল এক রকম করিয়া।

কিন্তু তাহার পর দিন-দিনই জীবন হইয়া উঠিতে লাগিল দুর্বহ। সমস্ত রাখিতে হইতেছে,···মেলামেশা, হাসি-আলাপ, কিন্তু প্রাণহীন পরিশ্রম একটা ; যেন তীব্র স্রোত আর প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে গুণ টানিয়া একটা নৌকা বাহিয়া চলিয়াছি। মীরার মুখেও সেই ক্লান্তি আর অবসাদ।

তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছি, বরং অনুভব করিতেছি বলা চলে. কেন-না মীরা যাহা ভাবে তাহা লক্ষ্যের বাহিরে রাখে ;—অনুভব করিতেছি মীরা কিছু যেন বলিতে চায়। সুবিধা খুঁজিতেছে, কিন্তু চায় না এবার সুবিধাটা আমি সৃষ্টি করি—আমি একটু অগ্রসর হই, তাহা হইলে মীরা বলিবে কিছু।

কিন্তু আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বেশ বুঝিতেছি দুইজনের মধ্যেই একটা ভ্রান্তি আছে কোথাও, দুইটা কথাতেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু তবুও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সৌদামিনী হইয়াছে বাধা, আমার পায়ের নিগড়।

ভাবি—কর্তব্যের গুরুভার লইয়াছি মাথায় তুলিয়া ; আমার জীবনে প্রেমের হইয়াছে অবসান। যাহাকে বিদায় দিলাম আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া বিড়ম্বিত করি কেন ?

শুধু এইটুকু নয়। আমার ক্ষুণ্ন আত্মাভিমানও বিদ্রোহী হইয়া উঠে এক-একবার। ভাবি, আমার তো সবই আছে; মীরার স্বয়ংবর-সভায় নিজেকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি মাত্র অর্থে আমি বড় নই এই অপরাধে মীরার ভালবাসাও শুদ্ধভাবে আমায় স্পর্শ করিবে না?—তাহাতে থাকিবে ঘৃণার খাদ মেশানো?—সমাজে সে আমায় লইয়া পড়িবে লজ্জায়?

তাহার চেয়ে আসুক সৌদামিনী। ও আমায় ভালবাসিবে ভালবাসার পূর্ণ নির্মলতায়, যেমন মঞ্জরী ভালবাসে অনিলকে—একেবারে আত্মবিলোপ। হয়তো ওকে আমিও একদিন প্রতিদান দিতে পারিব; আজ যাহা মাত্র করুণার আকারে দেখা দিয়াছে, আজ যেটাকে বলিতেছি সহানুভূতি, কাল তাহাই বোধ হয় অনাবিল প্রেম হইয়া ফুটিয়া উঠিবে,—কে জানে? কতটুকুই বা তফাত এ-দুয়ের মধ্যে?.. সদুর সঙ্গে সাক্ষাতে আরও একটা নূতন জিনিসের সন্ধান পাইলাম। প্রথমবারের কথাবার্তার বাঁধুনি আর এবারের কথাবার্তার বাঁধুনির মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রথম বারের লঘুভাবের কথাবার্তায় আত্মগোপন করিতে পারিয়াছিল, এবারে ভাবের উচ্ছ্বাসে পারে নাই। দেখিলাম ওর বলার ভঙ্গি, ওর ভাব, ওর আদর্শ, সবই উচ্চ-স্তরের। অনিল বলিয়াছিল সদু দুর্লভ নারী-রত্ন, গলার হার করিয়া পরিবার জিনিস। তা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

এক-এক সময় আবার সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ছিন্ন করিয়া, অন্তরের সমস্তটা পূর্ণ করিয়া দাঁড়ায় মীরা, হৃদয়ের অধীশ্বরীর বেশে। বুঝি, একমাত্র ওকেই চাহিয়াছি জীবনে। যেমন প্রীতি দিয়া, তেমনি ঘৃণা দিয়া ও আমার প্রেমকে উদ্রিক্ত করিয়াছে।...বিস্মিত প্রশ্ন হইবে—ঘৃণা আবার ভালবাসা জাগায়? ..হ্যাঁ, নারীর ঘৃণা ভালবাসাই জাগায়, কয়লার তীব্র চাপে মনের খনিতে হীরাই উৎপন্ন হয়। এ-তত্ত্ব অবশ্য আপনাদের জানিবার কথা নয়। সাধ্বী চরণে বঙ্গললনার প্রীতি-অর্ঘ্যই পাইয়া আসিয়াছেন বরাবর।...কী অসহ্য অবস্থা!—দেবতার মত সর্বক্ষণ পূজার পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান! অহরহ সেই একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি শুনিতে থাকা!

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম। হ্যাঁ, মীরা যেন চায় আমি ওকে একটু সুবিধা করিয়া দিই, এক সময় ও যেমন আমায় সুবিধা করিয়া দিয়াছিল ডায়মণ্ড হারবার রোডে। আমি একটু সুবিধা করিয়া দিলেই ও যেন আমায় কি বলিবে।

কিন্তু মনের এই নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমি আর তার সুযোগ দিতেছি না, বরং সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেছি।

এই অবস্থা চলিয়াছে দিনের পর দিন ধরিয়া।

সাঁতরা হইতে আসিবার পরদিন সকালেই অপর্ণা দেবী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বলিলেন, "কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। যাঁচিতে শেষ দিকটা তোমায় খারাপই দেখলাম কি না। হঠাৎ চলে এলে, কিছু দেখলে না, শুনলে না···"

কিছু সন্ধান করিতেছেন এইভাবে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার সেই এক কথা—নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, "ভাবলাম—মিছিমিছি কলেজের পার্সেন্টেজটা নষ্ট করব···"

বলিলেন "হ্যাঁ, সেকথা ঠিকই।" কিন্তু বেশ বুঝিলাম কথাটা বিশ্বাস করিলেন না, অবশ্য আশাও করি নাই যে বিশ্বাস করিবেন।

খানিকটা এদিক-ওদিক কথার পর সহসা প্রশ্ন করিলেন. "হ্যাঁ, মীরা হঠাৎ চলে এল কেন? জান তার কারণ?"

উনি উত্তর চাহেন নাই, আশাও করেন নাই, শুধু আমার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবার জন্য প্রশ্নটা হঠাৎ করিলেন; করিয়াই নিজে হইতেই বলিলেন. "আর জানবেই বা কোথা থেকে তুমি?"

আমি অস্বস্তির ভাবটা কাটাইবার জন্যই বলিলাম, "আমায় তো বললেন—তরু চলে আসতে···"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "সে তো আমায়ও বলেছিল।···তাই হবে বোধ হয়।"

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

অন্যান্য কিছু কথার পর উঠিয়া আসিলাম। আসিবার সময় একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এল।

মিস্টার রায়ও জানেন। শুধু জানা নয়, তিনি ভাঙাটা জোড়া দেওয়ার জন্যও বোধ হয় সচেষ্ট।

তরু আমায় বলিল. "আপনার বিলেতে যাওয়া এক রকম ঠিক মাস্টার মশাই।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে টের পেলে।"

"বাবা আজ দিদিকে বলছিলেন কিনা, আমিও ছিলাম সেখানে। বলছিলেন, এম-এ-টা দিয়েই আপনি বিলেত চলে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়তে। বললেন···আপনার সঙ্গে নাকি কথাও ঠিক হ'য়ে গেছে বাবার।"

বুঝিলাম যাহাতে স্থায়িভাবে একটা বিপর্যয় না ঘটে আমাদের মধ্যে, সেই জন্য মিস্টার রায় কন্যার সম্মুখে আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রটি খুলিয়া ধরিয়াছেন। হাসিও পাইল একটু; ভাবিলাম যৌবন গেলে যৌবনের সব কথাই কি ভোলে মানুষে? যশ-প্রতিষ্ঠার কল্পিত বাঁধ দিয়া প্রাণের ভাঙন রোধ করিতে যাওয়া!

আপনা হইতেই একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল, "তোমার দিদি কি বললেন?"

তরু উত্তর করিল, "বললেন—বেশ তো বাবা।"

একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া তরু আমার মুখের পানে চাহিল।

সেদিন রাত্রে পড়িতে পড়িতে তরু বারকতক চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছেন বোধ হয় মাস্টারমশাই?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা?"

"রণেনদা আসছেন যে!—রাঁচির রণেনদা, মনে আছে বোধ হয়?"

ভাবটা এমন দেখাইল যেন আচমকা মনে পড়িয়া গেছে, কিন্তু বেশ বুঝিলাম ও অনেকক্ষণ থেকেই কথাটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, শুধু মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম, "বেশ ভাল কথা। আলাপ করা যাবে, সেখানে ভাল ক'রে আলাপ হয়নি। কবে আসবেন?"

তরু আমার মুখের উপর আর একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু নামাইয়া বলিল, "আসছেন রবিবার দিন; আজ বিকেলে টেলিগ্রাম এল। মা বলে দিয়েছেন কিনা কলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা করতে।"

আবার ক্ষণিকের জন্য চক্ষু তুলিয়া বলিল, "দিদিও বলে দিয়েছিলেন।"

বিকাল থেকেই কেমন একটা গুমট গরম, অকস্মাৎ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উঠিয়া গিয়া জানালার সামনে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি। সন্ধ্যার আকাশে গুটি তিন-চার তারা ছিল, দিকরেখার উপর আর একটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, নিরভিনিবেশ পাঠের গুন্‌গুনানির মধ্যে তরু একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা মাস্টারমশাই, ব্যারিস্টার ভাল, না ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট?"

কষ্টও হয়, হাসিও পায়,—বেচারি তরুর মনে পর্যন্ত উদ্বেগের ছোঁয়াচ! কি উত্তর দেওয়া যায়? ব্যারিস্টারকে, অর্থাৎ ভাবী ব্যারিস্টার শৈলেন মুখার্জিকে ডেপুটি রণেন চৌধুরীর কাছে খুব ছোট করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু স্বয়ং তরুর পিতাই ব্যারিস্টার, পেশাটাকে খেলো করা যায় না! মাঝামাঝি একটা উত্তর দিলাম, "ব্যারিস্টার অবশ্য স্বাধীন ব্যবসা, তার কথাই নেই, তবে ডেপুটিরাও শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে একটা জেলার মালিক হ'য়ে বসতে পারে!"

উত্তরের জন্য যে তরুর বিশেষ কৌতূহল ছিল এমন নয়। বইয়ের উপর মাথাটা ঝুঁকাইয়া দিয়া বলিল, "হোকগে মালিক; আমি এখন গ্রামারটা আগে সেরে নিই। এত ক'রে পড়া দিয়ে দেয় নতুন সিস্টার!"

গুন্‌গুনানি আরম্ভ করিয়া দিল।

১৩

একটা কিছু হোক্, আর যেন সয় না। হয় একেবারে ভাঙনই, নয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলিয়া সুনিবিড় বাঁধন চিরদিনের জন্য। মীরা কি বলিবে বলুক, দিব সুযোগ।

কিন্তু কি করিয়া?

মীরা নিজেই আবার সুযোগের উদ্‌যোগ করিল।

সেদিন বিকাল বেলায় আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি। হেমন্ত-দিন-শেষের তামাটে রোদ সামনের গাছপালা রাস্তা-বাড়ির উপর পড়িয়াছে, বেশ একটা সুস্থ ভাব জাগায় না মনে। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা যাওয়া-আসা করিতেছে, কোনটাই স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

নিশীথ তাহার নূতন মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমায় দেখিয়া কি ভাবিল বলিতে পারি না, তবে বাহিরে বাহিরে রাঁচিতে সেই বিদায়ের সময়ের ভাবটা বজায় রাখিল। "হ্যাল্লো, মিস্টার মুখার্জী, কি রকম আছেন?"—বলিয়া হাতটা বাড়াইয়া ডানদিকে একটু ঝুঁকিয়া বিলাতী কায়দায় অগ্রসর হইয়া আসিল। আমিও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, ভালই, ধন্যবাদ, আপনি কি রকম ছিলেন? আপনিও হঠাৎ চলে এলেন দেখছি!"

নিশীথ টুপিটা হ্যাটস্ট্যাণ্ডে টাঙাইয়া দিয়া একটু কুশন-চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল, "থেকেই যেতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম ওদিকে আবার বেজায় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।"

'ওদিকে' মানে অবশ্য ওর সেই 'পরের জাহাজেই গ্লাস্‌গো যাত্রা'। বলিলাম, "হ্যাঁ, তা হ'য়ে যাচ্ছে বটে।"

নিশীথ বলিল, "মিস্ রায় বাড়িতে আছেন নাকি?"

কব্জিটা উটাইয়া হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "বাই জোভ্, সাড়ে পাঁচটা হ'য়ে গেল!"

বলিলাম, 'বাড়িতেই আছেন বোধ হয়, বাইরে তো কই যেতে দেখিনি!"

রাজু বেয়ারা যাইতেছিল, ডাকিয়া মীরাকে খবর দিতে বলিলাম।

খুব প্রফুল্ল নিশীথ।—সেই লোকের মত, যে নিজের মনে বিশ্বাস করে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া বিজয় লাভ করিবেই। সত্য হোক, মিথ্যা হোক এই আত্ম-প্রত্যয়ের জোরেই ও আমায় ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে। বিজয় যখন প্রত্যক্ষ—অন্তত যখন ভাবা যায় যে প্রত্যক্ষ—তখন উদারতা আসে না খানিকটা?

কেমন একটা ছেলেমানুষি লোভ হইল—একবার রণেন চৌধুরীর আসিবার কথাটা জানাইয়া দিই। দিলাম না কিন্তু, ভাবিলাম, যে যতটুকু নিজের মনগড়া স্বর্গে কাটাইতে পারে কাটাক।···বেচারি নিশীথ!

একটু চঞ্চলভাবে পা নাড়িতে নাড়িতে নিশীথ বলিল, "বিশেষ কাজ রয়েছে, একটা foreign travels-এর (বিদেশ যাত্রার) হাংগাম তো আন্দাজ করতেই পারেন; কিন্তু রাঁচি থেকে চলে এসেছি অথচ যদি দেখা না করি...এ বিষয়ে মহিলারা কি রকম sensitive (অভিমানী) জানেনই তো!"

তাহার পর সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলিল, "But this is between you and me, mind you (কিন্তু মনে রাখবেন, কথাটা নিজেদের মধ্যে বলছি)।"

বলিয়া, সামনে পিছনে দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি বললেন ওঁর মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

একটা ঝড়ে দোদুল্যমান বৃক্ষ মচকাইয়া গেলে যেমন হয়, নিশীথ যেন ঠিক সেই রকম হইয়া গেল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে খুব পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে সে, চক্ষু দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "বাই জোভ্! আপনি তো আমায় বলেননি মিস্টার মুখার্জি।"

বলিলাম, "আমি নিজেই জানতাম না। ভালই তো ছিলেন, বোধ হয় এইমাত্র আরম্ভ হয়েছে।"

মুঠায় মুখটা চাপিয়া নিশীথ একটু চিন্তা করিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা ওদের মধ্যেও একা ওই পারে। বলিল, "একবার বল তো গিয়ে রাজু, মিস্টার চৌধুরী বেড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, যদি আপত্তি না থাকে তো ওপরে গিয়েই দেখা করি। যদি ডাক্তার দেখাবার দরকার হয় তো···বলবে—বড্ডই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন শুনে, বুঝলে তো?"

আমার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না, নিশীথ সেইভাবেই মুঠায় মুখ চাপিয়া পা নাড়িতে নাড়িতে বার-দুই "বাই জোভ্! বাই জোভ্!" করিল।

চঞ্চল হইয়াছে সন্দেহ নাই, তা সে যে কারণেই হোক্।

রাজু আসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ জানালেন আর বললেন—না, ডাক্তারের দরকার নেই, একটুখানি একলা থাকলেই সেরে উঠবেন।"—এমন সতর্কভাবে বলিল যেন যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহার একটি অক্ষরও বাদ না পড়ে।

তাহার পর সে গ্যারেজের দিকে চলিয়া গেল।

নিশীথের মোটর চলিয়া যাইবার একটু পরেই বাড়ির গাড়িটা ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইল। কে যায় দেখিবার জন্য উগ্র রকম একটা কৌতূহল হইতেছে।

তরু আসিয়া বলিল, "দিদি বেড়াতে যেতে বললেন মাস্টারমশাই।" আজ বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল না বলিয়াই বসিয়াছিলাম। তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আর বলিলাম না, "বেশ চল" বলিয়া জামাটা পরিয়া লইবার জন্য ঘরের দিকে গেলাম। তরু বলিল, "আমি যাব না।"

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তবে? একলা কি করতে যাব আমি?"

তরু ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "একলা নয়, আপনি আর দিদি।"

আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতেছিলাম, সেই অবস্থাতেই ঘরের মাঝে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মীরার আচরণ কয়েকদিন হইতে খুবই অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন, কিন্তু এতবড় একটা বেমানান ব্যাপার করিয়া বসিবে, তাহাও এত স্পষ্টভাবে—স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তাহার পর বলিলাম, "বল'গে আমায় একটু অন্যত্র যেতে হবে, তিনি একলাই যান।"

তরু ফিরিয়া বলিতে যাইবে, এমন সময় সিঁড়ির মোড়ের কাছে চাপা রাগের একটা বিকৃত স্বরে মীরার কণ্ঠ শোনা গেল, 'তরু বলো মাস্টারমশাইকে, এটা আমার হুকুম, ওঁর অনুগ্রহের কিছু নেই এতে।"

আমি প্রায় সংযম হারাইয়াছিলাম, কিন্তু ঠিক সময়ে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইলাম। একটি আত্মসংযম হারান মেয়েছেলের সঙ্গে এখনই কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়া যাইত ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। তবে মনে মনেই স্থির করিয়া ফেলিলাম বন্ধনের যাহা একটু অবশেষ আছে এইবার শেষ করিয়া দিতে হইবে; সুযোগ আসিয়াছে। খুব সহজ ধৈর্যের সঙ্গে জামাটা পরিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

সিঁড়ির মোড়ের দুইটা ধাপ নীচে মীরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাম দিকের নাসিকাটা কুঞ্চিত, চোখের কোণে যেটুকু দেখা যায় যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ একটা, চাপা উত্তেজনায় বুকটা দীর্ঘচ্ছন্দে উঠানামা করিতেছে।

আমি শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

দু-জনে গিয়া মোটরে উঠিলাম।

মোটর স্টার্ট দিতে দৃষ্টিটা আমার আপনা-আপনিই একবার তরুর উপর গিয়া পড়িল। উগ্র আশঙ্কায় যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া সে চৌকাঠে ঠেস দিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে।

গেটের কাছে আসিয়া ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "কোন দিকে যাব?"

মীরা কোন উত্তর করিল না, বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল, সেইভাবেই চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "ডায়মণ্ড হারবার রোডের দিকে চলো না হয়।"

যেখানে একদিন মিলন হইয়াছিল স্পষ্ট, সেখানে আজ বিচ্ছেদকে স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

গাড়ি সার্কুলার রোড হইয়া চৌরঙ্গী পার হইয়া পশ্চিমে ছুটিল। খিদিরপুরের পুল পার হইয়া বাঁয়ে ঘুরিয়া ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরিল। কোন কথা নাই। শুধু পেট্রোলে গাড়ির মসৃণ আওয়াজ। খালের পুলটা যখন পার হইলাম মীরা হাওয়া লাগাইবার জন্য মোটরের কিনারায় মাথাটা পাতিয়া দিল, কপালের চারিদিকে চুলগুলা আল্‌গা হইয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল।

বেহালা-বড়িষা পার হইয়া মোটর সবে একটু ফাঁকায় আসিয়াছে, মীরা ড্রাইভারকে বলিল, "ফেরো।"

ফিরিবার সময়ও কোন কথা হইল না। দুইজনের মাঝখানে বীচিহীন জলরাশির মত অটুট স্তব্ধতা থমথম করিতে লাগিল।

বাড়িতে আসিয়া মীরা তেমনি অভঙ্গ নিস্তব্ধতায় সিঁড়ি বাহিয়া ঋজু গতিতে উপরে উঠিয়া গেল।

কি বলিত মীরা?—কেন বলিল না? ডায়মণ্ড হারবার রোডের যেখানটিতে আসিলে দু-জনের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম সন্ধ্যাটিকে বোধ হয় পাওয়া যাইত অতটা যাইয়া মীরা তাহার সম্মুখীন হইল না কেন?—তাহার ভয় হইল দুর্মদ অভিমানের মধ্যে যে কঠোর সংকল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই আমাদের তীর্থভূমিতে যাইলেই সেটা চূর্ণ হইয়া যাইবে?

হ্যাঁ, একটা অতি কঠোর সংকল্পকেই মীরা সেদিন প্রাণের সমস্ত উত্তাপ দিয়া লালন করিয়া তুলিতেছিল,—আত্মহত্যার সংকল্প।

কেন, কি করিয়া বলিব? নারীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের সংবাদ কি করিয়া জানিব?—অভিমান, নৈরাশ্য—না, তাহার ধমনীর সেই রহস্যময় রাজরক্তের কণিকা?

পরদিন সন্ধ্যার সময় সকলেই জানিতে পারিল মীরা নিশীথকেই বরমাল্য দিবে।

আত্মহত্যাই বইকি। আত্মহত্যার কি একটিই রূপ আছে?—আরও ভয়ংকর রূপ নাই?—তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া?—সমস্ত জীবনকে একটা দীর্ঘীকৃত মৃত্যুতে পরিণত করা?

মীরা এই আত্মহত্যাই বাছিয়া লইল। কেন?—তাহাই বা কি করিয়া বলি?—হয়তো যে আভিজাত্যকে ইচ্ছামত নোয়াইতে পারিল না তাহার উপর প্রতিশোধ

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না। কি জানি, নারীর মন, 'শুভানি বহু-বিঘ্নানি'... কতকটা পৌরাণিক, কতকটা আধুনিক মতে বাগদানের একটা পাকারকম বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। আধুনিকতার দিকে থাকিবে একটা বড় রকম পার্টি, অবশ্য নিশীথের বাড়িতেই।

যেদিন পার্টি তাহার আগের দিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অপর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা করিলাম, "বাড়ি থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, যেতে লিখেছেন।"

টেলিগ্রামটা ঠিকই তবে ফরমাসী, আমিই বাড়িতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আর থাকাও চলে না, অথচ এই সব ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ কর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাও বড় কটু দেখায়। সেখানে গিয়া একটা চিঠি লিখিয়া দিলেই চলিবে।

অপর্ণা দেবী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে একটু চাহিলেন। প্রথমটা একটা শঙ্কার ভাব ছিল সে দৃষ্টিতে, কিন্তু অচিরেই সেটা মিলাইয়া গেল। ওঁকে এত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বলিলেন "টেলিগ্রাম! তাহ'লে তোমার আজই তো যাওয়া উচিত..."

কালকের পার্টি থেকে অব্যাহতি পাইয়াছি দেখিয়া যেন বাঁচিলেন উনি। মহীয়সী রমণী, ওঁর সহানুভূতির স্পর্শে আমার সমস্ত মন ওঁর চরণে যেন লুটাইয়া পড়িল।

মিস্টার রায় শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। কয়েকটা প্রশ্নও করিলেন, "বাড়ি থেকে মানে,—শ্রীরামপুর থেকে?—না, তোমাদের সেই..."

বলিলাম, "আজ্ঞে না, শ্রীরামপুর আমার বন্ধুর বাড়ি, টেলিগ্রাম এসেছে পশ্চিমে আমাদের বাড়ি থেকে।"

"**Hope it is nothing serious**" (আশা করি কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়)?

বলিলাম, "বোধ হয় নয়। প্রায় বছর-খানেক যাইনি, কয়েকবার যেতে লিখেছিলেনও..."

"কবে যাচ্ছ?"

বলিলাম, "আজই রাত্রের গাড়িতে যাব ভাবছি।"

মিস্টার রায় একটু অধীরতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "**How unfortunato!** কাল মীরার উপলক্ষ্যে পার্টি, আর..."

অন্যমনস্ক ধাতের মানুষ, এক-এক সময় আবার খুবই অন্যমনস্ক থাকেন। একেবারে মোক্ষম স্থানটিতে আসিয়া তাঁহার হুঁশ হইল। চুপ করিয়া গেলেন।

"I see, I see ; বেশ তা যাবে।" বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

বাকি থাকে মীরা। দেখা করিব কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ সমস্ত দিন বাহির হয় নাই।

যাত্রার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। চোরের মত অনেকক্ষণ দরজার পাশে অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন কি?"

সেকেণ্ড দুই-তিন বিলম্ব করিয়া উত্তর হইল, "আসুন।"

মীরা বিছানায় নিশ্চয় শুইয়া ছিল। বোধ হয় নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পাশের শোফায় নামিয়া বসিতে যাইবে, তাহার পূর্বেই আমি প্রবেশ করায় হইয়া উঠিল না; বিছানাতেই বসিয়া রহিল।

কিন্তু এ মীরা নাকি? চোখের কোলে কালি, মুখটা লম্বা হইয়া গিয়াছে যেন একটা শ্রান্ত, আচ্ছন্ন, উৎকণ্ঠিত ভাবের সঙ্গে আমার মুখের পানে চাহিল।

বলিলাম, "বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল...."

মীরা খুব দূর থেকে যেন আওয়াজ টানিয়া আনিয়া বলিল, "বাবাকে, মাকে বুঝিয়েছেন ঐ কথা,—আমাকেও...?"

আর বলিতে পারিল না। বুকে অসহ্য বেদনা হইলে যেমন একটা অব্যক্ত আওয়াজ হয়, সেই রকম করিয়া থামিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন মুষড়াইয়া বিছানার লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পর কান্না। সে-রকম নীরবে গুমরাইয়া কাঁদিতে আমি আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে দ্রুতনিঃসৃত ফোঁপানির শব্দ, সমস্ত শরীরটা থরথরিয়া উঠিতেছে; একটা নিরুদ্ধ ঢেউ যেন তাহার দেহ-সরসীর তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি রচনা শুনাইতেছি না, যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতেছি—আমি সংযত থাকিতে পারি নাই। দু-দিন পরে মীরার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদের কথা, কি উচিত, কি অনুচিত—এসব কিছুই ভাবিয়া দেখিতে পারি নাই। তখন শুধু একটি অনুভূতি মাত্র ছিল—মীরার বুকে একই বেদনা!...আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মীরার পিঠে দক্ষিণ হাতটা রাখিয়া ডাকিলাম, "মীরা।"

শুধু কান্নার আওয়াজ আরও উদ্দাত হইয়া উঠিল।

আমার মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল; কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে একটা গোটা জীবনের স্বপ্ন যেন একসঙ্গেই ভাঙা-গড়া দুই-ই হইয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত শোক যথাসাধ্য দমন করিয়া মুখটা আরও নামাইয়া বলিলাম, "মীরা, কেঁদ না। আমি তোমায় সুখী করতে পারতাম না, কিন্তু আমি দুর্বল, মন স্থির ক'রে উঠতে পারছিলাম না; এ-ই

ঠিক হয়েছে।"

মীরা তেমনি উবুড় হইয়া ক্রন্দনের ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"না, না, এই ক'রেই আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, আর বলবেন না···আমি নিজেকে ঠিক ক'রে ধরতে পারিনি আপনার সামনে, কিন্তু আপনি কেন চিনে নিলেন না? ··বাইরে যা পেলেন সত্যিই কি মীরা তাই?—বলুন ··আমার সর্বনাশের মধ্যে থেকে আমায় কেন জোর ক'রে টেনে নিলেন না?···কেন?···আমি কি এটুকুও আপনার কাছে আশা করতে পারতাম না? বলুন···বলুন···"

সেদিনকার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে, ভুলি নাই। মীরা এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারে নাই।

১৫

বাড়ি চলিয়া আসিবার প্রায় মাসখানেক পরে অনিলের একখানি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে—

"এতদিন সদুর একটা উৎকট শপথ দেওয়া ছিল বলে তোকে পত্র দিইনি। আজ সেই শপথের সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে তোকে লিখতে বসলাম।

"সৌদামিনী মরেছে। মরে তোকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছে, সমাজকে করেছে নিরুপদ্রব, ভাগবতকে করেছে নিরাশ।

"আমাদের পক্ষে সৌদামিনী মরলই বইকি, এ-লোক ছেড়ে সে এখন সিনেমা-লোকের জীব। এই মরা-সদু একদিন সিনেমা-স্টার হয়ে জ্যোতির্লোকে ফুটে উঠবে। সবাই থাকবে বিস্ময়ে চেয়ে। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে ওর কম্পমান দীপ্তি ঠিকরে পড়বে দেশের যত যুবার হা-হুতাশভরা দৃষ্টির ওপর। আলোকরাশ্মিতে নীল রঙের ঈর্ষা ফুটে উঠবে কুললললনার চক্ষে। ও একদিন দেবে দীপ্তিহীন ক'রে কবিকে, কর্মীকে জ্ঞানগরীয়ানকে; ধূমকেতু যেমন নিজের দীপ্তি দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ম্লান ক'রে তোলে। সদু হবে জ্যোতিষ্ক, উপায় নেই। রূপ আর প্রতিভার আলো দিয়ে যে ওর জন্ম। কিন্তু সদু সেই জ্যোতিষ্ক হবে, যে-জ্যোতিষ্ক-ধূমকেতু, এরও উপায় নেই আর। কেন না ধূমকেতুর ইতিহাস আর সদুর ইতিহাস একই—অর্থাৎ সমাজ ওদের কোল দেয়নি, নিজের অসহ্য আলোকের জ্বালা নিয়ে ওরা দিকে দিকে আগুন লাগিয়ে বেড়াবেই।

"অথচ এই সদু একদিন হ'তে পারত গৃহস্থ-গৃহের তুলসীমঞ্চের প্রদীপটি। আলোয় একদিকে ফুটে উঠত ধর্ম, একদিকে ফুটে উঠত সংসার। ও করত ধূমাহুর আর সেবা, শ্রী আর কল্যাণের মধ্যে দিয়ে ও সেই সৃষ্টির উপর ভগবানের আশীর্বাদ মিলে

নামিয়ে আনত। এই ছিল ওর মিশন, এই ছিল ওর সাধ। জলহীন তৃষ্ণার মত সাধ প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠেছিল। মনে আছে শৈল সেইদিনকার কথা—দুপুরে আমরা দু-জনে শুয়ে আছি ঘরে, সদু এল অম্বুরীর কাছে, মেয়েটাকে নিয়ে সেই আকুলি-বিকলির কথা মনে আছে? আমি তো ভুলব না কখনও। যতই দিন যাচ্ছিল, সদু ততই বুঝতে পারছিল ওর সৃজনসম্ভার দুর্বল হ'য়ে আসছে, ততই ওর রচনা করবার পিপাসা উগ্র হ'য়ে আসছিল। কেন হবে না?—নিতান্ত কুরূপারও যদি হয় তো সদুর হবে না কেন? ঘেঁটুর যদি সাধ হয় ফুল ফোটাবার তো কমললতার বেলাই হবে যত দোষ?

"সদু ওর স্বামীকে—জীবনের সব রকম সফলতার প্রতিবন্ধককে—একদিনের জন্যেও ভালবাসেনি। ভেতরে ভেতরে ছিল ঘৃণা, ওপরে ছিল ঔদাসীন্য—এমন একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য যা ভেদ ক'রে কারুর নজর ওর নিদারুণ ঘৃণার স্তরে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু আমি জানতাম ওর ঘৃণা অধৈর্য দিন-দিন কতই না উৎকট হ'য়ে উঠছিল, কেন-না আমার মনের বিদ্রোহের একটা সাড়া পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে। তার পর ওর মুক্তি, যা একদিন আসবেই বলে ওর একমাত্র ভরসা ছিল জীবনে। শৈল, দূরেই হোক্ বা অদূরেই হোক্, ভবিষ্যৎ জীবনে একটা আলোর রেখা না থাকলে আমরা কেউ-ই বাঁচি না,—যাকে বলা চলে একটা ফিউচার প্রস্‌পেক্ট। সদুর এই রকম একটা ফিউচার প্রস্‌পেক্ট ছিল,—অর্থাৎ স্বামী বলে যে অস্থিচর্মের বেড়াটা ভাগবত ওর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেটা একদিন খসে পড়বেই। ওর তখন হবে মুক্তি। খসল বেড়া, এল মুক্তি; শুধু তাই নয়, সদু যা কখনও বোধ হয় কল্পনার মধ্যে আনতে পারেনি, ওর এই মহামুক্তির সঙ্গে তাও এসে দাঁড়াল সামনে—অর্থাৎ তুই এলি।

"গত এই দুই মাসের মধ্যে অন্ততএকটা মাস ধরে আমি একটা জিনিস দেখছিলাম শৈল,—অপূর্ব একটা জিনিস—একটা স্ফুটমান শতদল। তোকে পাবে এই বিশ্বাসে সদু দিন দিন যে কী অপরূপ হ'য়ে উঠেছিল, যে না দেখেছে যার চোখ নেই তাকে বোঝানো যাবে না। ও খুব চাপা মেয়ে, অর্থাৎ মনের প্রধান চিন্তাটাকে ও বেশ [illegible]র মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে ঢেকে রাখতে পারে; কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতাম—কেন্দ্রগত [illegible] চারিদিকে শতদল কমলের পাপড়ি একটি একটি ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠছে; [illegible]তার আনন্দলোকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে।

"তারপর প্রতিদিনে আশাভঙ্গের পর এল শ্রান্তি। তোর আসা নেই, চিঠি [illegible]ই, কোন খবর নেই। দেখছি সেই শতদলের রক্তাভা ম্লান হ'য়ে আসছে, পাপড়ি [illegible]আসছে যেন কুঁকড়ে। তোকে ইঙ্গিত দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। পেয়েছিলি

কিনা জানি না, আমি কোন উত্তরপাইনি। ঠিক করলাম—কলকাতায় যাব তোর কাছে। একটা যে করব কিছু এইটুকু সন্দেহের ওপরই নির্ভর ক'রে সতু একদিন আমার সঙ্গে দেখা করলে। প্রসঙ্গটা আমাকে দিয়েই তোলালে পাকেচক্রে। তারপর হঠাৎ উৎকট শপথ দিয়ে আমার চিঠি দেওয়া যাওয়াসব কিছুরই পথ বন্ধ করে দিলে।

"কিন্তু তারপরও রইল প্রতীক্ষা ক'রে, শুধু আরও সংগোপনে। সে যে আরও কত করুণ দৃশ্য শৈল,—নিজের অভিমানের কাছেও হার মেনে আবার পথের পানে দৃষ্টি ফেলে রাখা!

"তারপর টের পেলাম তুই পশ্চিমে চলে গেছিস। লিণ্ডসে ক্রেসেণ্টের আরও সব কথা টের পেলাম।

"শৈল, তোকেই বা কি ক'রে দোষ দেব? জানি প্রেম অসপত্ন—তার সামনে সমাজ নেই, উপকার নেই, এমন কি ধর্মও নেই; সে স্বরাট্। নিজের কেতন উড়িয়েই চলে আর সবকেই দলিত ক'রে। জানি মীরাকে পাওয়া আর না-পাওয়া এই দুয়েরই সামনে সতুর উপকার করা তোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বরং—অদ্ভুত শোনালেও এটা খুব সত্যি যে মীরা যতক্ষণ তোর সামনে ছিল ততক্ষণ মান-অভিমান, দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে সতুর উপকারের কথা ভাবতে পারতিস্—সেই জন্যেই দিয়েছিলি আশা—এখন তোর মীরা-হীন জগতে সবই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। জানি যখন একথা, তখন তোকে না ক্ষমা ক'রে উপায় কি?

"তবুও মনে হচ্ছে—আমি কি হারালাম, তুই কি হারালি, সমাজ কতটা বঞ্চিত হ'ল! অসহ্য বেদনায় মনটা টন্‌টনিয়ে ওঠে যখন ভাবি—সতুর নাচে, গানে, অভিনয়ে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ হাততালির চোটে ভেঙ্গে পড়ছে, সতুর ওপর শত শত দৃষ্টি লালসার ক্লেদ নিয়ে মুর্ছিত হয়ে পড়ছে, স্থানে-অস্থানে সতুর নানা ভঙ্গিমার ছবি পথিকের পথ-বিভ্রম ঘটাচ্ছে, ছোট-বড় সব কাগজগুলো সতুর অভিনয় ভাঙ্গিয়ে সস্তা পয়সা লুটতে মেতে উঠেছে। আমাদের ছেলেবেলার সেই এত আদরের সতুর!

"খুকীর ভাত হবে আসছে সোমবার, আসবি না জেনেও নেমন্তন্ন দেওয়া রইল। খোকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বলতে এসেছে ভাতের পরেই নিশ্চিন্দি হ'য়ে খুকীর বিয়ে দিয়ে দিতে; ও তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে খুকীকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসবে।

"বললাম, 'তাহ'লে তো মস্তবড় একটা ভাবনা যায় সান্থু।'

"অম্বুরী দু-জনকেই খোঁচা দিলে, বললে, 'তা না হ'লে আর বলে পুরুষমানুষ সেয়ানা জাত!—বোনের ভাতটি মুখে দেওয়ার কথা হয়েছে কি বাপ-বেটায় মিলে তাকে বিদেয় করবার পরামর্শ আরম্ভ হ'ল!'

"অম্বুরী হাসছে, যোগ দিতে পারলাম না কিন্তু।—সত্যিই তো, মেয়ে হ'লেই নিত্য বিদায়ের চিন্তা⋯বাড়ির থেকে কাউকে সমাজ থেকে, কাউকে একেবারে ধর্ম থেকে। কোথাও না হয় সুখের বিদায় মালাচন্দনের, কোথাও আবার ললাটে গ্লানির প্রলেপ দিয়ে।' বিদায়ের অশ্রু নিয়েই ওদের জন্ম।"

এই আমার ঘৃণায়- মেশানো ভালবাসা! এরই মধ্যে অপর দিক থেকে সৌদামিনী আসিয়া আমায় দিতে চাহিয়াছিল খাঁটি সোনা। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার অপরাধের কথাটা স্বীকার করিয়া রাখিলাম। লইতে পারি নাই, তাহার কারণ ভাল-বাসার নি-খাদ সোনা দিয়াই লইতে হয়। আমার স্বর্ণ আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল —মীরাকে। এ অদ্ভুত দান-প্রতিদানকে কোন্ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন?—তাঁহাকে কোটি নমস্কার।

ঘৃণায়-মেশানো এই আমার ভালবাসা। অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে? আমারও হয় এক-এক সময় সন্দেহ—এত বিরুদ্ধ দুইটি জিনিস সত্যই কি জীবনে একদিন হাত-ধরাধরি করিয়া আসিয়াছিল?

সন্দেহ হইলে আমার দক্ষিণ হস্তের অনামিকার পানে চাহিয়া দেখি।—

বহুদিন পরে আমি অনামধেয়া এক কাহারও নিকট হইতে একটি চিঠি পাই। রেজেস্টারী করা; খাম খুলিয়া দেখি ভিতরে কাগজে মোড়া একটি নীলা পাথর। চিঠি বলিয়া বিশেষ কিছু নাই, ছোট্ট একটি কাগজের টুকরায় লেখা⋯"এইটি বাঁধিয়ে প'রো।"

আংটি করিয়া অনামিকায় ধারণ করিয়াছি। যখনই সন্দেহ হয়, এই বিষের রং-মেশানো হীরার দিকে চাই⋯মনে পড়ে, সত্যই একদিন ঘৃণার সঙ্গে মেশানো ভালবাসা পাইয়াছিলাম,— এই হীরার মতই নীল, এই হীরার মতই খাঁটি।